নগ্ন ঈশ্বর

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৭১

প্রকাশক
নীহাররঞ্জন রায়
কথাশিল্প
১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
নিরঞ্জন ভট্টাচার্য
সর্বাণী প্রিণ্টার্স
১০/১/এ লক্ষ্মী দত্ত লেন
কলিকাতা-৩

২য় টাকা

শ্রদ্ধেয় নাট্যকার শ্রীসৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী অগ্রজপ্রতিমেষু

ও

শ্রীমতী রত্না নন্দী সুচরিতাসু

এক

শেষ রাতের ভীষণ ঝড়ের ভিতর জাহাজ বন্দর ধরছে।

দীর্ঘদিন সমুদ্র পরিক্রমণের পর জাহাজ এবং জাহাজীরা লেগুনের মুখে বন্দরের আলো দেখতে পেল।

আর তুষার ঝড়ের জন্য জাহাজীরা রেনকোট গায়ে ডেকের উপর ছুটোছুটি করছে, ওরা দড়িদড়া ফেলে দিচ্ছে নিচে। জেটিবয় সেই সব দড়িদড়া অথবা হাসিলের সাহায্যে জাহাজ বন্দরে বাঁধছে। মেজমালোমকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে না —তিনি দু' হাত তুলে বিচিত্র এক ভঙ্গীতে ডেক-জাহাজীদের দড়িদড়া হাপিজ অথবা হাড়িয়া করতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

তখন জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব অবনীভূষণ পোর্টহোলে উঁকি দিল। শেষরাতে জাহাজ বন্দর ধরছে, জাহাজ সেই কবে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল থেকে নোঙর তুলে সমুদ্রে ভেসেছিল, কবে কোন এক দীর্ঘ অতীতে যেন। তারা বন্দর ফেলে শুধু সমুদ্র এবং সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপ—বালির অথবা পাথরের জনমানবহীন দ্বীপ দেখেছে। ওরা সেই দ্বীপের ঝাউ গাছ এবং অপরিচিত গাছগাছালি [illegible]খে চীৎকার করার সময় মনে করত—জাহাজ বুঝি আর কোনদিন বন্দর [illegible] না। শুধু সমুদ্র, এবং নীল জল, নীল আকাশ আর হয়ত কচিৎ কোথাও সমুদ্রের চিড়িয়াপাখী—দূরে কখনও ডালফিনের ঝাঁক…। পাঁচ নম্বর সাবের মনে হত জাহাজ ওদের নিয়ে অন্তহীন এক সমুদ্রে যাত্রা করেছে। [illegible] বন্দরে কোনদিন পৌঁছাতে পারবে না, জাহাজ ওদের সঙ্গে তঞ্চকতা করেছে।

সুতরাং এই তুষার ঝড়ের ভিতরও জাহাজীদের প্রাণে উল্লাসের অন্ত ছিল না। মেজমালোম প্রায় ছুটে ছুটে কাজ করতে জাহাজীদের উৎসাহ দিচ্ছেন। সামনে পাহাড়, আলো, মাটি এবং মানুষের বসতি। ওখানে কোথাও রমণী [illegible]রে। গৃহ আছে। মেজমালোম উত্তেজনায় রা রা করে গান গাইত[illegible] ওভাব তুষার ঝড়ের জন্য ওঁর কণ্ঠ ভয়ঙ্কর কঠিন মনে হচ্ছিল আর তুষার ঝড় [illegible] বেটপ জুতো

পোর্টহোল বন্ধ। কাঁচের ভেতর থেকে এখন অন্যান্য জাহাজীরা বন্দর দেখছে। বন্দরটা ছোট অথচ খুব মসৃণ মনে হচ্ছিল। ক্রমশ আলো ফুটছে, ক্রমশ তুষার ঝড় কমে আসছিল। আর এক এক করে সব আলো, পথের এবং জেটীর এক সময় নিবে যেতে থাকল। দূরের গীর্জায় তখন ঘণ্টা বাজছে, তখন জাহাজীরা সকলে ডেকের উপর উঠে এল এবং সকলে রেলিঙে ঝুঁকে পড়ছে। আবেগে উত্তেজনায় জাহাজীরা বন্দরের সকল ঘাস মাটি ফুলকে ভালবাসার কথা জানাল।

বন্দরের প্রথম দিন এবং রবিবার। জাহাজীদের ছুটির দিন। ওরা হই হই করে আকাশ পরিষ্কার হলেই নেমে যাবে। শুধু তুষার ঝড়ের জন্য ওরা বিরক্ত। জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব অবনীভূষণ পোর্টহোলে বারংবার হাত রেখে ঝড়ের সঙ্গে তুষারকণা পরখ করছিল। মনে হচ্ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডা বাতাস ক্রমশ কমে যাবে, যেন ওর ইচ্ছা এই ঠাণ্ডা বাতাস থেমে গেলেই সে তার প্রিয় তামাকের পাইপটি মুখে পুরে যুবতী সন্ধানে বন্দরে বের হয়ে পড়বে। এইটুকু ভেবে অবনীভূষণ আয়নায় মুখ দেখল। ভয়ঙ্কর মুখ অবনীভূষণের, কালো নিগ্রো-সুলভ চেহারা। চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু —জাহাজে অবনীভূষণকে বাঙ্গালী বলে চেনাই যায় না। অবনীভূষণ শক্ত মানুষ, অবনীভূষণ লম্বা আর অবনীভূষণের জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে। অবনীভূষণ মাকে দেখেছে, বাবাকে দেখে নি। 'অবনীভূষণ জারজ'—আয়নায় মুখ দেখার সময় পাঁচ নম্বর সাব কথাটা আয়নার প্রতিবিম্বকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করল। এত দীর্ঘ ঋজু চেহারা অবনীভূষণের, আর এত বড় চোখ এবং মুখ অবনীভূষণের আর এত লম্বা থাবা অবনীভূষণের যে যুবতীরা কোন বন্দরেই অবনীভূষণকে পছন্দ করে না।

ডেকে সামান্য কাজ অবনীভূষণের। ফরোয়ার্ড-ডেকে দু নম্বর মাস্টের নীচে উইন্‌চ মেসিনের লিভার প্লেট আল্গা হয়ে গেছে—ওটা সারতে হবে। রবিবার তবু ওকে এই সামান্য কাজটুকু করতে হবে। বয়লার স্যুট পরে অবনীভূষণ ডেকে বের হয়ে গেল। চারিদিকে পাহাড়। তুষার ঝড় কমে গেছে বলে আকাশ পরিচ্ছন্ন, লেগুনের জল সামান্য সবুজ রঙের, আর দূরে দূরে সব পাহাড় ক্রমশ উপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের কোলে সব পরিচ্ছন্ন লাল নীল কাঠের রঙবেরঙের বাড়ি, [illegible]ত বড় বড় প্রাসাদ এবং ঠিক সেতুর অন্য পারে বড় বড় কিছু স্কাইস্ক্র্যাপার। [illegible] পারেই শহর। ঠিক লৌহ আকরিকের গুদামখানার বিপরীত দিকের [illegible]নীতে অবনীভূষণ মানুষের ভিড় দেখল। সূর্য আলো দিচ্ছে সামান্য

—খুব নিষ্প্রভ এই আলো, কোন উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারছে না। অবনীভূষণ লেদার জ্যাকেটের ভিতরেও হু হু করে শীতে কাঁপছিল—সামান্য উত্তাপের জন্য পাঁচ নম্বরকে খুব দুঃখিত মনে হচ্ছে।

অবনীভূষণ হাতের কাজ খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলল। তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্নের আহার শেষ করে নিজের বাংকে শুয়ে প্রতিদিনের অভ্যাসমত কিছু নগ্ন ছবির উপর চোখ রাখতেই শুনতে পেল এলওয়েতে কে বা কারা যেন পায়চারি করছে। মেজমালোমের গলার স্বর পাওয়া যাচ্ছে। তিনি খুব দ্রুত এবং জোরে হাসছেন। বোধ হয় খুব সকাল সকাল তিনি যুবতী সন্ধানের জন্য বের হয়ে পড়ছেন। অবনী-ভূষণেরও ইচ্ছা হচ্ছিল ঠিক এই সময়ে, যখন পোর্টহোল দিয়ে অন্য তীরে তিমি শিকারের জাহাজ ভিড়তে দেখা যাচ্ছে, যখন দূরে কোথাও এক তৈলবাহী জাহাজ বাঁধা হচ্ছিল, যখন আর কিছু হাতের সামনে করণীয় নেই অথবা 'ট্যানি টরেণ্টো' 'ট্যানি টরেণ্টো' এই এক বিশ্রী শব্দ কানের কাছে ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে তখন মেজমালোমের মত টিউলিপ গাছের নীচে যুবতী সন্ধানে বের হয়ে পড়াই ভাল। এত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অবনীভূষণ জাহাজ থেকে সকাল সকাল নেমে যেতে পারল না। সে রাতের জন্য অপেক্ষা করল। কারণ দিনের বেলায় এই চেহারা বড় ভয়ঙ্কর। রাতের বেলায় অস্পষ্ট অন্ধকারে অথবা নিয়ন আলোর ভিতর, ফেল্‌ট ক্যাপের ভিতর আর বৃহৎ ওভার কোটের জন্য সামান্য মানুষের মত মনে হয় ওকে। সুতরাং হাত পা শক্ত করে সে বাংকেই পড়ে থাকল। শরীরের ভিতর ভয়ঙ্কর কষ্ট এবং উত্তেজনা। বন্দরে এলেই কষ্টটা বাড়ে। বন্দর ধরলেই এই সব জাহাজীরা অমানুষের মত চোখ মুখ করে ঘোরা ফেরা করতে থাকে—কি যেন এক সোনার আপেল ওদের হারিয়ে গেছে—সেই আপেলের জন্য, সেই সোনার হরিণের জন্য ওরা সব সময় মাটি পেলেই দ্রুত ছুটতে চায়। অবনীভূষণ দ্রুত ছুটতে চাইল।

সন্ধ্যার সময় জাহাজের স্টারবোর্ডসাইডের কেবিনগুলোর দিকে হেঁটে গেল সে। সেখানে প্রিয় বন্ধু ডেক-এপ্রেন্টিস উইলিয়াম উড থাকেন। সে দরজায় কড়া নেড়ে ভিতরে ঢুকে বলল, একি তুমি এখনও চুপচাপ বসে রয়েছ! বের হবে না?

উড বলল, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা।

অবনীভূষণ বলল, অন্তত সিম্যান মিশানে চল। সেখানে জুটে যেতে পারে।

সুতরাং ওরা উভয়ে সাজগোজ করে বের হয়ে পড়ল। সেই লম্বা ওভার কোট গায়ে অবনীভূষণ, লম্বা তামাকের পাইপ মুখে এবং ভয়ঙ্কর বড় বেঢপ জুতো

পায়ে অবনীভূষণ গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে গেল। আর নেমে যাবার মুখেই দেখল মেজ মালোম বন্দর থেকে ফিরছে। মেজমালোম বেশ সুন্দরী এক যুবতীকে (বয়সে চল্লিশের মুখোমুখি) নিয়ে এসেছেন। যুবতীর পাতলা গড়ন, ছিমছাম চেহারা আর কালো গাউন, সোনালী ব্লাউজের উপর ফারের লম্বা মত কোট গায়ে……। ওর কোমরে মেজমালোমের হাত। যেন চুরি করে তিনি এক যুবতীকে জাহাজে নিয়ে যাচ্ছেন। সমুদ্র থেকে তেমনি ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। তীক্ষ্ণ শীতের ভিতর এই সামান্য উত্তাপটুকু অবনীভূষণকে অস্থির করে তুলল। মেজমালোমকে সে 'গুড-ইভনিং সেকেণ্ড' বলতে পর্যন্ত ভুলে গেল। সে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে। জেটির উপর দিয়ে ক্রেনের নীচে লম্বা লম্বা পা ফেলে উডের সঙ্গে হাঁটছে।

শীতের প্রথম। গাছের সব পাতা ঝরে গেছে, আর কিছু দিন গেলে এখানে হয়ত তুষার পাত হবে। অথবা তুষার পড়ার আগে শীত মাটিতে শেষ কামড় বসাচ্ছে। বাগানের আপেল গাছগুলোকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল, চেরীফলের গাছগুলো মৃতবৎ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সব অপরিচিত গাছগাছালির ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। গাছগুলোর পাতা ঝরে গেছে বলে কোন গাছই চেনা যাচ্ছে না, ওরা বৃদ্ধ পপ্‌লার হতে পারে, পাইন হতে পারে এমন কি বার্চ গাছও হতে পারে। এই শীতে পথের দু'পাশে কাঠের বাড়ি এবং লাল নীল রঙের শার্সির জানালা এবং বড় বড় কাঁচের জানালার ভিতর পরিবারের যুবক-যুবতীদের মুখ, একর্ডিয়ানের সুর, গ্রাম্য কোন লোকসঙ্গীত অবনীভূষণকে ক্রমশ উত্তেজিত করছে। ইতস্তত দু পাশে বার এবং পাব্‌-এর পর সেই বড় কার্নিভাল। সদর দরজার উপর একটা লোক হাঙরের মুখোশ পরে বসে নানা ভাবে জাহাজীদের প্রলুব্ধ করতে চাইছে। ওরা কার্নিভালে ঢুকল না। ওরা ক্রমশ পাহাড়ের উতরাইয়ে নেমে যাচ্ছে। আর ওরা দেখল, হরেক রকমের রমণীরা মুখে ফুঁ দিতে দিতে চলে যাচ্ছে—স্থানীয় কোন উৎসব হবে হয়ত —মেয়েরা মাথায় রুমাল বেঁধে শহরের বড় কবরখানার দিকে হাঁটছে। অবনীভূষণের এ-সময় ইচ্ছা হচ্ছিল ওর বড় থাবা দিয়ে ঠিক ছোট্ট পাখী ধরার মত কোন যুবতীকে ওভারকোটের পকেটে লুকিয়ে ফেলতে।

ভোরের তুষার ঝড়ের চিহ্ন এখনও এই সব পাহাড়ে এবং ছবির মত বাড়ি-গুলোর মাথায় লেগে আছে। কোথাও দেখল, কাঁচের ঘরে সুন্দরী যুবতী পিয়ানো বাজাচ্ছে, আর দু পাশে হরেক রকমের দৃশ্য এবং অবনীভূষণ এখন উন্মাদ —সে হন্যে হয়ে যুবতী সন্ধান করছে। এই সব জাহাজীদের আনন্দ দানের জন্য ভিন্ন

ভিন্ন অশালীন পোশাকে নানা বয়সের যুবতীরা ঘোরাফেরা করছে। ওরা এক এক করে সকলে নাচের আসরে নেমে পড়ছে। স্টেজের উপর একদল লোক কালো পোশাক পরে ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। ঈগল পাখীর মত মুখওয়ালা বাঁশির শব্দ বীভৎস এবং উৎকট মনে হচ্ছিল। পাশের কাউন্টার কাঁচ দিয়ে মোড়া—সেখানে মেয়েরা মদ বিক্রি করছে। জাহাজীরা কিউ দিয়ে মদ গিলছিল। অবনীভূষণ এবং উড উভয়ে মদ খেল এক গ্লাস করে। ওদের পার্টনার নেই, বিশেষ করে অবনীভূষণ এই সব নাচ এত দিনেও রপ্ত করতে পারে নি। সুতরাং অবনীভূষণ আর এক গ্লাস মদ নিয়ে পাশের সোফাতে বসে মাংসের পুরের সঙ্গে মদটুকু খেয়ে ফেলল। বাকি মাংসের পুরটুকু সে চেখে চেখে চেটে চেটে খাচ্ছিল আর রমণীরা এই যে নেচে চলেছে, এই যে সুন্দর শরীর এবং উটের মত মুখটি তুলে নেচে বেড়াচ্ছে এই যে রমণীরা ঘোড়ার মত পা ফেলে এক দুই করে সামনে পিছনে, পিছনে সামনে—যাচ্ছে আসছে—তা দেখে অস্থির হয়ে পড়ছিল। ফলে অবনীভূষণ ল্যালা ক্যালার মত চারিদিকে তাকাচ্ছিল। তারপর সে সহসা আবিষ্কারের মত দেখে ফেলল দুই সুন্দরী যুবতী যেখানে মদের কাউন্টার ঠিক তার বিপরীত দিকের টেবিলে বসে উল বুনছে। অবনীভূষণ লেজ নীচু করে চুপি চুপি উডের হাত ধরে ওদের দিকে গিয়ে সরে বসল। তারপর চোখমুখ টান টান করে বলল, গুড ইভিনিং ম্যাডাম এবং পাশে বসে পরিচিত হবার ভঙ্গীতে বলল, এম/ভি সিটি অফ গ্লাসগো। সে তার জাহাজের নাম বলল ওদের।

মেয়ে দুজন ওকে স্বাগত জানালে সে কাউন্টারে আবার মদের অর্ডার দিয়ে বলল, ছবির মত এই শহর। মেয়ে দুজনকে ভিন্ন ভিন্ন অলীক স্বপ্নের কথা বলে অথবা সমুদ্রের গল্প বলে ভেজাতে চাইল।

অবনীভূষণ দামী সিগারেট বের করে ওদের একটি করে প্রথম দিতেই ওরা এসে ওর ঘাড়ের উপর পড়ার মত ভান করল—সো নাইস! কোন অলৌকিক ঘটনার মত অবনীভূষণের সিগার কেস; সিগারেট কেসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ওরা।

অবনীভূষণ চুল-সোনা মেয়েটিকে বলল, ইউ লাইক ইট? বলে সে ওর সম্মতির অপেক্ষা করল না; সে চুল-সোনা মেয়ের হাতে যৌতুকের মত সিগারেট কেস তুলে ধরার সময়ই কাঁচের জানালায় মুখ বার করে পাহাড়ের উতরাইয়ের ভিন্ন ভিন্ন আলো দেখল। আকাশ পরিচ্ছন্ন বলে, পথঘাট শুকনো বলে পার্কের টেবিল বেঞ্চে এখন সব যুবক-যুবতীরা বসে নিশ্চয়ই গল্প করছে। অবনীভূষণ

এবার উডের দিকে তাকাল, উড তন্ময় হয়ে নাচ দেখছে। সে অবনীভূষণ অথবা চুল-সোনা মেয়েকে লক্ষ্য করছে না। সুতরাং অবনীভূষণ উডকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে বলল, চল এবার উঠি। প্রায় ঠিক করে এনেছি।

এবার অবনীভূষণ যুবতী দুজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, চলুন অন্য কোথাও।

যুবতী দুজন পরস্পর মুখ দেখল। তখন ব্যাণ্ড বাজছে উঁচু পর্দায়, তখন সার্কাসের ঘোড়ার মত পা ফেলে এই নাচের ভিতরই কেউ কেউ বেলেল্লাপনা করছিল। নাচতে নাচতে কোন এক ফাঁকে দেয়ালের পাশে অথবা সামান্য অন্ধকারের ভিতর পরস্পর পরস্পরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর সব ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গির ছবি। অবনীভূষণ কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারছে না। যুবতীরা সব উটের মত মুখ তুলে কেবল চুমু খাচ্ছে, কেবল সার্কাসের ঘোড়ার মত পা মুড়ে বসে পড়তে চাইছে।

অবনীভূষণ বলল, চলুন কোথাও। অবনীভূষণ চুল-সোনা মেয়ের হাতে নরম চাপ দিল।

ব্যাণ্ড বাজছে, হরদম বাজছে। সামনের কাউণ্টারে ফের দু-একজন করে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাবিক এসে ভিড় করছে। ওরা কেউ কেউ মাথার টুপি খুলে তিমি শিকারের গল্প আরম্ভ করল। উত্তর সাগরে ওরা গর্ভিণী তিমি শিকার করতে গিয়ে দুজন নাবিককে হারিয়েছে, এমন গল্পও করল। ওরা গল্প করার সময় পাশের হিটার থেকে উত্তাপ নিচ্ছিল এবং গর্ভিণী তিমির প্রসব সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রসিকতা করছিল।

ভিড় কাঁচঘরে ক্রমশ বাড়ছে। মিশানের ডান দিকে মসৃণ ঘাসের চত্বর এবং মৃত বৃক্ষের মত কিছু পাইন গাছ—তার নীচে বড় বড় টেবিল আর ফাঁকা মাঠে হেই উঁচু লম্বা এক হারপুনার হেঁটে হেঁটে এদিকে আসছে। হারপুনার কাঁচঘর অতিক্রম করে কাউণ্টারের সামনের লোকটির সঙ্গে ফিস ফিস করে কি বলছে। অবনীভূষণ সব লক্ষ্য করছিল। আগের দলটা এতক্ষণ হইচই করছিল মদ খেতে খেতে, কিন্তু হেই উঁচু লম্বা হারপুনারকে দেখে ওরা শিশু-সন্তানের মত হয়ে গেল। আর তখন কে বা কারা যেন সেই যুবতী দুটিকে উদ্দেশ্য করে লম্বা গলায় বড় রাস্তায় হেঁকে হেঁকে বলে যাচ্ছে—ট্যানি টরেণ্টো···ট্যানি টরেণ্টো ···আমাদের বন্ধুবর হারপুনার এবার উত্তর সাগর থেকে গর্ভিণী তিমি শিকার করে ফিরেছে।

উঁচু লম্বা লোকটার টেবিলে সকলে এক এক করে গোল হয়ে বসে গেল। সেই যুবতী দুজন পর্যন্ত উঠে যেতে চাইল। অবনীভূষণ কিছুতেই আর স্থির

থাকতে পারছে না। সে এবার বিদ্রূপ করে বলতে চাইল হ্যাঁগো সতীর দল ...তোমরা আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছ! সে বিরক্ত হয়ে এবার উডকে বলল, উড তুমি ত বলতে পার বুঝিয়ে। তোমার সুন্দর মুখ দেখে...।

উডের কথা যুবতী দুজন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে শুনল। ওরা চুল ঘাড়ে ফেলে উলের কাঁটা ব্যাগের ভিতর ভরে সেই চৌকোমুখ এবং গামবুট-পরা ভদ্রলোক— যে গর্ভিণী তিমি শিকার করে এইমাত্র উত্তর সাগর থেকে ফিরছে —তার টেবিলের দিকে হাঁটতে থাকল। অবনীভূষণ মদ খেয়েছে। ওর শরীর সামান্য টলছিল। অবনীভূষণের ভিতরে ভিতরে এক অপরিসীম তৃষ্ণা —সে পাগলের মত চুল-সোনা মেয়ের হাত ধরে ফেলল। কারণ সে যেন সেই চৌকোমুখ হারপুনার, মাথায় যার হাঙরের হাড়ের টুপি, যে বিশ্রী এবং যে ওখানে বসে কটু গন্ধের তামাক টানছে, যার চেহারা দেখলে মনে হয় মেয়েমানুষ সামান্য বস্তু—তার দৃষ্টি একবারেই সহ্য করতে পারছিল না। সে রাগে দুঃখে চুল-সোনা মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাইলে —হারপুনার ব্যক্তিটি ও তার দলবল লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার সামনে পথ আগলে দিলে। অবনীভূষণ ক্ষিপ্ত এক জানোয়ারের মত ওদের বিরুদ্ধে গর গর করে উঠল। মনে হল পরে সেই দলবল অবনীভূষণকে এলোপাথাড়ি মেরে গেছে।

বাইরে সাদা আলোর ভিতর নাক মুছতে গিয়ে অবনীভূষণ দেখল সামান্য রক্ত নাকের ডগায় জমাট বেঁধে আছে। ভিতরে তখন সেই যুবতী হারপুনারের সঙ্গে রসিকতা করছিল এবং হাসছিল। কাঁচের ভিতরে সব স্পষ্ট। সুতরাং অবনীভূষণ আর সহ্য করতে পারছে না। সে ফের দরজা অতিক্রম করে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করলে উড হাত চেপে ধরে বলল, অবনী তুমি বেশ জোরে হারপুনারকে মেরেছ। লোকটা পেটে লাথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। লোকটা গল গল করে মদ বমি করছে।

অবনীভূষণের ঝুট ঝামেলা করার আর ইচ্ছা থাকল না। এবং এখানে আর যুবতী অনুসন্ধান করা নিরর্থক ভেবে ওরা পাহাড়ের গায়ে গায়ে অথবা সেতুর দুই পাশে, লোহালক্কড়ের কারখানার দেওয়ালের ছায়ায় এবং যেখানে সব তিমি মাছের চর্বি সংরক্ষণ করার জন্য বড় বড় পিপের সারি সেইসব অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে একসময় শহরের মাঝামাঝি অঞ্চলে এসে গেল।

অবনীভূষণ চড়াই-উতরাইয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় উডকে উদ্দেশ্য করে বলল, আজ এই শীতে সতীর দল গেল কোথায়?

তখন উড সহসা আবিষ্কারের ভঙ্গীতে বলল, ঐ দেখ অবনী, লাইট-পোস্টের নীচে যেন দুজন মেয়ে শিস দিচ্ছে। ব'লে উড দূরের লাইট-পোস্টের দিকে হাত তুলে নির্দেশ করল।

অবনীভূষণ বলল, চল তবে!

শীতের রাত। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবনীভূষণের মনে হল ওরা শীতে জমে যাবে ক্রমশ। মনে হল ওরা যুবতী দুজনকে বেশী দূর আর অনুসরণ করতে পারবে না। অথবা মেয়ে দুজন এই শীতের রাতে ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। পথের ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে, দূরে দূরে সব পুলিসের বুটের শব্দ এবং ট্রলি বাসের আলো আর পথে পড়ছে না, শহর ক্রমশ যেন নির্জন নিঃসঙ্গ হয়ে আসছে। উড পর্যন্ত আর জোরে হাঁটতে পারছিল না।

একসময় ওরা এবং যুবতী দুজন শো-কেসের সামনে মুখোমুখি পড়ে যেতেই উড ঝুঁকে বলল, আস্তানা কতদূর?

দুজন বলল, সরি। বোধহয় অবনীভূষণের লম্বা চেহারা এবং হাতের বড় বড় থাবা, ওদের আতঙ্কিত করেছে।

অবনীভূষণ বলল, সামান্য সময়।

যুবতীরা শক্ত হয়ে গেল। বলল, না। ওরা বরং উডকে সঙ্গে নিতে চাইল।

উড বলল, আমরা দুজন, একা যেতে পারি না।

অবনীভূষণ এবার মরীয়া হয়ে বলল—মেয়ে, এই লম্বা কোটের পকেটে করে নিয়ে যাব তবে—কেউ টেরটি পাবে না। তারপর অবনীভূষণ চারিদিকে তাকাল যেন যথার্থই সে এই দুই যুবতীকে দুই পুতুলের মত পকেটে পুরে শহর ত্যাগ করে চলে যাবে।

এবার যথার্থই ভয় পেয়ে গেল ওরা। তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় পড়ার জন্য ছোট এই সরু গলি অতিক্রম করে নেমে যেতে চাইলো। পথ আগলে অবনীভূষণ তার দুই হাতের বড় থাবা দেখাল।—সে হাত দুটো অঞ্জলির মত করে রাখল— তৃষ্ণার জল আর কে দেবে? সে যেন বলতে চাইল কথাটা। এবং সে এই নিঃসঙ্গ রাতের আঁধারে উচ্চস্বরে সেই ট্যানি টরেণ্টো ট্যানি টরেণ্টো শব্দের মত চীৎকার করে নগরীর দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে বলতে চাইল, হায় অবনীভূষণ এই তৃষ্ণার জল তোমাকে আর কে দেবে!

তারপর অবনীভূষণ সেই যুবতী দুজনকে উদ্দেশ্য করে যেন বলল, আমি তোমাদের সব দেব, তোমরা আমাকে সামান্য স্পর্শ দাও। সামান্য উত্তাপ দাও।

ওরা উত্তর করল না। বড় রাস্তার উজ্জ্বল আলোর নীচ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আর অবনীভূষণ শুনতে পেল সেই আগের মত দূরে কেবল কারা যেন হেঁকে যাচ্ছে—ট্যানি টরেণ্টো……ট্যানি টরেণ্টো……উত্তর সাগর থেকে এক হারপুনার এক গর্ভিণী তিমি শিকার করে ফিরেছে। অবনীভূষণ দুর্গের পাশে পাশে হেঁটে গেল। সর্বত্র যেন সেই একই ট্যানি টরেণ্টো ট্যানি টরেণ্টো শব্দ। সে দু কান চেপে শীতের ঠাণ্ডায় ট্যাক্সির ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল এবং ট্যাক্সিওয়ালাকে নিজের জাহাজের নাম, ডকের নাম বলে শরীর এলিয়ে দিল। মনে হচ্ছিল হাতে পায়ে বড় ব্যথা, সে ঘাড় নাড়তে পারছে না—পরাজিত এক সৈনিকের মত আত্মগ্লানিতে ডুবে গেল।

গ্যাঙওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন পাঁচ নম্বর সাব এবং ডেক এপ্রেন্টিস উড হামাগুড়ি দিতে দিতে সিঁড়ি ভাঙছে। ওরা ফেরার পথে প্রচুর মদ গিলেছে; ওরা সিঁড়ি ধরে সোজা হেঁটে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সুতরাং কোয়ার্টার মাস্টার এক এক করে ওদের দুজনকে উঠে আসতে সাহায্য করলেন।

উড স্টার্বোর্ড সাইডের কেবিনগুলোর দিকে হেঁটে হেঁটে চলে গেল।

অবনীভূষণ বালকেডে ভর করে নিজের কেবিনের দিকে হাঁটতে থাকল। স্তিমিত আলো এলওয়েতে। সে বড় মিস্ত্রি এবং মেজ মিস্ত্রির কেবিন পিছনে ফেলে যেতেই মনে হল পায়ের সঙ্গে কি যেন জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে। সে যত পা আলগা করতে চাইছে তত পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। সে এবার নুয়ে পায়ের নীচে হাত দিয়ে দেখল একটা কালো রঙের গাউন। সে আলোর ভিতর নাকের কাছে সেটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ আলগা করে ঘ্রাণ নেবার সময় দেখল সামনে মেজ মালোমের কেবিন, কেবিনের দরজা খোলা, মেজ মালোম বাংকে উপুড় হয়ে মৃতবৎ পড়ে আছেন। ঘরে সেই বিকেলের যুবতী নেই। মেজ মালোম এক হাতে কোন রকমে প্যাণ্টটা কোমর পর্যন্ত তুলে রেখে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করছেন। অবনীভূষণ বলল, শালা মদ খেয়েছে। বলে, গাউনটা দরজা দিয়ে মেজ মালোমের মুখের ওপর ফেলে দিল। মেজ মালোমের এখন মুখ ঢাকা এবং শরীর প্রায় উলঙ্গ। সে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল মেজ মালোমের কেবিন। তারপর এন্‌জিন ঘরের সিঁড়ির মুখে নিজের কেবিনের দরজা খুলতে গিয়ে মনে হল ভিতর থেকে কে যেন বন্ধ করে রেখেছে। সে রাগে দুঃখে অপমানে দরজার উপর ভীষণ জোরে লাথি মারল। দরজা খুলছে না। সে তার অবসন্ন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে এবার

দরজার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সে বলল, বাস্টার্ড। সে গাল দিল, সোয়াইন। সে তারপর বাংলা ভাষায় খিস্তি করে ভিতরে ঢুকে বিস্মিত—সে চোখ গোল গোল করে দেখল, সেই বিকেলের যুবতী ওর বাংকে আশ্রয় নিয়েছে। এবং অসহায় বালিকার মত চোখ। যুবতীকে এখন বুনো কাকের মত শীর্ণ মনে হচ্ছে অথবা গর্ভিণী শালিখের মত রোঁয়া-ওঠা। প্রথম সে কী করবে ভেবে গেল না। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে সে বলল, কি গো একেবারে বাঘের মুখে!

যুবতী কিছু বলল না। চোখে মুখে ভয়ের এতটুকু চিহ্ন নেই। যেন এক্ষেত্রে কিছু করণীয় নেই, সব হয়ে গেছে, হয়ে যাবে ভাব। ঝড় এবং জীবনের আর্তনাদ কোথাও থেমে থাকছে না। যুবতী তবু ধীরে ধীরে বাংক ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল। বলল, সরি মিষ্টার। সে তার শীর্ণ হাত বালিশের উপর রেখে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল।

অবনীভূষণ যুবতীটিকে পড়ে যেতে দেখেই বুঝল—সেই বিকেল থেকে বাঁদরের হাড় চুষে চুষে যুবতীর এক কঠিন অসুখ, এক কঠিন স্থবির অসুখ—যা এতক্ষণ অবনীভূষণকে এই শহরময়, নগরময় এবং দুর্ভেদ্য অন্ধকারে বারংবার ঘুরিয়ে মারছে—। অবনীভূষণ তাড়াতাড়ি যুবতীকে ধরে ফেলল। না হলে বাংক থেকে যেন পড়ে যেত মেয়েটি, হাত পা কেটে মাথায় আঘাত লাগতে পারত। যুবতীর পড়ে যাবার মুখে কম্বলটা শরীর থেকে সরে গিয়েছিল। অবনীভূষণ দেখল আঁচড়ে কামড়ে যুবতীর শরীর মেজ মালোম ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। লজ্জানিবারণের জন্য অবনীভূষণ তাড়াতাড়ি ফের কম্বলটা শরীরে তুলে দিল এবং শুয়ে পড়তে বলে ঘড়িতে সময় দেখল—একটা বেজে গেছে, এখন ওকে সামান্য শুশ্রূষা করলে সামান্য সময়ের জন্য এই বন্দর শুভ-বার্তা বহন করবে। এইটুকু ভেবে অবনীভূষণ দরজা ভেজিয়ে চীফ কুকের গ্যালী পর্যন্ত হেঁটে গেল। নেশার ঘোর কি করে যেন একেবারে কেটে গেছে এবং ভিতরের সব দুঃখ ক্রমশ নিরাময় হচ্ছিল। সমুদ্র থেকে তেমনি ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। সে গরম জল করে যুবতীর শরীর ভাল করে ধুয়ে সামান্য শুশ্রূষার পর বলল, আমার জন্য সামান্য খাবার আছে। ইচ্ছা করলে আমরা দুজনে ভাগ করে খেতে পারি।

যুবতী কষ্ট করে হাসল। আপনি আমাকে বরং একটু সাহায্য করুন।

অবনীভূষণ বলল, কি করতে হবে?

—সেকেণ্ড অফিসারের ঘর থেকে দয়া করে আমার পোশাকটা এনে দিন।

অবনীভূষণ মেজ মালোমের ঘর থেকে পোশাকটা এনে দিলে মেয়েটি বলল

আমাকে দয়া করে বন্দরে নামিয়ে দিন। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলে ঘরে চলে যেতে পারব।

—বেশ চলুন। বলে তুলে ধরতেই মনে হল যুবতীর মাথা ঘুরে গেছে। সে বসে পড়ল।

—আপনি বন্দরের রাস্তাটুকু হেঁটে পার হতে পারবেন না। বরং এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিন।

—আমার ভয় করছে মিষ্টার, সে আবার আসতে পারে। অত্যন্ত কাতর চোখে অবনীভূষণের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

—আপনি ঘুমোন, আমি বরং দরজায় পাহারা দিচ্ছি।

যুবতী আর কথা বলতে পারল না। চোখ জলে ভার হয়ে গেছে।

আর অবনীভূষণের মনে হল দীর্ঘ দিন পর সে এক অসামান্য কাজ করে ফেলেছে। সে বলল, আমি বাইরে বসে থাকছি, আপনি নির্ভয়ে ঘুমোন—বলে অবনীভূষণ দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিল এবং ঠিক দরজার সামনে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার ভিতর পা মুড়ে বসে থাকল এবং জেগে জেগে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখল—দ্বীপের স্বপ্ন, বড় এক বাতিঘর দ্বীপে—সব বড় বড় জাহাজ সমুদ্রগামী। অবনীভূষণ নিঃশব্দে হাঁটু মুড়ে মাথা গুঁজে বসে থাকল—তার এতটুকু নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যেন জীবনের সাত রাজার ধন এক মাণিক, খুবই হাতের কাছে রয়েছে। তাকে গলা টিপে মারতে নেই। সুতরাং সে উঠল না এবং এই দুঃখকর রাত্রি জীবনের প্রথম আলোর পথ বলে মনে হল অবনীভূষণের।

দুই

সমুদ্রে বৃষ্টি পড়ছে। প্রথমে ইলশে-গুঁড়ি, তারপরে জোরে। জোরে বৃষ্টি নামল। মাস্তুলের গা বেয়ে বৃষ্টি ডেক ভিজাল। এখন ফল্কা ভিজছে। গ্যালীর ছাদ থেকে ব্রিজের ছাদ, চার্টরুমের ছাদ সব ভিজছে। কুয়াসা-ঘন ভাব বৃষ্টির। সেলিম ফোকসালে কাসছে। বৃষ্টি, সমুদ্র এবং জাহাজ সেলিমের বুকের যন্ত্রণায় কাতর হল না। বৃষ্টি পড়ছে---পড়ছে। সমুদ্রে তরঙ্গ। জাহাজ নীল জলে নোনা রঙে সাঁতার কাটছে। সেলিম শরীরে কম্বল জড়ালে তখন। ফোকসাল যখন খালি, বাংকে যখন কেউ নেই, জাহাজীরা যখন ডেকে দড়িদড়া টানছে তখন কম্বলের নীচে শুয়ে বিড়ি ধরানো যাক। সে বিড়ি ধরালো এবং কম্বলের নীচে বিড়ির ধোঁয়াকে ফুঁ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। তারপর কম্বলটা দিয়ে গোটা ধোঁয়াকে চেপে ধরে দরজার দিকে তাকাল। কেউ নেই। কেউ সিঁড়ি ধরে নামছে না। সে নিশ্চিন্ত হল। অথচ পোর্টহোলের কাঁচে সমুদ্র এবং আকাশের প্রতিবিম্ব। সেলিম সে কাঁচে নিজের প্রতিবিম্বও দেখল। চোখ-দুটো ওর পালক ওঠা মুরগীর মতো। চোখ-দুটো পোর্টহোলের কাঁচে আকাশ এবং সমুদ্রের মতো নীল হতে পারেনি। সাদাটে অথবা বরফ-ঘরের চার-পাঁচ মাসের বাসি গোস্তের মতো। সেলিম কাসির সঙ্গে রক্তের দলাটা কোঁত করে গিলে ফেলল এবার।

দুপুর থেকে শুনে আসছে---উপকূল দেখা যাচ্ছে। সকলে ডেক-এ চীৎকার করছে---কিনারা দেখা যাচ্ছে। সকলে উপরে হল্লা করছে। সেলিম কোনরকমে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছিল, সেও মাটি দেখবে, মাটি দেখে উত্তেজিত হবে, কিন্তু সিঁড়ির মুখেই সারেঙের ধমক, কোথায় যাচ্ছ মিঞা! মরণের দাওয়াই কানে বাঁধতে চাও। সেলিম ভয়ে ফের ফোকসালে নেমে এসেছিল। সে বাংকে শুয়ে সব যেন ধরতে পারছে---যেন কিছু সমুদ্রপাখী ফল্কায় বসে ভিজছে। পাখীরা ফল্কায় একদা বসতের মতো আশ্রয় নিয়েছে। উপকূল দেখে অথবা দ্বীপ দেখে

ওরা উড়ছে। এমত ভেবে সেলিম কাসল। সমুদ্রপাখীরা হয়ত এতক্ষণে উড়ে গেছে। ওর জানার ইচ্ছা হল ওরা আকাশে উড়ছে, না দ্বীপের পাশাপাশি কোথাও উড়ছে। আর কেন জানি এই সময় বারবার ওর বিবির কথা মনে হচ্ছে। বিবির মুখে সুখের ইচ্ছা, সখের ইচ্ছা। সেলিমের শরীরে যন্ত্রণা, বুকে যন্ত্রণা। সে যেন বলতে চাইল—এবার আমরা ফিরব, বিবি। ছোট ঘরে তুই তোর খসমের মুখ দেখবি। জাহাজ এবং সমুদ্র উভয়ই আমাদের বিনাশ করতে পারেনি। আমি ফিরব, ফিরব। আমরা ফিরব। খতে এমন একটা প্রত্যয়ের কথা লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে সেলিমের।

দীর্ঘ সফর, নোনা পানীর অশ্লীল একঘেয়েমি এত দিন ওকে দেশে ফেরার জন্য মাতাল করতে পারেনি। সেলিম দুবার দুটো ওয়াচ করেছে, ফোকসালে এসে শুয়েছে হাত-পা ছড়িয়ে, অশ্লীল চিন্তা করতে করতে সমুদ্রের বুকে ঘুম গিয়েছে; অথবা হিসাবের কড়ি গুণে—সফর শেষ হতে কত দেরী—এইসব ভেবে স্থান-কাল-পাত্রের কিংবা বন্দরের বেশ্যামেয়ের হিসাবের কড়ি গুণেছে। গুণতে গুণতে ওর একদিন দুটো কাসি উঠল। বিকেলে তিনটে এবং এই করে জ্বর। বন্দর থেকে বন্দর ঘুরে জ্বর বেড়েছে। শরীর ভেঙেছে। শেষে এক বন্দরে কাপ্তানের কাছে আর্জি পেশ করেছে—সাব, একবার হাসপাতালে যাব। কাসির দেমাকে আর বাঁচছি না। মনে হচ্ছে মরে যাব।

এই নিয়ে অন্য ফোকসালে কথা হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল, এ বন্দর নিয়ে পাঁচ বন্দর হবে অথচ সেলিম এখনও জাহাজেই আছে। সেই কবে ফ্রি-ম্যান্টেল বন্দরে ওকে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল, ডাক্তার বলেছিল, আর নয়, আর জাহাজে রাখা চলবে না। বন্দরে নামিয়ে দিতে হবে। হাসপাতালে পাঠাতে হবে। এ-অবস্থায় জাহাজে রাখা নিরাপদ নয়।

সেলিম এখনও জাহাজেই আছে। সে কাসছে। কাসির সঙ্গে রক্ত উঠলেই কোঁত করে ঢোক গিলছে। কিছুদিন থেকে এটা ওর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সে সকলকে বলছে কাসির ব্যামোটা তেমন নয়। ওটা ছেড়ে যাবে। কোম্পানী দামী দামী ওষুধ দিচ্ছে। দিচ্ছে বলেই এবং বাড়ীয়ালা গা করছেনা দেখে সেও বুঝেছে ওটা ধীরে ধীরে সেরে যাবে। কাসি যখন বেশী হয় তখন সেলিম অপরাধের কথা ভাবে। নিজের অপরাধের কথা। বিবিকে নিয়ে অথবা বন্দরে দেখা কোন মেয়েকে নিয়ে বিছানায় পড়ে থেকে অশ্লীল ধারণায় অথবা অশ্লীল আবেগ মেখে শরীরে উত্তাপ সঞ্চয়ের বৃথা চেষ্টা না করলেই হত। অথচ রক্ত কম উঠলে ওষুধে

কাজ করছে এমত ভেবে সে খুশী হয়। ওর ইচ্ছা ওর দুরূহ রোগের কথা কেউ না জানুক, কেউ না ভাবুক সে দুরূহ রোগে ভুগে মরে যাবে। অথচ সে প্রত্যয়ের ঘোরে এই ভেবে খুশী—সে ঘরে ফিরবেই। বিবি তার খসমের মুখ দেখে উজ্জ্বল হবেই। এ-শরীর সে কিছুতেই সমুদ্রে অথবা বিদেশে-বন্দরে রেখে যেতে চাইছে না। সে সকলকে শুধু বলছে—জাহাজ কবে ফিরবে? কবে আমরা ঘরের বন্দর পাব?

জাহাজীরা কেউ বলেছে, সিডনী থেকে পুরানো লোহা নিয়ে জাহাজ যাবে জাপানে।

কেউ বলেছে, গম নিয়ে তেলবাড়ী।

সেলিম এইসব খবরে বিষণ্ণ হয়েছে। খুব অসহায় ভঙ্গীতে পোর্টহোলে মুখ রেখে দিগন্তরেখায় নিজের দেশকে খুঁজেছে। কখনও অপলক সমুদ্র দেখেছে। জলের নীল বিস্তৃতি দেখেছে।

সেলিম স্থির করল কাপ্তানকে শেষবারের মতো বলবে, আমায় দেশে পাঠিয়ে দিন, মাস্টার। ঘরে ফিরে আমি বিবির কোলে মাথা রেখে মরব। জাহাজে আমি মরবনা। সমুদ্রে আমি মরব না। বিদেশ-বন্দবে আমি মরব না। শুয়ে শুয়ে সেলিম এইসব ভেবে উত্তেজিত হতে থাকল।

তখন সিঁড়িতে শিস দিচ্ছে বিজন। সেলিম শুয়ে শুয়ে শুনছে। এ-কেবিন সে-কেবিন সে উঁকি মারল। এন্‌জিন-পরীদাররা ঘুমোচ্ছে। এন্‌জিন-পরীদাররা (যারা চারটা-আটটাব পরীদার) গল্প কবছে। বিজন লক্ষ্য করল শিস দিতে দিতে, সতেরো মাস সফর ওদের ক্লান্ত করতে পারেনি। বিষণ্ণ করতে পারেনি। জাহাজটা আরও যদি সতেরো মাস সমুদ্রের নোনা জল ভাঙে, যদি আরো সতেরো মাস বন্দরে না ভিড়ায় তবু নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে জাহাজ চালিয়ে যাবে। বিজন দ্বিতীয় সিঁড়ির মুখেই শুনল—সেলিম কাসছে। কাসিব জন্য দম নিতে পারছেনা। বিজন আর শিস দিল না। প্রতিদিনের মতো সে ফের সেলিমের জন্য কষ্ট পেতে থাকল। সে ফোকসালে ঢুকে বলল, এবার কাপ্তান সাহেবকে বল্ হাসপাতালে দিতে। এ-ভাবে আর কতদিন বাংকে পড়ে থাকবি। রাতে জাহাজ বন্দর ধরবে।

সেলিম মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরাল। চোখদুটোতে নোনা পানী অথবা আকাশের রঙ নয়, কালো রঙ নয়, অথবা বেতফলের মতো রঙও ধরতে পারেনি—অথচ আশ্চর্য এক রঙ ধরেছে যা দেখলে সকলের ভয় হবে। অথচ

যায়া হবে। সকলের মনে হবে, সেলিম রহমানে রহিম হওয়ার জন্য শরীর স্থির করতে চাইছে। এবং বাংকের সঙ্গে মিশে গিয়ে অদৃশ্য হতে চাইছে।

বিজন বলল, বলিস তো আমরা সকলে মাস্তার দি'। সারেঙকে বলি মাস্তার দিতে। এভাবে আর কতদিন ভুগবি। জ্বর কাসি—দেখেশুনে তো ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।

সেলিম সহসা উঠে বসল। তারপর আশ্চর্যরকমের স্নিগ্ধ এবং করুণাঘন মুখ করে হাসল। তারপর ফের দুঃখময় প্রকাশে বলল, বিজন রে তোর মতো যদি একটু ইংরেজী বুলি জানতাম, তবে আমার সব হত। সারেঙ আর কাপ্তান কি বুদ্ধিই করেছে খোদাই জানে। তুই সকলকে বলে কয়ে মাস্তার দে। আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে বল। দেশে ফিরে বাঁচি।

বিজন এই বাংকে বসে কি করে যেন বুঝল সেলিমের এই দুরূহ রোগ নিয়ে জাহাজে ষড়যন্ত্র চলেছে। সে ভেবে অবাক হল, কেন যে সারেঙকে বলল না, ওকে এবার অন্য ঘরে রাখতে হবে আর অন্য উপায় নেই অথবা কেন যে মেজ মালোমকে ডেকে একবার চিকিৎসার সুব্যবস্থার কথা বলতে পারেনি এতদিন! সেও আজ পোর্টহোল দিয়ে সমুদ্র দেখল। তারপর উপকূল। উপকূলে পাখীরা ফিরে যাচ্ছে। সেলিমের মুখ পাণ্ডুর। জাহাজটা চলছে এবং সেলিমের শরীর নড়ছে। সেলিমকে দেখলে আত্মহননের কথা মনে হয়। বিজন বাংক থেকে ওঠার সময় সেলিমকে ফের লক্ষ্য করল। ওর কম্বলের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সে হাসল। সেলিমও হাসল। ওরা পরস্পর দুঃখটুকু ধরতে পেরে ফের দুজনই অন্যমনস্ক হতে চাইল। বিজন দরজা ধরে বের হচ্ছে। সারেঙের ঘরে উঁকি মেরে সে দেখল, তিনি নেই। ফোকসালে নেই। নিশ্চয়ই মেজ মালোমের কেবিনে অথবা ফরোয়ার্ড-পিকে আছেন। বিজন ডেকের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকল।

বন্দরে জাহাজ ভিড়বে বলে সারেঙ ডেক-কসপের নিকট দড়িদড়া সব বুঝে নিচ্ছে। বিজন ডেক অতিক্রম করে কসপের ঘরের দিকে যাচ্ছে। সে একবার দাঁড়াল। বড় মালোমের পোর্টহোলে উঁকি দিল। বড় মালোম কেবিনে নেই। বিজনের ইচ্ছা হল বলতে বড় মালোমকে—আপনার জাহাজে এমন একটা দুরূহ রোগ পুষে রাখছেন, সেলিমকে হাসপাতালে দেওয়া হবেনা, দেশে পাঠানো হবেনা, কোম্পানীর টাকা বাঁচানো হবে, অন্যান্য জাহাজীরা পর্যন্ত নিরাপদ নয়—এমতাবস্থায়ও আপনারা চুরি করে মদ গিলতে পারছেন!—আশ্চর্য। সে ভেবে

আশ্চর্য হল। সে হাঁটল।

সে সারেঙকে বলল, চাচা, চোখ বুজে আর কতদিন থাকবেন?

সারেঙ ফিসফিস করে বলল, তোমার এত মাথাব্যথা কেন? বেশ তো আছ। সফর করছ। তোমার তো কোন অসুবিধা করছে না কোম্পানী।

—সেলিমের মুখ দিয়ে কফের সঙ্গে রক্ত উঠছে। আপনি জানেন এটা অন্যান্য জাহাজীদের পক্ষে কত ক্ষতিকর। তাছাড়া দেখছি সেলিম বিনা চিকিৎসায় মরে যাবে। এ নিয়ে পাঁচ বন্দর হল অথচ কোন বন্দরেই ওকে হাসপাতালে দেবার ব্যবস্থা করছেন না।

—সব জানি বাপু। সব বুঝি বাপু। অথচ জেনে শুনেও চুপ করে আছি। বাড়ীয়ালার ইচ্ছা নয় সেলিম হাসপাতালে থাকুক। কোম্পানীর অযথা এত খরচ করতে বাড়ীয়ালা রাজী হচ্ছে না।

—তবে ওকে দেশে পাঠিয়ে দিন। দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

দু-একজন করে তখন অন্য জাহাজীরাও ওর চারপাশে জড়ো হচ্ছে। ওরা শুনছে। ওরা সারেঙের মুখ দেখছে। বিজনকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। সেই লঘু পরিহাসজনিত অথবা হাল্কা সুরের শিস দেওয়া মুখ কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। সমুদ্রের উদার নীল বিস্তৃতিতে ওরা কয়েকজন কেমন অসহায়ের ভঙ্গীতে পদচারণা করছে ডেকে। এন্‌জিনের শব্দ, সমুদ্রের তরল ঠাণ্ডা হাওয়া ওদের নিঃশব্দ এই ভাবটুকুকে নিদারুণ দুঃখময় করে তুলছে।

রাত্রিতে সব জাহাজীরা যখন একত্রিত হল, একমাত্র আটটা-বারোটার পরীদাররা যখন নীচে বয়লারে কাজ করছে, যখন ওরা সকলে শুনল, জাহাজ বন্দর ধরবে সকাল দশটায়—রাতে আর পাইলট-বোট আসছে না, ডেক-জাহাজীরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে, তখন ওরা বিজনের ঘরে জড়ো হয়ে বলল, আমরা সকলে একযোগে বিদ্রোহ করব। আমরা সকলে জাহাজ চালাব না। কাপ্তান আসুক, ডেক-সারেঙ, এন্‌জিন-সারেঙ আসুক—কেউ আমাদের নড়াতে পারবে না। আমাদের কথা শুনলে আমরা ওদের কথা শুনব। সেলিমকে হাসপাতালে পাঠালে অথবা দেশে পাঠালে আমরা কাজে যাব। জাহাজ চালাব।

একজন বলল, জাহাজী বলে আমরা গরু-ভেড়া নয়।

অন্যজন বলল, জাহাজী বলে আমরা বিনা নোটিশে মরব তেমন দাসখত দেওয়া নেই।

অথচ দেবনাথ বলল—বিজন, এটা নিয়ে তোমার ক'সফর জাহাজে?

বিজন বিস্মিত হল। দেবনাথ ভালোভাবেই জানে এটা ওর ক'নম্বর সফর। ভালোভাবেই জানে প্রথম সফরে সে কোন্ কোম্পানীর কোন্ জাহাজে কাজ করেছে। তবু দেবনাথ যখন এমন একটা প্রশ্ন করল এবং দেবনাথ যখন খুব জরুরী ভেবে ওকে প্রশ্নটা করেছে তখন একটা যথোচিত উত্তর দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সে বলল, তুমি তো জান, দেবনাথ—এটা আমার দু'নম্বর সফর।

—এখনও তুমি ঠিক জাহাজী হওনি। তারপর কি ভেবে বিজনকে দেবনাথ অন্য ফোকসালে নিয়ে গেল। এখানে কেউ নেই, কেউ থাকে না। জাহাজীরা এখানে কাজে যাওয়ার আগে জামা-কাপড় ছাড়ে। ঘরটা একেবারেই খালি। দেবনাথ ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। এবং বলল, তুমি এর মধ্যে থেক না। শেষে সকলে বেঁচে যাবে, কেবল তুমি মারা পড়বে। কাপ্তান তোমার নলী খারাপ করে দেবে। তখন তোমার পিছনে ওরা কেউ দাঁড়াবেনা। আমি ওদের ভালোভাবে চিনি।

বিজন কথা বলল না। চুপ করে দেবনাথের পরামর্শ শুনল। শেষে জবাব দিল, কিন্তু সেলিম যে মরে যাবে?

—মরে যাবে তো তুমি কি করবে? তোমার উপর ট্যাণ্ডল আছে, সারেঙ আছে—ওরা দেখছেনা, তুমি দেখে কি উপকারটা সেলিমের করবে? এটা মাত্র তোমার দু'সফর। অনেক দেখবে কিন্তু জাহাজে বিদ্রোহ করলে চলবে না।

—তার জন্য কোন প্রতিকারের দাবী আমরা তুলব না।

দেবনাথ খুব অভিজ্ঞ লোকের মতো বলল, বম্বের নৌবিদ্রোহের আমি আসামী। তাই তোমাকে এতগুলো কথা বললাম। তোমাকে মাস্তার দিতে বারণ করলাম। তা ছাড়া আমি এইসব জাতভাইদের চিনি। ওরা শেষ পর্যন্ত তোমার কথা কেউ বলবে না। ওরা ওদের জাতভাইদের কথা বলবে, সারেঙের কথাই শুনবে। মাঝখান থেকে তুমি ব্ল্যাক-লিষ্টেড্ হবে।

বিজন আর কোন কথা না বলে দরজা ঠেলে বের হয়ে এল। সে দেখল, সকলে ওর ঘরে তখনও পরামর্শ করছে। সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। বিজনকে দেখে ওরা বলল, চল মাস্তার দি বোট ডেক-এ।

বিজন দেবনাথের কথাগুলো আর একবারের জন্য ভেবে নিল। আর একবারের জন্য সকলের মুখ দেখল। সকলের মুখ ভয়ানক হয়ে উঠেছে। বিজন বুঝতে পারল—এই সমস্ত মুখের ছবি মিথ্যা হবার নয়। ওরা কখনই ওকে অন্ধকার পৃথিবীতে ঠেলে দেবে না। বিজন দৃঢ় গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তখন

সারেঙ নীচে নেমে এসে ডাকল—ইসকান্দার, সামসুদ্দিন, রহমান, শোভান। ওরা ধীরে ধীরে ঘর থেকে একান্ত বশংবদের মত বের হয়ে যাচ্ছে। সারেঙ বলল, কাপ্তান তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

এই ঘটনায় বিজন খুব ভেঙে পড়ল। এবং অসহ্য উত্তেজনায় ভুগতে থাকল। প্রচণ্ড শীতের ভিতর সে ওর নিজের ঘরে পায়চারি করছে। দেবনাথ উপরের বাংকে শুয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে। পোর্টহোল দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে বলে বিজন কাঁচটা বন্ধ করে দিল। সারেঙের সেই রক্তচক্ষুর কথা মনে হল এবং ভাবল কত সহজে সব নাবিকদের নিয়ে সে উপরে উঠে গেল। সে এই ফোকসালে, এই ঠাণ্ডায় পায়চারি করতে করতে ধরতে পারছে। ধরতে পারছে—সারেঙ ওদের কি বলছে এবং কি বলে ওদের ভয়ানক প্রত্যয়কে ভেঙে দিচ্ছে। সেলিম এখনও কাসছে তার ফোকসালে—ফোকসালের অন্য বাসিন্দা কোরান-শরীফ পাঠ করছে বাংকে। সে পায়চারি করতে করতে সব শুনল। জাহাজটা নোঙর ফেলে আছে বলে স্টীয়ারিং-এন্‌জিনে কোন শব্দ নেই। সব কেমন নিঃসঙ্গ, সব কেমন নিঃশব্দ যেন। ডেক থেকে সারেঙের কথা ভেসে আসছে। সকলকে সারেঙ জোর গলায় কথাগুলো বলল। ব'লে ওদের ভয়ানক বিদ্রোহের প্রতিবিম্ব মুছে দিল। সারেঙ ওদের বলল, তোরা তো জানিস কলকাতা বন্দরে চল্লিশ হাজার নাবিক খোদা হাফেজ বলত, এখন কিছু কিছু লোক ঈশ্বর, ভগবান বলতে সুরু করেছে। তোরা যদি বাঙালীবাবুদের কথায় মাতিস, তোরা যদি জাহাজে বিদ্রোহ করিস তবে তোদের চল্লিশ হাজার চল্লিশে নামতে আর বেশী দেরী নেই।

এক সময় কাপ্তান সারেঙকে ডেকে পাঠালেন।

ব্রিজ থেকে কাপ্তান বললেন, কি বলছে সব ?

ভাঙা ভাঙা ইংরেজী এবং হিন্দিতে ডেক-সারেঙ বলতে থাকল, সব গুড, সাব। সব ঠিক হ্যায়। জাহাজী লোক ভেরী গুড, সাব। বাঙালী বাবুলোক নো গুড, সাব। বাঙালী বাবুলোক গিভ্‌স্ ট্রাব্‌ল্। বাঙালী বিজন, ইয়েস বিজন তেইশ রুপায়াকা খালাসী, ও তো সাব রিংলীডার আছে। ছুঠো-চারঠু ইংলিশ স্পীকিং আছে, সাব। প্যাসেণ্ট্‌কে লিয়ে কুচ ফাইট দেনে মাংতা। লেকিন নাও অলরাইট, সাব। বিগ্ বিগ্ টক্ লেকিন নো জব্। ভেরী লেজী বাগার। সারেঙ এই পর্যন্ত বলে পায়ের কাছে থুথু ফেলল। ফের মুখ তুলতেই দেখল বাড়ীয়ালা নিজের কেবিনে ঢুকে গেছেন। কেবিনে পেয়ালা-পীরিচের শব্দ। নীচে অফিসার-গ্যালারীতে চীফ কুক আগুন পোহাচ্ছে। সিঁড়ি ধরে নামবার

সময় সে এখানেও থুথু ফেলল।

সমুদ্রে সূর্য উঠছে। একদল পাখী উড়ছে আকাশে। দূরে ইতস্তত জাহাজ নোঙর করা। অনেকগুলো বয়া অতিক্রম করে পাইলট-শিপ। অনেকগুলো জেলেডিঙি এই শীতের ভোরেও মাছ ধরতে বের হয়ে পড়েছে। আকাশ নীল, সমুদ্র নীল। জাহাজের চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বের হয়ে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। ওরা সমুদ্র ধরে উপকূলে উঠে যাচ্ছে। উপকূলের স্কাই-স্ক্র্যাপারগুলো ম্যাচবাক্সের মতো মনে হচ্ছে। এইসব দেখার জন্য জাহাজীরা ডেকে দাঁড়াল। অথবা দড়ি-দড়া টানার জন্য ডেক থেকে টুইন-ডেকে নেমে যাচ্ছে। এখন ওরা দড়িদড়া টানছে। হাসিল নীচে নামিয়ে দিতে চাইছে। মেজ মালোম গলুইয়ে চলে এসেছেন। বড় মালোম ফরোয়ার্ড-পিকে চলে গেছেন। বিজন হাসিল কাঁধে বড় মালোমের পিছনে ছুটছে। তিনটে টাগ্‌বোট এসেছে, পাইলট এসেছেন। পাইলট ডেক থেকে বোট-ডেকে এবং শেষে ব্রিজে উঠে গেলেন।

বড় মালোম বললেন, গতকাল তুমি জাহাজীদের উত্তেজিত করেছিলে?

বিজন হাসিল পায়ের নীচে রেখে বলল, হ্যাঁ, স্যার। করেছিলাম।

—আমি খুশী হয়েছি শুনে। বড় মালোম কসপকে স্টোর-রুমে যেতে বলে এ-কথাগুলো বিজনকে বললেন।

ওদের ভিতর আর কোন কথা হল না। একদল জাহাজী ফরোয়ার্ড-পিকে উঠে গেছে। ওরা ওয়ারপিন ড্রাম ঘুরাচ্ছে, ওরা উইঞ্চ চালাচ্ছে। তারপর হাপিজ-হাড়িয়া এই ধরনের কিছু শব্দ। বিজন এবং অন্যান্য জাহাজীরা প্রায় আধঘণ্টা ধরে ফরোয়ার্ড-পিকে কাজ করল, বিজন এবং অন্যান্য জাহাজীরা সেলিমের দুঃখ, বন্দরের জীবন এবং দেশে ফেরার অথবা জাহাজে প্রথম দিনের গল্প নিয়ে কিছু সময় মস্করা, কিছু কাঁচা খিস্তি করল। কাজ শেষ হলে নীল উর্দি ছেড়ে ওরা দাঁড়িয়ে থাকল ডেকে। কেউ নীচে নামল না। খাড়ি ধরে জাহাজ বন্দরে ঢুকছে। ওরা দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দৃশ্য দেখল। সমুদ্রের খাড়ি ধরে জাহাজ বন্দরে ঢুকছে। দুপাশে পাথরের পাহাড়; অতিকায় তিমি মাছের মতো কালো কালো সব পাথর। পাথরের পাহাড়। কুৎসিত এইসব পাথরের পাশে ছোট ছোট অনেকরকমের ফার-জাতীয় গাছ। পাতাগুলো শীতের হাওয়ায় কাঁপছে। নীচে সব নৌকো-বাইচ হচ্ছে। দুপাশের জনতা চীৎকার করছে। এইসব দৃশ্যে ওরা সকলে মাটির গন্ধ নিতে চাইল এবং এই জনতার মতো উন্মত্ত হতে চাইল। এইসব দৃশ্য দেখে বিজন জাহাজী যন্ত্রণার উপশম খুঁজছে।

অথচ বিজন দীর্ঘ দু'সফরে প্রকৃত জাহাজীর মতো বাঁচতে গিয়ে মাঝে মাঝে খুব বিব্রত হয়ে পড়ছে। পরিবারের কিছু সংস্কার, বিশেষত ধর্মের—সে কিছুতেই ছাড়তে পারছে না। এখনও বীফ্-গ্যালারীতে এলে সে ভালোভাবে খেতে পারে না। দেবনাথের মতো গোমাংস-ভক্ষণে তৃপ্তি নেই। জাহাজীদের প্রচণ্ড রকমের ইতর জীবনকে সে গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ এইসব ইচ্ছাগুলো তাকে মাঝে মাঝে টানে। তখন সে কাঁচা খিস্তি করে, শিস দেয়, অযথা ফোকসালে বসে বড়ের টব বাজায় এবং কাপ্তান ও তাঁর পারিষদদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে।

বিজন একদা কিছু লেখাপড়া করেছিল অর্থাৎ গ্রামের বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করেছিল। অন্য দশটা অসামাজিক ছেলেছোকরার মতো বাড়ী পালিয়ে জাহাজের খালাসীতে নাম লেখায়নি। বেঁচে থাকার জন্য এবং এই জীবনকে আরও দীর্ঘ করার জন্য এই জাহাজের কাজ, জাহাজী হওয়া। 'হালিসহর' এবং 'ভদ্রা'র ট্রেনি শেষ করেছে একদা, জাহাজের প্রথম সফরে দুনিয়া ঘুরেছে এবং ইংরেজী বুলিতে রপ্ত হয়েছে। জাহাজী হয়ে উপরী পাওনা হিসাবে চটপট পরিবেশকে মানিয়ে চলার স্বভাব এবং দেহজ আবেগধর্মিতার জন্য মানুষের ভালো করার সুকোমল বৃত্তির কিছু অধিকার সহজে পেয়ে গেছে। সেজন্য সেলিমকে কেন্দ্র করে একটি অশেষ দুঃখ ওকে এখনও মাঝে মাঝে উত্তেজিত করছে। খাড়ির সঙ্কীর্ণতা এবং মানুষের এই আনন্দ সেই অশেষ দুঃখকে যেন আরো বাড়িয়ে দিল। সে বড় মালোমকে বলল, কতদিন থাকব এখানে স্যার? যেন তার জাহাজ ভালো লাগছে না।

বড় মালোম বললেন, বলতে পারছি না। এন্জিনরুমে ইন্‌স্‌পেক্‌শান্ আছে।

সারেঙ বলল, সরফাই হবে জাহাজে। জাহাজ বন্দরে বসবে। ঠিক তখনই বিজন দেখল দুজন জাহাজী সেলিমকে ধরে ধরে বোট-ডেকে নিয়ে তুলছে।

কাপ্তানের সামনে দাঁড়িয়ে সেলিম বলল, সাব, আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। সারেঙ ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথাটা অনুবাদ করে শোনাল।

কাপ্তান বললেন, আমিও তাই চাইছি। হাসপাতালে দিলে তোমাকে ওরা সহজে ছাড়বে না। জাহাজ এখান থেকে তোমার দেশেই যাচ্ছে। এই বলতে গিয়েই দেখলেন কাসির সঙ্গে সেলিমের মুখে রক্ত। সকলের সামনে ধরা পড়ে যাবে ভয়ে সে এখানেও কফটা গিলে ফেলল। কাপ্তান ব্যাপারটা উপলব্ধি করলেন। তাহলে অসুখটা অনেকদূর গড়িয়েছে। কোম্পানীর ওষুধ এবং ইনজেকশন কোন কাজে আসেনি। তিনি সারেঙকে ডেকে বললেন, ওকে সকলের

সঙ্গে রাখা চলবেনা। ওকে ওপরে তুলে আন এবং কোন খালি কেবিনে ফেলে রাখ। ওর ভাতের থালা এবং মগ ভিন্ন করে দাও। তোমরা কেউ ওর জিনিস-পত্র ব্যবহার করবে না। কাপ্তান সারেঙকে অন্যত্র নিয়ে কথাগুলো বললেন। বললেন, সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে সেলিম দুরূহ রোগে ভুগছে। যে কটা দিন বাঁচে এ-জাহাজেই বাঁচুক।

তারপর তিনি সেলিমের সামনে এসে বললেন, জাহাজ বন্দরে ভিড়লেই তোমাকে কোম্পানীর ভালো ডাক্তার দেখানো হবে। আশা করছি তুমি শিগ্‌গীরই ভালো হয়ে উঠবে। 'ঈশ্বর তোমায় করুণা করুন' এই বক্তব্যে তিনি স্বয়ং যেসাস-এর মতো চোখ বুজলেন।

বাড়ীয়ালার এই পাদ্রীসুলভ চেহারাতে সারেঙ বিমুগ্ধ হল। পীরপয়গম্বরের মতো তিনি হয়ত কোন ওক্তে সারেঙকেও দোয়া জানাবেন। সে এবারে বলল, সাব, ইউ ফাদার। ইউর শিপ, ইউর ম্যান, ইউ সি সাব এভরিথিং। সারেঙ এইসব বলে এই মুহূর্তে দোয়া ভিক্ষা করছে। অর্থাৎ সেলিমের প্রতি বিগলিত করুণার অংশীদার হতে চাইছে।

বিজন ডেকে কাজ করতে করতে সব দেখল। সে জাহাজ জেটিতে বাঁধতে দেখল। বন্দরের পথ ধরে সব সহরবাসীরা সামনের ঝুলন্ত ব্রিজের দিকে যাচ্ছে। কিছু টিনের শেড্ অতিক্রম করে মাঠ। সেখানে মেয়েপুরুষরা এই শীতেও ক্রিকেট খেলছে। সে দেখল সেলিমকে ডেকের উপর দিয়ে দুজন লোক সেই নিঃসঙ্গ কেবিনটায় নিয়ে যাচ্ছে। সেলিম সেখানে থাকবে, সেখানে খাবে, সেখানে শোবে। বিজন এও বুঝল যেন সেলিম আর বেশীদিন বাঁচবেনা। জাহাজের ওই ঘরটাতেই অন্যদিন বিজন এবং অন্যান্য কয়েকজন জাহাজী মিলে কিছু পাথর, ছুটো বড় গানী-ব্যাগ যত্ন করে এক কোণায় রেখে দিয়েছিল। জাহাজে মৃত্যু হলে সমুদ্রে এইসব পাথর এবং গানী-ব্যাগ দিয়ে সলিল-সমাধি দেওয়া হবে। দেহজ আবেগ-ধর্মিতার জন্য ওর সুকোমল বৃত্তিরা ওকে ফের অশেষ দুঃখময় যন্ত্রণাতে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কাপ্তানের নিষেধ আছে বলে সে আর ঘরে ঢুকল না। পোর্টহোলের কাঁচ ফাঁক করে দেখল, সেলিম বাংকে শুয়ে সেই পাথর এবং গানী-ব্যাগগুলো দেখছে। শরীরটা ওর স্থির। সে এখন কফ চুরি করে গিলে খাচ্ছেনা। এখন সে নীচের পাত্রে কফ ফেলছে। এবং সঙ্গে কিছু রক্ত পুঁজ ফেলছে। পোর্টহোল দিয়েই বিজন কথা বলল, বিকেলে ভাবছি কিনারায় যাব। তোর জন্য কিছু আনব কি?

—কি আর আনবি। মুখে আমার বিস্বাদ শুধু।

—কিছু কমলা, কিছু আপেল ?

—সে অনেক দাম। অত দামের ফল আনবি না। আমার টাকার বড় দরকার, বিজন। দেশে ফিরব। শরীরের চিকিৎসা আছে, বিবি আছে, বাচ্চা আছে। ওদের জন্য ঘর করতে হবে। জমি করতে হবে। ঘর জমি হলে জাহাজে আর সফর দেব না। জমি-জিরাত দেখে, বিবি বাচ্চা দেখে আল্লার ঘরে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব।

বিজনের মুখে বিষণ্ণ হাসি। পোর্টহোলের কাঁচ বন্ধ করে দেবার সময় সে ইচ্ছা করেই সেলিমের শরীর থেকে জোর করে চোখ তুলে নিল। ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ির ভিতর যে মুখ, যে মুখে একদা বসন্ত হয়েছিল, যে শরীর বাচ্চার জন্ম দিয়েছে—সেই মুখ. শরীর এবং দাড়ি ওর চোখের সামনে মৃত অক্টোপাসের মতো পচা দুর্গন্ধময় ফুলোফুলো সব হয়ে যাচ্ছে। সে জোর করে পোর্টহোলের কাঁচ বন্ধ করে দিল এবং ভয়ে চোখ বুজে ফেলল।

ভোর থেকেই সমুদ্র হতে হাওয়া উঠে আসছে। ঠাণ্ডা হাওয়া। বিকেলে সে-হাওয়ার গতি আরো বাড়ল। প্রচণ্ড শীতে বিজন ওভারকোটের পকেটে হাত ঢোকাল এবং কোনরকমে ম্যাচটা বের করে সিগারেট ধরাল। এখানে হয়ত দু'দিন পর বরফ পড়বে, সে এমত ভাবল। প্রচণ্ড শীত মাটির শেষ উত্তাপটুকু যেন শুষে নিচ্ছে। দূরে পাইনগাছগুলো থেকে পাতা ঝরছে। গাছগুলো ক্রমশ হাল্কা করছে শরীর। তারপর একদিন এই শীতের দৃশ্য প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রস্তরীভূত হবে যেন পাইনগাছগুলো। পাখীরা এদেশে থাকবে না। ওরা অন্য দেশে পালাবে। ওরা অন্য দেশে ঘর বাঁধবে। আর্শির মতো আকাশ। রোদের উত্তাপশূন্য হলদে রঙ জাহাজের উপর ছায়া ফেলে অনেকদূর চলে গেছে। পাইনের শাখাপ্রশাখায় পাখীর বাসাগুলো ঝুলছে। রোদ সেখানেও যেন চুরি করে উত্তাপ দিচ্ছে। তারপর জেটি অতিক্রম করে পথ। সে পথের মেয়েপুরুষদের দেখতে দেখতে নীচে নেমে গেল। একটি বাদামগাছের নীচে দাঁড়াল। এখানে দুটো পথ। সে কোন্ পথে যাবে এমত চিন্তা করল দাঁড়িয়ে।

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর বন্দর ধরলে এক অনন্য সুখের সন্ধান সে পায় এই মাটির স্পর্শে। বাদামগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ মাটির স্পর্শ নিয়েছিল। সামনে শুধু সহর। ইট কাঠ। মাটির কোন গন্ধ নেই সেখানে। সেখানে শুধু যানবাহন কিছু কোরীপাইনের ছায়া পথের দু'পাশে অথবা এভিন্যুর মোড়ে মোড়ে আলো

জ্বলছে—কাঁচের ঘর, মাংসের দোকান, রেস্তোরাঁ, কাফে, পাব্। কোথাও ডেইজী ফুলের প্রদর্শনী অথবা আরো পিছনে সমুদ্রের খাঁড়ির অভ্যন্তরে নৌকা-বাইচ। এইসব ভালো লাগলেও মাটির স্পর্শেব মতো সুখপ্রদ নয় যেন এরা। তবু সে হাঁটছে। তবু এই মানুষেব ভীড়ে মাটির গন্ধের জন্যে হারিয়ে যেতে ভালো লাগছে। সে দেবনাথের সঙ্গে বের হয়নি। দেবনাথ জাহাজ থেকে নেমে প্রথমেই কোন পাব্ অনুসন্ধান করবে, প্রথমে পেট ভবে অন্তত বিয়ার খাবে এবং মাতলামো করে সমুদ্রের নীল যন্ত্রণা কিছু সময়েব জন্যে ভুলে থাকবে। কোন পাব্ অথবা কুকুরের রেসে না গিয়ে এখন শুধু এইসব সুন্দরী বমণীদের ভীড়ে বিজনের হাবিয়ে যাওয়া। সে এই ভীড়ে হাবিযে যেতে চায়। কেমন এক অশ্লীল শবীরী চিন্তায় দু'দণ্ড সে ওদের সঙ্গে কথা বলে সুখ পায়। অথচ সে ওর দেহজ কামনাকে রূপ দেবার ভঙ্গিটুকু এখনও ইচ্ছা কবে আবিষ্কার কবেনি। মূলত সে ভালো ভাবের জাহাজী হয়ে বাঁচতে চায়।

সে একটা দোকানে ঢুকে কিছু ফল কিনল সেলিমেব জন্য। মেয়েটি ওর হাতে ফলের প্যাকেট দিয়ে মাথা নোয়াল এবং হাসল। বিজন একগুচ্ছ মিমোসা ফুল দেখেছিল মিসিসিপি নদীর তীবে—কোন যুবতী ওকে ফুলের গুচ্ছটি দিয়েছিল, এ-মেয়েব হাসি সে-যুবতীকে স্মৃতির কোঠায় এনে দিল।

সে ফলের দাম দিয়ে প্যাকেট হাতে রাস্তায় নেমে এল। ফেল্ট-ক্যাপটা আর একটু টেনে দিল কপালেব উপব। এবং ওভারকোট টেনে পথের ভীড়, বিশেষ করে পথের সব সুন্দরী রমণাদের দেখতে দেখতে ঝুলন্ত ব্রিজের রেলিঙে এসে দাঁড়াল। সমুদ্র থেকে এখন তেমন জোরে হাওয়া উঠে আসছেনা। সে এখানে দাঁড়িয়ে তা টের পেল, দুটো খোলা গাড়ীতে পুরুষ-রমণীরা হাসতে হাসতে বন্দর থেকে সহরে উঠে যাচ্ছে। দুজন যুবক-যুবতী পরস্পর কোমর ধরে হাঁটছে। সে দেখল—ওরা দুজন নেমে যাচ্ছে এবং নীচে নেমে ব্রিজের থামের আড়ালে দাঁড়াল। সে স্পষ্ট দেখল ওরা দুঃসহ যন্ত্রণার ফলভোগে পীড়িত হচ্ছে। এইসব দেখে বিজন হাঁটতে পারছে না। সস্তায় কিছু মদ এবং সস্তায় যৌন সংযোগের তাড়নায় সে বিব্রত হয়ে পড়ল। নাইটিঙ্গেল ধরে রাত যাপনের ইচ্ছায় সে পীড়িত হতে থাকল। অথচ যেমন করে প্রতি বন্দরে এ-ইচ্ছার জন্ম হয়েছে এবং যেমন করে প্রতি বন্দরে এ-ইচ্ছার মৃত্যুকামনা করেছে আজও সেমত ধারণার বশবর্তী হয়ে সে হাঁটতে থাকল। ভালভাবের জাহাজী হতে গিয়ে সে গোলাপী নেশা করে জাহাজে ফিরবে এমত ভাবল।

সে জাহাজের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে এল। সেলিমের ফোকসালের দরজা বন্ধ। দরজার সামনে সে দাঁড়াল। ডাকল—সেলিম, ঘুমিয়ে পড়েছিস?

সেলিম উঠে দরজা খুলছে। সে বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছে দরজা খুলতে সেলিমের খুব কষ্ট। তবু সেলিম দরজা খুলবে এবং ওকে একটু ওর পাশে বসতে বলবে। দু'দণ্ড গল্প করতে চাইবে। দেশের গল্প, জোত-জমির গল্প। বিবি-বাচ্চার গল্প। অথবা মাছ এবং বনমুরগী ধরার গল্প। অথবা বর্ষাকালে কোড়া ধরবার সময় ধানক্ষেতের আলে কেমন করে নৌকায় ঘুপটি মেরে পড়ে থাকতে হয় তার গল্প। তখন দেখলে মনে হবে সেলিম যেন এ-জাহাজেও কোড়া ধরছে। কোড়া শিকার করছে।

দরজা খুললে সে ফলগুলো সেলিমের হাতে দিয়ে বলল, তোর জন্য এনেছি।

—এতগুলো!

বিজন একটু হেসে বলল, ভয় নেই। এবারেও তোর কাছে টাকা চাইব না। আমি তোকে খেতে দিলাম।

বিজন বাইরে এসে দাঁড়ালে সেলিম বলল, কোন খবর পেলি? জাহাজ কোথায় যাচ্ছে, কবে ছাড়ছে?

—ঠিক কিছু বলা যাচ্ছেনা। এজেন্ট-অফিস থেকেও কোন খবর আসেনি। বড় মালোম শুধু বললেন, জাহাজে সরফাই হবে। কাল সব সাহেব-সুবোরা আসবেন। এন্‌জিন-রুমে মেরামতের কাজ আছে অনেক। জাহাজ এখানে কতদিন বসবে কাপ্তান নিজেও বলতে পারেন না।

এবার চুপি চুপি সেলিম বলল, জানিস, কাপ্তানকে আমি বললাম, সাব আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। দেশে গেলেই আমি ভালো হয়ে উঠব। কাপ্তান বললেন, সেজন্যই তো তোমাকে হাসপাতালে দিচ্ছিনা। একবার হাসপাতালে গেলে তোমাকে ওরা সহজে ছাড়তে চাইবে না। তার অনেক আগে তুমি দেশে পৌঁছে যাবে।

বিজনের বলতে ইচ্ছা হল, তা ঠিকই যাবি। তার আগেই যাবি। সে বিরক্তিতে ফেটে পড়ল। সারেঙ এবং কাপ্তান মিলে সেলিমকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সে আর কোন কথা বলতে পারল না সেলিমের সঙ্গে। সেলিমের বিষণ্ণ দৃষ্টি ওকে অত্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সে ডেকে এসে নামল। কী মানুষটা কী মানুষ হয়ে গেল, ভাবল। সে সিঁড়ি ধরে ফের উপরে উঠছে। সমস্ত জাহাজে অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গতা। জাহাজের উপরে এখন যেন কেউ কোথাও নেই।

কিছু কিছু জাহাজী বন্দরে নাইটিঙ্গেল ধরতে বের হয়ে গেছে—তাদের ফিরতে দেরী হবে। যারা শুধু নেশা করে ফিরবে তারা একটু বাদেই ফিরবে। বিজন গলুই ধবে হাঁটল। সে এখানে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেট ধরাল। অন্য জেটিতে কাজ হচ্ছে বলে তার কিছু শব্দ। নীল আর্শির মতো আকাশ। আকাশে নক্ষত্র জ্বলছে। সে দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে আকাশ, নক্ষত্র, সমুদ্রগামী জাহাজের আলো অথবা গ্যালীর পাশে ইঁদুবেব ঘব দেখলো। কাল ভোবে এ-জাহাজের মাল নামতে সুরু করবে। অন্ধকাব বাত থেকে সব লোক উঠে আসবে ডেকে। ওরা কাজ করবে, গ্যালীর আগুনে ওবা হাত-শবীব গবম কববে। আব তখন বাংকে পড়ে পড়ে দেশের কথা ভাবতে ভাবতে কাসবে সেলিম।

ভোরবেলায় বিজন এন্‌জিন ঘরে নেমে গেল। তখন সমস্ত ফল্কায় কাজ হচ্ছে। উইঞ্চ-ড্রাইভারবা সিগারেট ধরাবার ফুবসত পাচ্ছেনা। ক্রেন-মেশিন-চালকেরা টুপি মাথায় নীচেব ফল্কায় উঁকি মারছে। ফল্কায় ফল্কায় সব কুলীদেব কোলাহল। এজেন্ট-অফিস থেকে ক্লার্ক এসেছেন। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছেন। মেজ মালোম দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন এক ফল্কা থেকে অন্য ফল্কায়। পাঁচ ফল্কায় পাঁচজন লোকের মুখে হাড়িয়া-হাপিজ শব্দ। মাল জাহাজ থেকে উঠছে, ফের বন্দরে নেমে যাচ্ছে।

এইসব দৃশ্যগুলো এখন জাহাজেব ডেকে ঝুলছে।

গ্যালীতে ভাণ্ডারী নেই। বাটলারের ঘরে সে ক্রু-দেব রসদ আনতে গেছে। ব্রিজে কাপ্তান পায়চারি করছেন। মেজমিস্ত্রী নীচে নেমে গেছেন। বড়মিস্ত্রী এইমাত্র হাই তুলতে তুলতে টর্চ হাতে নীচে নামছেন। বন্দর থেকে সব কিনারার লোক উঠে আসছে। ওরা ডেক অতিক্রম করে এন্‌জিন-রুমে নেমে গেল। বড়মিস্ত্রী ওদের নিয়ে সব এন্‌জিন-রুমটা ঘুরলেন। বয়লারের ঘর দেখালেন। ছয়টা বয়লারের ট্যাঙ্ক-টপ, চক্, টানেল পথ, কন্‌ডেন্‌সার, এমনকি স্মোক-বক্সগুলো পর্যন্ত। তারপর ওরা বাংকারে বাংকারে ঘুরল। বিজন অন্ধকারে কোণে দাঁড়িয়ে সব দেখল। ওরা উপরে উঠে যাচ্ছে। সে ওদের দেশীয় ইংরেজী কথাগুলো কিছু কিছু ধরতে পারছে। জাহাজ এখানে বসবে অনেকদিন—এমত ওরা যেন বলল। যেন বলল, জাহাজে অনেক কাজ, জাহাজডুবি হয়নি—জাহাজীদের সৌভাগ্য।

বিজন যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেটা পোর্টসাইডের বয়লারের নীচু অংশ। হাঁটু পর্যন্ত ছাই জমে আছে এখানে। নীচে কিছু পুরানো ব্যোলচে, শাবল, র‍্যাগ, স্লাইশ। কিছু কায়ার-ব্রিজের প্লেট। ওপরের আলোটা নেই। এখানে অন্ধকার। সে এখান থেকে এন্‌জিন-কসপের ঘরে উঠে গেল। ডেক-কসপের জন্য ছুটো ভামার

প্লেট চাইল। তারপর সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতেই বন্দরের একজন শ্রমিক বলল, গুড মর্নিং, মিস্‌টার।

—ইয়েস, গুড মর্নিং।

বিজন বুঝল লোকটি কাজের ফাঁকে ওর সঙ্গে একটু গল্প করতে চায়। লোকটি হয়ত সস্তায় সিগারেট কিনতে চায়।

লোকটি ফের বলল, ইয়্যু গ্যাণ্ডিম্যান?

বিজন বলল, ইয়েস্।

—দেবনাথ গ্যাণ্ডিম্যান?

বিজন বলল, ইযেস্।

দেবনাথের সঙ্গেও ওর আলাপ হয়েছে দেখে বিজন বিস্মিত হল।

লোকটি ফের বলল, অল্ ড্যাডিওয়ালা পাকিস্তানী?

লোকটি তবে এইসব খবরও রাখে। সে বলল, ইয়েস্।

বিজন হেঁটে যাচ্ছে ডেক ধরে। শ্রমিকটি ওর পিছু পিছু এল। এবং পকেট থেকে একটি ইউক্যালিপটাসের বোতল বের করে বলল, ইট্‌'স্ ফর ইউ।

বিজন এবারেও আশ্চর্য হল। দামী এই অয়েলটুকু পেয়ে বিজন খুব খুশী হল। বলল, কাম্ অন্। কত দাম দিতে হবে?

—কোন দাম নেই। আমাকে এক শিশি সরষের তেল দেবে। দেবনাথও দেবে বলেছে। তেলটা আমি মাথায় দিচ্ছি। ইণ্ডিয়া থেকে জাহাজ এলেই আমি এ-তেলের জন্য ডেকে কাজ নিয়ে উঠে আসি। তেল সংগ্রহ করি এবং তেলটা মাথায় দি'। রাতে আমার ভালো ঘুম হয়।

ওরা সেলিমের কেবিন অতিক্রম করার সময় সেলিম পোর্টহোলের ভিতর থেকে কয়েদীর মতো উঁকি দিল। সেলিম বাংকে বসে পোর্টহোল দিয়ে এইসব মানুষদের কাজ দেখছে। হাড়িয়া-হাপিঙ্গের শব্দ শুনছে। ড্যারিক উঠতে নামতে দেখছে। এইমাত্র এই পথ দিয়ে বড় মালোম গেলেন। দুটো মেয়ে গেল—বোধহয় বড়মিস্ত্রীর ঘরে অথবা ছোটমিস্ত্রীর বাংকে। সে এখানে বসে দূরের পাইনগাছ দেখতে পেল। এবং পোর্টহোলের কাঁচ দিয়ে বিজনকেও চলে যেতে দেখল।

শ্রমিকটি বলল, ম্যান ইজ্ সিক্।

সে বলল, ইয়েস্, সিক্। টিবিতে ভুগছে।

—টিবিতে ভুগছে! হাসপাতালে দিচ্ছে না! বড় আশ্চর্য! যেন শ্রমিকটি

ঝুপ করে আকাশ থেকে পড়ল।

—বড় আশ্চর্য! বিজন হাঁটতে থাকল। লোকটি ওর পাশাপাশি হাঁটছে। সে বলল ফের, এ নিয়ে পাঁচ বন্দর ঘোরা হল। কাপ্তান এতদিন হাসপাতালে দেবেন-দেবেন করছিলেন, এখন শুনতে পাচ্ছি দেওয়া হবেনা। জাহাজ দেশে ফিরবে। সেও দেশে ফিরবে।

—এসব দেখেও তোমরা চুপ করে আছ!

বিজন দেখল লোকটি যেন এই মুহূর্তে বিদ্রোহ করে সকলকে জানাতে চাইছে—জাহাজে একজন জাহাজী টিবিতে ভুগছে অথচ ওকে হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছেনা, কাপ্তান কোম্পানীর টাকা বাঁচাচ্ছে। আপনারা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পেশ করুন।

শ্রমিকটিকে বেশ চিন্তিত দেখাল। পাশের অন্যান্য কুলীলোকদের সে ঘটনাটা খুলে বলল। ওরা সকলে একত্র জমা হচ্ছে। ওরা এই নিয়ে জটলা পাকাতে চাইছে যেন। ওরা যেন বলতে চাইছে—তোমরা সেলর, তোমরা এইসব সমুদ্রগামী জাহাজগুলোকে বন্দর থেকে বন্দরে নিয়ে যাও, ঝড়ের দরিয়া পার করে জাহাজের কোম্পানীর প্রতিপত্তি বাড়াও—আর তোমাদের চিকিৎসা হবে না, তোমাদের জন্য হাসপাতালের বন্দোবস্ত থাকবে না, কোম্পানী বেইমানী করবে, তোমরা ভেড়ার মতো ঘাস খাবে—সে ঠিক কথা নয়। তোমরা বিদ্রোহ কর। সে বিদ্রোহে আমরা যোগদান করব। তোমাদের একতার অভাব, আমাদের একতা ইচ্ছা করলে ধার নিতে পার। দেউলিয়া হবার ভয় নেই।

ভিতর থেকে লম্বা লোকটি বের হয়ে বিজনকে বলল, ইউ বেটার গো টু মিষ্টার ট্রয়। তিনি সিম্যান-ইউনিয়নের সেক্রেটারী। ঠিকানা—পাচ কলিন ষ্ট্রীট। ষ্টেশনের পাশ দিয়ে যে বড় এভিন্যুটা পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে সেখানে গিয়ে খোঁজ করবে। তাঁকে পেলে, ঘটনাটা খুলে বলবে। তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

বিজন ওদের ধন্যবাদ জানাল। এবং কেবিনে ঢুকে লোকটিকে এক বোতল সরষের তেল দিয়ে বলল, ইউ হ্যাভ্ ডান এনাফ্। আমি আজই মিঃ ট্রয়ের কাছে যাব।

অথচ সে দেবনাথের মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিল—এইসব আবেগধর্মিতার লক্ষণগুলো ভালো নয়। সেলিমের উপকার করে তোর কি স্বার্থের হবে এমত ভাব দেবনাথের মুখে। সুতরাং স্পষ্টতঃই দেবনাথ যেতে রাজী হল না।

বিকেল। শীতের বিকেল। চারটে না বাজতেই শীতের সমুদ্রে অলস সূর্য

উত্তাপেব জ্বালায় ডুব দিচ্ছে। গাছগুলো নেড়া নেড়া। ইউক্যালিপটাসের পাতা খসে পড়ছে। আকাশ থেকে যেন শীতের তুষাব ঝরছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা—হাত-পা জমে যাবে ভাব। বিজন হাতেব দস্তানা টেনে দিল। টুপিতে কপাল ঢেকে দিল। তারপব ধীবে ধীবে গ্যাংওয়ে ধরে নেমে গেল। সমুদ্র থেকে শীতেব হাওয়া ফের উঠে আসছে।

ইচ্ছা হল বন্দরে নেমে ট্যাক্সি করাব। ইচ্ছা হল দু'শিলিং-এব আপেল কেনাব। এবং ইচ্ছা হল এভিন্যুব টিন-কাঠেব ঘবেব ভিতব ঢুকে দু'দণ্ড জুয়া-খেলাব। তবু সেলিমেব জন্য আপাতত হাঁটতে থাকল সে। ধীবে ধীবে হেঁটে গেলে ঝুলন্ত ব্রিজ অতিক্রম কবতে পনেবো মিনিট, সিম্যান-মিশান বাঁয়ে ফেলে বেলওয়ে স্টেশন অতিক্রম কবতে অনধিক পনেবো মিনিট—তাবপবই চড়াই পথে উঠতে গিযে কলিন ষ্ট্রীট মিলবে। নাম্বাব ফাইভ কলিন ষ্ট্রীট। মনে মনে নম্বব মুখস্থ কবাব মতো উচ্চাবণ কবল কথাটা এবং দুটো সুন্দবী মেয়েকে বমণীয হতে দেখে শিস দিয়েও ফেলল। এবং যদি ওবা প্রশ্ন কবে অন্ততঃ ওব শিস শুনে, তুমি সিম্যান?

সে বলবে, ইয়েস্।

যদি বলে, ইণ্ডিয়া থেকে এলে?

সে বলবে, ইযেস্।

যদি বলে, তুমি গান জান?

সে বলবে, ইযেস্।

—তুমি ক্রিকেট খেলতে পার?

সে বলবে, ইয়েস্।

সুতবাং ওব গান, খেলা এবং এই শঠতা সবই ইয়েসেব কোঠায় পড়বে।

বিজন নিজের মনেই হেসে ফেললে। সুন্দবী রমণীবা এখন ঝুলন্ত ব্রিজের উপরে উঠে যাচ্ছে। ব্রিজেব রেলিং ধবে কিছু মেযেপুরুষ গুঞ্জনে মশগুল। অথচ সুন্দরী বমণীবা ওকে দেখেও প্রশ্ন কবলনা। ওর শিস দেওয়ার অর্থকে ব্যতিক্রম বলে ভাবল না। সুতরাং সে জোরে জোরে হেঁটে ওদের পিছনে ফেলে নীচে নেমে একটি চলন্ত ফলের দোকান থেকে দু'শিলিং-এব আপেল কিনল। তারপর বুল-ফাইটেব বিজয়ী মাটাডরের মতো এইসব সুন্দরী রমণীদের এবং সুন্দর পুরুষদের ভীড় ঠেলে বের হয়ে গেল। বের হয়ে যাচ্ছে। সে হাঁটছে। এখন যেন সহসা মনে হল সেলিম পীড়িত। সে বাংকে শুয়ে রক্ত তুলছে মুখে। দেশে একমাত্র 'পসিমা বেঁচে আছেন, তাঁকে টাকা পাঠাতে হবে। আজও বয়স্কা সুন্দরী রমণীদের

দেখলে সে তার মাকে স্মৃতির কোঠায় সংগ্রহ করতে পারে। সে সামনের বয়স্কা সুন্দরী রমণীকে প্রশ্ন করল, উড ইউ হেল্প মি? আপনি কি আমাকে কলিন স্ট্রীটে যেতে সাহায্য করবেন?

বয়স্কা সুন্দরী রমণী বলল, তুমি কি স্ট্রেন্জার?

সে বলল, ইয়েস্। আমি সেলব।

—এ বন্দরে প্রথম এলে?

—ইয়েস্, এই প্রথম এসেছি।

—ইওর কান্ট্রি?

বিজন দেশের নাম বলল।

—অল্ রাইট। তুমি এস। তুমি গ্যাণ্ডিম্যান। তুমি ভালো লোক আছ এমত ভাব যেন বয়স্কা সুন্দরী রমণীর চোখে।

বিজন শেষ পযন্ত নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গেল। সে দীর্ঘস্থায়ী আলাপে রাজী হল না। নতুবা এদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সংশয় আব দুঃসহ রকমেব প্রশ্নের মুখে পড়ত —এখনও দুর্ভিক্ষ আছে? এখনও মহামারী হয়? এখনও সন্ন্যাসীরা গাঁজা খেতে খেতে ধর্মালোচনা কবে? এখনও হিমালয়েব বকে নাক জাগিয়ে সাধু মহান্তবা বরফের নীচে ঈশ্বর-উপাসনা করছেন?

প্রায়শই সে এইসব ক্ষেত্রে চটপট উত্তর দেবার ভঙ্গীতে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এবং কিছু বলে পরিত্রাণ পাবাব চেষ্টা করে। সত্য-মিথ্যা—যে-কোন প্রকারে। এসব ক্ষেত্রে সে কখনও নিজেকে ছোট করবে না। নিজেকে, নিজের দেশকে ছোট করার ইচ্ছা তার কোনদিন হয়নি।

একদা ভিক্টোরিয়া বন্দরে একজন ব্রেজিল-গার্ল বলেছিল, তোমার চোখ বড গভীর, তোমার চোখ কবিতার মতো।

সে বলেছিল, আমি যে কবিতা লিখি।

একদা একটি চিলি-কন্যা বলেছিল, তোমার কোমব খুব সরু। তোমার এই দীর্ঘ কোমল চেহারা নাচিয়ের মতো।

সে বলেছিল, একদা আমি ব্যালেতে নাচতুম।

বিজন এইসব ভাবনার ভিতর এভিন্যু ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। রেল-স্টেসন অতিক্রম করে সে ডাইনে মোড় ঘুরল। এখানে সে কিছু ফুলের গাছ দেখল। মিমোসা-ফুলের গুচ্ছের মতো এইসব ফুলেরা গাছে ঝুলছে। যারা পথ ধরে যাচ্ছে, ফুলেরা তাদের শরীরের উপর ঝরে পড়ছে। বিজনের ব্লু-ব্ল্যাক কোটের রঙে জাফরী

রঙ ধরাল। সে অনেকক্ষণ এইসব গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকল। চারিদিকে নিয়ন আলো, কাঁচের ঘরে আলো জ্বলছে। এই আলোর ভীড়ে এইসব শ্বেতাঙ্গ রমণীদের বিজনের বড় ভালো লাগল। ওর আর ইচ্ছে হচ্ছেনা এক পা নড়তে। ওর ইচ্ছে নেই এখন কলিন ষ্ট্রীটের পাঁচনম্বর বাড়ীতে ঢুকে নীরস আলোচনায় ডুবে যেতে। তার চেয়ে বরং এই ভালো। বিদেশী এইসব ফুলের ভীড়ে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড সাগরের দুঃখকে ভুলে এই সুখদুঃখে ডুবে যাওয়া।

অথচ সে দাঁড়াতে পারলো না। বন্দরে সেলিম, ওর কাসি, ওর নিরীহ মাছের মত চোখ বিজনকে তাড়া দিচ্ছে। বিজন ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা অতিক্রম করে বড় হলঘরটায় ঢুকে গেল। গায়ে পেতলের প্লেটে লেখা—পাঁচ, কলিন ষ্ট্রীট। পাথরের উপর খোদাইকরা সাইনবোর্ড। লেখা আছে—ন্যাশনাল সিম্যান ইউনিয়ন। নীচে লেখা রয়েছে—জাহাজীরাও আপনার আমার মতো মানুষ।

এইসব বড বড় হরফে বড় বড় কথা পড়তে পড়তে বিজন হল্‌ঘরে ঢুকে গেল। পাথবের দেয়ালে বড় বড় সব ছবি ঝুলছে। পায়ের নীচে মসৃণ পাথরে ওর প্রতিবিম্ব সচল। মসৃণ পাথরে ওর চেহারা আয়নার মতো ধরা পড়েছে। বিজন সন্তর্পণে হাঁটল। সন্তর্পণে পাথরের আর্শিতে নিজের মুখ দেখল, কারণ অন্য কোন মুখ অথবা অন্য কোন শব্দ এ-হল্‌ঘরে ভেসে উঠছে না। সে বিস্মিত হল। পাথরের দেয়ালে কিছু তৈলচিত্র। কিছু দামী আলো এবং এইমাত্র পালিশ-করা জুতোর রঙে এইসব দেয়াল, এইসব ছবি। সে একবার ভাবল বরং চলে যাওয়া যাক। বরং কাল দেবনাথকে বলে কয়ে একসঙ্গে আসা যাবে। এই নিঃসঙ্গ পুরীতে বিজন ভীত এবং বিহ্বল হয়ে পড়ল। অথচ সে এখন দেয়ালের কিছু কিছু তৈলচিত্র চিনতে পারছে —ওরা সেক্সপীয়ার, টলস্টয় এবং আরও সব মনীষীদের পাশে ট্যাগোর— জন্ম ১৮৬১...মৃত্যু.. কি একটা সালের নাম। ট্যাগোর...তারপর জন্মমৃত্যুর কথা ভেবে ওর কিঞ্চিৎ সাহস জন্মাল। সে চারিদিকে চোখ তুলে একবার তাকাল। উত্তরের দিকে পাথরের দেয়ালের একটা দরজা স্বয়ং খুলে যাচ্ছে। এবং একজন প্রৌঢ় বের হয়ে আসছেন। তিনি যেন কোন যক্ষপুরী থেকে উঠে আসছেন। সে তাঁকেই কোনরকমে প্রশ্ন করল, মিঃ ট্রয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। প্রশ্ন করে ট্যাগোরের ছবির প্রতি ফের নজর ফেলে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গৌরব বোধ করল।

ভদ্রলোক বললেন, দরজা ঠেলে ভিতরে যান। ওঁর ষ্টেনো এলবি আছেন। তাঁকে প্রশ্ন করুন। শেষে ভদ্রলোক ওকে গুড্‌বাই ভঙ্গীতে বিদায় জানালেন।

বিজন একান্ত বশংবদের মতো দরজা ঠেলতেই ভিতর থেকে জবাব এল, কাম ইন, কাম ইন!

বিজন এই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কোন মুখ দেখতে পাচ্ছেনা অথচ অপ্রত্যাশিত মেহমানের মতো ডাক ওকে বিচলিত করছে। যেন সে দেয়াল-ঘেরা কোন যক্ষপুরীতে এসে ঢুকেছে। সেখানে দেয়ালের ভিতর থেকে একটিমাত্র নারীকণ্ঠের জবাব, কাম ইন, কাম ইন। এবং সে ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছে বলেই দেখতে পেল মেয়েটি টেবিলের উপর ঝুঁকে কাজে ব্যস্ত। সে একবার চোখ তুলে দেখছেনা। দেখল না। কে এল কে গেল সে দেখল না। সে হাত তুলে ইসাবায় ওকে সামনের চেয়ারে বসতে বলছে। ছোট চিলতে করিডরের মতো এই একফালি ঘরে একটি টেবিল সহ মেয়েটিকে খুব ভিন্নধর্মী বলে মনে হচ্ছে।

সে চেয়ারে বসে ইতস্তত দেয়ালে নজর দিতেই দেখল মেয়েটির দেয়ালের কীলকেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং—যেন উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্মিত হাসিতে এইসব অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করছেন। ছবিটি হাতে আঁকা বলেই বিজনের মনে হল। কোন ছবিব যেন নকল। এইটুকু দেখে এবং ভেবে বিজনের বিচলিত ভাবটুকু কেটে গেল। সে প্রশ্ন করল, মিঃ ট্রয় থাকলে দেখা করতাম।

এল্‌বি চোখ তুলে বিজনকে দেখলো। একজন সুপুরুষ বিদেশী যুবাকে দেখল। যুবাকে দেখে চোখে ওর নির্লজ্জ ভাব। চোখের পাতা পড়ছেনা। বিজনকে দেখে লেজারের হিসাব কষছে এমত ভাব চোখে। চোখের পাতা পড়ছেনা—দৃষ্টি এমত দৃঢ়, আত্মপ্রত্যয়ে গভীর। এই নির্লজ্জ ভাবটুকু বিজনের ভালো লাগল না। বস্তুত বিজন খুব আড়ষ্ট বোধ করছে।

—তিনি তো নেই। তোমার কি দরকার আমাকে বলে যাও। তিনি এলে বলব।

বিজন বলল, প্রয়োজন আমার অনেক। তোমাকে আমার প্রয়োজনেব কথা অনেকক্ষণ ধরে শুনতে হবে।

—শুনব।

সব ঘটনাই মিঃ ট্রয়কে কিন্তু বলতে হবে।

এল্‌বি হাসল। এল্‌বি বিদেশী যুবাকে ফের কৌতুহলের চোখ নিয়ে দেখছে। এবং সেই পুরুষের মতো দৃষ্টি—যা বিজন সহ্য করতে পারছে না। সে এলবিকে সাধারণ যুবতীর মতো দেখে, খুশী হতে চাইল।

এল্‌বি বলল, তুমি বল, আমি নোট করছি।

নিজের ভুলটুকু বুঝতে পেরে বিজনও হাসল।—তোমাকে নোট নিতে হবে না।

মুখে বললেও চলবে। ঘটনাটা হচ্ছে পার্থ বন্দরে···

এল্‌.বি এ-সময় বাধা দিল বিজনকে, জাহাজটার নাম বল। তোমরা কোন্ ক্রু, কোন্ দেশ থেকে এসেছ সব বলতে হবে।

—জাহাজটার নাম 'এস/এস টিবিড্‌ ব্যাংক্‌'। আমরা ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি।

—তারপর ?

বিজন জাহাজেব সব ঘটনা, সেলিমের বর্তমান অবস্থা, এমনকি সারেঙ এবং কাপ্তেনের গোটা ষডযন্ত্রেব কথাও খুলে বলল। বিশেষ কবে মেয়েটির স্বাভাবিক আগ্রহে সব খুলে বলতে পাবল। এখন সে আর কোন আড়ষ্টতায় ভুগছেনা। এখন সে রবীন্দ্রনাথকে দেখে রীতিমতো উত্তেজিত হতে পাবছে। সে এবাব একটু ঝুঁকে বলল, এব একটা বিহিত করতেই হবে দয়া করে। নতুবা বেচারা বিনা চিকিৎসায় মাবা পড়বে। বেচাবাব ঘরে বিবি আছে। ছোট একটি মেযে আছে। ওবা সব ওবই পথ চেযে বসে আছে।

এখন বিজনকে দেখলে কে বলবে, এ জাহাজী বিজন! কে বলবে এ বিজন কথায় কথায় শিস দেয়! কথায় কথায় মিথ্যাকথা বলে বিদেশী রমণীকুলে বাহবা নিতে চায়! বিজনেব চোখ মুখ মানুষেব ভালো করার প্রবৃত্তিতে বস্তুতই সজল হয়ে উঠছে এখন।

এল্‌.বি বলল, নিশ্চিন্ত থাক। মিঃ ট্রয় এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না। জাহাজীদেব ভালো করাই আমাদের কাজ।

বিজন ওঠবাব সময় ফের রবীন্দ্রনাথকে দেখল এবং অদম্য কৌতূহলকে চাপতে না পেবে বলল. আমরা ট্যাগোবেব দেশ থেকেই এসেছি। তোমরা ট্যাগোরের ভক্ত দেখছি। দেখি তোমরা এখন আমাদেব জন্য কতটা করতে পার।

—তুমি ভারতবর্ষের লোক ? কিন্তু ভারতবর্ষতো বিরাট দেশ! এখানে পাচ বছর আছি। ভারতবর্ষ থেকে আসা কিছু কিছু জাহাজীদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে! অথচ দুর্ভাগ্য ওরা কবির ছবি দেখেও কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি। বিশ্রী ধরনের পোশাক পরে ওরা এখানে এসেছে। চেয়ারে না বসে মেঝেতে বসে পড়েছে। শীতে দেখেছি ওরা ভয়ানকভাবে কাঁপত।

বিজন বলল, ওরা এখনও আছে। জাহাজে গেলে তুমি ওদের এখনও দেখতে পাবে।

এল্‌.বি বলল, ভারতবর্ষের লোক ভাবতে তোমাকে কষ্ট হয়।

বিজন বলল, মাপ করবে। যারা তখন ছিল এখনও আছে। তাদের জাহাজী

জীবনের এক বিচিত্র অধ্যায় আছে। ওরা আসছে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সন্দীপ অঞ্চল থেকে। ওরা অজ্ঞ। চাষী পরিবার থেকে ওরা আসছে।

বিজন ভাবল—এইসব জাহাজীদের জাতীয় পোশাকের প্রতি এল্‌বির তীব্র ঘৃণা। বস্তুত লুঙ্গি এবং কাঁধে গামছা ফেলে এইসব জাহাজীদের বড় বড় এভিন্যু ধরে হাঁটা এবং নিজেদের ভারতবাসী বলে পরিচয় দেওয়া এল্‌বির কাছে বিশ্বকবিরই যেন অবমাননা। সেজন্য বিজনের দুর্লভ ইংরেজী বলার কায়দা এবং উজ্জ্বল বিদেশী পোশাক, উপরন্তু কবির প্রতি শ্রদ্ধাটুকু এল্‌বিকে বিজন সম্বন্ধে অভিভূত করেছে। বস্তুত এল্‌বি ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে সহ্য করতে পারত না। আজও পারছে না। ওর চোখে মুখে এইসব যেন ধরা পড়ছে।

বিজন বলল, ওরা অজ্ঞ নিরক্ষর বলেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ওদের কোন কৌতুহল নেই।

এল্‌বি সহসা বলল, বাবা কবিকে ইউরোপে দেখেছেন। তুমিও কবির দেশের লোক। তুমি কবিকে দেখেছ ?

সহসা এই জবাবে বিজন কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে পড়ল। ওর জাহাজী মনটা ধীরে ধীরে ওর অস্তিত্বকে গ্রাস করছে। সে বলল, নিশ্চয়ই। নিমতলা থেকে বটতলা বেশী দূর নয়। নিমতলার কাছেই জোড়াসাঁকো। আমরা ছেলেবেলায় ও-পাড়ায় কত খেলতে গেছি। কতদিন আমরা কবিকে দেখে প্রণাম করেছি। তিনি তখন প্রায় অচল।

—তুমি ওঁকে প্রণাম করেছ! তুমি ওঁকে স্পর্শ করতে পেরেছ!

বিজন বিনয়ের আধার হয়ে গেল। বিজন বলল, কবি আমাদের আশীর্বাদ করতেন। বলতেন, ভালো ছেলে হবে, দেশের দুঃখ দূর করবে।

এল্‌বি ফের আশ্চর্য এক শ্রদ্ধার ভঙ্গীতে বলল, তুমি ওঁকে স্পর্শ করতে পেরেছ, প্রণাম করতে পেরেছ!

বিজন দেখল এল্‌বির চোখ দুটো শ্রদ্ধায় গভীর হয়ে উঠছে। এল্‌বি একবার ঘাড় ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখল, একবার বিজনকে দেখল। কবির খুব নিকটের একজন যুবাকে স্পর্শ করার প্রকট ইচ্ছায় সে হাত বাড়িয়ে দিল। যেন বলতে চাইছে—তুমি বি-জন, তুমি কবিকে স্পর্শ করেছ, তুমি কবির দেশের, ঘরের লোক। এল্‌বির মনে এইসব ভাবগুলো কাজ করছে।

এল্‌বি বলল, বাবা তখন ইউরোপে ছিলেন। বাবা কবিকে ইউরোপে দেখেছেন। বাবা মাকে এবং আমাকে বলতেন, হি ইজ এ সেণ্ট, জাস্ট অ্যাজ

পিটার অর পল। বিজন সেই ঋষিপুরুষের আশীর্বাদ পেয়েছে। এল্‌বি বিজনের আরো ঘনিষ্ঠ হতে চাইল।

এল্‌বি বলল, তোমবা আব কতদিন থাকবে এ-বন্দবে?

—প্রায় মাস দুই। জাহাজ এখানে মাস দুই বসবে। ড্রাইডক্‌ হবে। মেবামত হবে।

সহসা এল বি বলে বসল, আমাব একটা অনুবোধ তোমায় বক্ষা কবতে হবে।

বিজন একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তবু সে বলল, বল, বাখব। যদি ক্ষমতায় কুলোয় নিশ্চয়ই বাখব।

—তোমাব কাছে আমি ট্যাগোবেব কবিতা বাংলা-ভাষায শুনতে চাই, আমাব অনেকদিনেব ইচ্ছা। যখন থেকে ট্যাগোবেব কবিতাব সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই তখন থেকে ইচ্ছা—তোমাব দেশে যাব, ভাবতবর্ষকে দেখব। কবিব শান্তি-নিকেতন দেখব। আমি এইজন্য প্রথম থেকেই টাকা জমিয়ে আসছি। কবির কবিতা বাংলাভাষায় শুনব—কত দিনের ইচ্ছা আমাব।

—তাব জন্য কি আছে? সেলিমেব ঝামেলাটা চুকে যাক। তাবপব একদিন তোমায় শোনানো যাবে।

এল্‌বি চোখ বুজল। যেন রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর দেশকে, বিজনকে অনুভব করার জন্যই চোখ বুজল। বিজন এই আবেগধর্মিতায় বিমুগ্ধ হল না। ববং পীড়িত হল। সাহিত্যেব অ-আ-ক-খ সম্বন্ধে যাব কোন স্পৃহা নেই, তাকেই এই নিদারুণ সত্যে টেনে আনাব কী যে অর্থ, বিজন বুঝতে পাবল না। তবু সে ভাবল, হাতে অনেক দিন, পরে ভেবে যা হয় কিছু একটা বলা যাবে।

বিজন এবার উঠতে চাইল এবং বলল, তোমাব নামটা জানা হল না।

এল্‌বি বলল, আমাকে সকলে এখানে এল্‌বি বলেই জানে। পুবো নাম সিসিল এলবার্টি। মিস এলবার্টি বলেও ডাকতে পার।

এলবি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিল, আমি তোমায় কবিতা শোনাবো। ট্যাগোরের কবিতা।

বিজন ভাবল, আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল।

সে চলতে থাকল।

এসময় এলবি ওর সামনে এসে দাঁড়াল এবং হ্যাণ্ডশেক করল। তারপর প্রশ্ন করল, জাহাজ তোমার কোন্‌ ডকে নোঙর ফেলেছে?

—সাউথ-ওয়ার্কে। বিজন এবার দৌড়ে পালাবার মতোই হলঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে গেল এবং দুঃসহ ভার থেকে যেন মুক্ত হল।

ডেকে তখন পুরোদমে কাজ চলছে। এন্‌জিন-রুমেও। এন্‌জিন-রুমে বড় বড় প্লেট সব স্ক্রেপ করা হচ্ছে। বড় বড় সব অক্সিজেনের বোতল নামানো হচ্ছে। কল্কায় কল্কায় কাজ; জাহাজীরা রঙ করছে ফানেলে, বোট-ডেকে। একজন দুজন করে সকলে উঁকি মেরে যাচ্ছে সেলিমের কেবিনে। বিজন গতকালের ঘটনার কথা কাউকে বলেনি, সে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করতে চায়। শুধু আজ সে কিনারার লোকদের ডেকে সেলিমের অবস্থা দেখাচ্ছে। দেখাল—এইখানে সেই লোকটি থাকে, তাকে তোমরা দেখে যাও।

প্রচণ্ড শীত এবং হাওয়াব জন্য জাহাজীদের হাতে কাজ তেমন জমছে না। ওরা ফানেলের উপর ঝুলে অথবা বোটেব উপর দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছিল। মাঝে মাঝে গ্যালীতে গিয়ে আগুনের উত্তাপ নিয়েছে। শক্ত হয়েছে ওরা এবং রাত্রির কোন আকস্মিক যৌন ঘটনার কথা ফলাও করে বলে কোন জাহাজী বাহবা নিতে চাইছে।

বিজন নীচে দাঁড়িয়ে ফানেলে যে রঙ করতে উঠে গেছে তার দড়িদড়া ঢিল দিয়ে অথবা শক্ত করে বেঁধে রেখে কাজে সাহায্য করছে। আকাশ তেমনি আর্শীর মতো। বন্দরের পাইনগাছ থেকে তেমনি পাতা ঝরছে। এ শীতেও এন্‌জিন-ট্যাণ্ডল পুরানো কোট গায়ে লুঙ্গি পরে নীচে নেমে গেল। জেটি ধরে হাঁটতে থাকল। গতরাতেও এন্‌জিন-ট্যাণ্ডল শীতে কাঁপতে কাঁপতে বন্দরে নেমে গেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বন্দরের পথ ধরে সহরে উঠে গেছে। পুরানো বাজারে গিয়ে দু-শিলিং তিন-শিলিং দাম দিয়ে পুরানো জামা-কাপড় কিনেছে। জাহাজীরা আফ্রিকার বন্দরে অথবা ফিজি দ্বীপে ওগুলো বিক্রি করবে। গতরাতে ফেরার পথে ট্যাণ্ডল শীতে যখন আর হাঁটতে পারছিল না, যখন সস্তায় যৌন সংযোগের দায়িত্ব পালন করে আর হাঁটতে পারছিল না, তখন বুড়ি মেমসাব এই বুড়ো ট্যাণ্ডলকে একটা দামী ওভারকোট গাড়ী থেকে দয়াপরবশ হয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল। ভোরে সে দামী ওভারকোটটাকে সকল জাহাজীদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে' বলেছে—বুড়ী মেমসাব দিল। শীতে রাস্তায় কাঁপছিলাম, বুড়ী মেমসাব দিয়ে দিল। গতকাল এইসব ভারতীয় নাবিকদের কথাই এলবি দুঃখ করে বলছিল। বিজন ফানেলের নীচে দাঁড়িয়ে এন্‌জিন-ট্যাণ্ডলকে সহরে উঠে যেতে দেখছে আর বিরক্তিতে ফেটে পড়ছে।

বিজন ফানেলের পাশ থেকে অন্য জাহাজীকে উদ্দেশ্য করে বলল, মকবুল, দেখলি এন্‌জিন-ট্যাণ্ডলের কাণ্ড। আজও এই ভোরে শীতের ভিতর লুঙ্গি পরে বন্দরে নেমে গেল। দেশেব জাত-মান সব ডুবাচ্ছে। তোরা কিছু বলতে পারিস না ওকে?

বিজন দেখল মকবুলেব মুখেও এমত ইচ্ছা—শীতের বাতে নীলরঙের পায়জামা পরে ছেঁড়া কোট গাযে বেব হয়ে যাওয়া, পথে দাঁড়িয়ে শীতে কষ্ট পাওয়া এবং কোন পুরুষ অথবা মহিলাব দাক্ষিণ্য গ্রহণ কবা। বিজন ভাবল, শীতেব রাত, রাস্তায় বরফ পডছে, তবু নীল মার্কিন কাপডেব জামা পায়জামা শবীবে এঁটে এইসব জাহাজীদেব ভীড কিনাবায়। এইসব জাহাজীবা ভাবতবর্ষ থেকে আসে। বড গবীব, বড নিঃস্ব। এইসব জাহাজীদেব ইংবেজ জাহাজ কোম্পানীব মালিকেবা কলকাতা বন্দব থেকে ধবে নিযে আসে। তাদেব খেতে দেওযা হয় বাসি গরুব মাংস, ডাল ভাত। মাঝে মাঝে বাঁধাকপিব তবকাবি দিযে কোম্পানী বদান্যতা দেখায়। এইসব জাহাজীবা বন্দবে লুঙ্গি পবে, ছেঁড়া ওভাবকোট গায়ে শীতেব রাতে ঘন আঁধাবে বুডী মেমসাবদেব খুঁজে বেডায়। দাম যত কমে হয়, জিনিষ যত নীবস হয় ক্ষতি নেই, তবু যৌন সংযোগটুকু বক্ষা কবতেই হবে। তখন বিদেশে এলবির মতো বমণীবা ভাবে ওবা অসভ্য, ওবা বর্বব। একদা পৃথিবীব সব বন্দব-গুলোতে কলকাতা বন্দরেব এইসব নাবিকেরা ঘুবে বেডিয়েছে। পৃথিবীব সব বন্দবে বন্দবে ভাবতবর্ষকে ওবা নোংবা নিঃস্ব প্রতিপন্ন কবেছে। আজও কবছে। অথচ বিজন ভাবল, এব বিরুদ্ধে নালিশ নেই। যতদিন এবা থাকবে—এন্‌জিন-ট্যাণ্ডলেব মতো এইসব লোকগুলোও থাকবে।

বিজন এইসব ভেবে এত বিবক্ত এবং অন্যমনস্ক হয়ে পডেছিল যে কখন মকবুল ফলঞ্চার দড়িতে ঢিল দিতে বলেছে, কখন ইটন এসে ওব পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ওর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য কবে উভযে হাসছে—বিজন তাব কিছুই ধবতে পারে নি

ইটন বলল, গুড মর্নিং।

বিজন বলল, ইয়েস, গুড মর্নিং।

তারপব ওবা সকলেই লক্ষ্য কবল জাহাজে কেমন একটা চঞ্চলতা প্রকাশ পাচ্ছে। অনেকগুলো মোটরগাড়ী এসে বন্দরে থেমেছে। সব লম্বা চৌকো মুখওয়ালা লোকেবা জাহাজে উঠে আসছে। ডেকের উপব সব জাহাজীরা, কিনারার লোকগুলো হাত তুলে আকাশ দেখছে। ইটনও আকাশ দেখল, বিজনও আকাশ দেখল। দেখে বিস্মিত হচ্ছে। ইটনের মুখ রহস্যময় হয়ে উঠেছে, ইটন

বলছে—কেমন, কাজ হল তো।

ফানেলের চূড়ায় ঝুলে মকবুল প্রশ্ন করল, আকাশে এরোপ্লেনটা কি লিখছে রে?

বিজন দেখল একটা এরোপ্লেন আকাশটাকে শ্লেটের মতো ব্যবহার করছে। গ্যাস দিয়ে বড় বড় হরফে ভোরের খবর দিচ্ছে। 'দি ডেইলি হেরাল্ড'-এর খবর। হয়ত উড়োজাহাজটা ভাড়া করা—কিংবা ওদেরই। বিজন দুটো বড় খবরের পর প'ড়ল : দি শিপ এস/এস টিবিড ব্যাংক উইল বি ব্ল্যাক ব্যান্‌ড্‌, ইফ্‌ সেলিম···।

মকবুল ফানেল থেকে বিরক্ত করছে। মকবুল বার বার প্রশ্ন করছে—আকাশে জাহাজটা কি লিখছে রে? বিজন এইসব পড়ে অধীর হয়ে উঠেছে। সে মকবুলকে বলল, সেলিমকে হাসপাতালে এক্ষুনি না দিলে জাহাজের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। সিম্যান-ইউনিয়নের সেক্রেটারি এই হুমকি দিয়েছেন।

ইটন বলল, কাল রাতে এখান থেকে যারাই কাজ করে ঘরে ফিরেছে তারাই ইউনিয়নে খবরটা পৌঁছে দিয়ে গেছে।

বিজন ভাবল, সব যেন মন্ত্রের মতো কাজ কবল। এখন জাহাজে খুবই লোকের ভীড়। সকলে কাজ থামিয়ে দিয়ে ব্যাপাবটা দেখছে। কোম্পানীর এজেণ্ট পর্যন্ত জাহাজে উঠে এসেছেন। মিঃ ট্রয় এবং আরো অনেক সব লোক। ক্লার্করা এসেছেন। ওরা প্রথমে ব্রীজে উঠে গেল। কাপ্তানের ঘরে ঢুকে গেল অনেকে। কাপ্তানকে খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। তিনি এই খবরে প্রথমে খুবই অধীর এবং উত্তেজিত হয়েছিলেন। তুই সারেঙকে ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন, কে এ-খবর ইউনিয়নে পৌঁছে দিয়েছে, কার এমন হিম্মত? সেলিমের দরজা কে খুলেছিল? ওর পোর্টহোল কেন বন্ধ ছিল না? এইসব প্রশ্নের শেষে তিনি দেখলেন স্বয়ং এজেণ্ট এবং অন্যান্য সব দায়িত্বশীল কর্মচারীরা ওঁর কেবিনে ঢুকে যাচ্ছেন। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না—এত উত্তেজিত। তবু এইসব দায়িত্বশীল কর্মচারীদের দেখে কেমন বিব্রত হয়ে পড়লেন। মিঃ ট্রয় নানারকম প্রশ্ন করে ওঁকে আরো বিব্রত করে তুলেছেন। বিজন, ইটন এবং মকবুল, পরে দেবনাথ পর্যন্ত ফানেলের গুঁড়িতে এসে সন্তর্পণে কাপ্তানের কেবিনের সব খবরগুলো শুনছিল। ওরা শুনে বলল, শালা ঠিক জব্দ হয়েছে এতদিনে।

বিজন মনে মনে এলবিকে ধন্যবাদ জানাল। এলবির লম্বা চোখ এবং ডিমের মতো মুখের গঠন ওর চোখে এখন প্রীতির জোয়ারে ভাসছে। ওর কালো চুলে মনোরম গন্ধ, বিজন গতকাল তা টের পেয়েছে। গতকালের অসহিষ্ণু ভাবটুকু আর ওর ভিতর নেই! এলবিকে সে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারলে খুশি হবে এমন্ত

ধারণায় বোট-ডেকে এবং নীচে ভীড়ের ভিতর এলবিকে খুঁজল। এবং খুঁজতে থাকল। অথচ এলবিকে যেই বোট-ডেকে উঠে আসতে দেখল, বিজন তাড়াতাড়ি মাস্টের আড়ালে আত্মগোপন করল।

এলবি, মিস্ এলবার্টি এবং সিসিল এলবার্টি যে-কোন নামেই ওকে ডাকা চলে। সে এই ছায়া-ছায়া অঞ্চলে যদি এই নামে ডাকে নিশ্চয়ই এলবির সাড়া পাবে। এলবি এখন দু'নম্বর বোটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেও যেন কাপ্তানের ঘরের দিকে উঠে যাচ্ছে। বিজন সব দেখেও এলবিকে গুড মর্নিং বলতে পারল না, কৃতজ্ঞতা জানাতে পারল না। এলবির সঙ্গে যে-কোন পরিচয়ই এ-মুহূর্তে এ-জাহাজে মারাত্মক। কাপ্তান তাঁর বিরক্তিভাবটুকু কলকাতা বন্দর পর্যন্ত পুষে রাখবেন। সারেঙ সেই ভাবটুকু কলকাতা পর্যন্ত জিইয়ে রাখবেন। তারপর এক শুভদিনে বিজনের নলীতে লাল দুটো দাগ পড়বে। বিজন ব্ল্যাক-লিস্টেড হবে।

সুতরাং সে এলবিকে দেখে আত্মগোপন না করে পারল না। তাই সে এলবিকে দেখেও এই মাস্টের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এলবি সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। সে যেন কোন জাহাজীকে প্রশ্ন করছে, বি-জন, বি-জন কোথায় কাজ করছে?

বিজন আঁতকে উঠল। সে ধীরে ধীরে টুইন ডেকে নেমে গেল। এবং দু'নাকে ফল্কা পার হয়ে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে নিজের ফোকসালে ঢুকে দরজা বন্ধ করার আগে অন্য জাহাজীদের বলে দিল, কেউ ওকে যদি খোঁজ করে তবে যেন বলা হয়, সে জাহাজে নেই। বন্দরে নেমে গেছে। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাংকে বসে হাঁপাতে থাকল।

কি সর্বনাশ—বিজন ভাবল। বিজন নিজের ভুলের জন্য নিজেই ক্ষেপে গেল। গতকাল যা ওর সবচেয়ে বেশি বলা দরকার ছিল, এলবিকে তাই বলা হয়নি। ওর বলা উচিত ছিল, এ খবর তোমাদের আমি পেঁাছে দিলাম এ কথা যেন জাহাজের কেউ না জানে। তবে আর গরীবের চাকরীটা থাকবে না। সেলিমের সঙ্গে তবে আমিও মরব। অথচ সেই কথাটাই এলবিকে বলা হয়নি।

এলবি এদিকে এসে দেবনাথকেও প্রশ্ন করল, বিজন কোথায়?

দেবনাথ ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে বলল, বিজন তো এখানেই ছিল। ব'লে ইতস্তত এদিক ওদিক চোখ তুলে তাকাল। তারপর বলল, চল কেবিনে। বোধহয় সে সেখানেই আছে।

নীচে নামবার আগে এলবিকে নিয়ে দেবনাথ একবার ভীড়ে বিজনকে খুঁজে দেখল। তাকে ওবা সেখানে পেল না। সেলিম ভীড়ের ভিতর স্ট্রেচারে শুয়ে আছে। সেলিম কাঁদছে। সাবেঙ বুঝ-প্রবোধ দিচ্ছে। বলছে, ভালো হয়ে গেলেই কোম্পানী তোকে দেশে পাঠিয়ে দেবে। কাঁদছিস কেন? ভালোর জন্যই তোকে হাসপাতালে দিচ্ছে।

বিজন এই বাংকে বসেও যেন টেব পাচ্ছে—এইমাত্র সেলিমকে ধরাধবি করে নীচে জেটিতে নামানো হল। সেলিম কাঁদছে। সে বলেছিল, বিবিব কোলে মাথা বেখে মববে। সে বলেছিল, আমাব দেশেব মাটিতে আমার কবর হবে। সে এ-কথাগুলো বিজনকে বলেছিল। ওব খুব দুঃখ হচ্ছে এসময়—সে কাছে থাকতে পাবল না, বলতে পাবল না—বোজ আমি যাচ্ছি। বিকেলে যাব। তুই ভয় পাবি না। তুই ভালো হয়ে উঠবি—বলতে পারল না…তখন দবজাটা কে যেন ঠেলছে। সে এই বাংকে বসে দেবনাথের গলার শব্দ পেল। দেবনাথ বলছে—এই, দরজা খোল। দবজা বন্ধ কবে ভিতবে কি কবছিস?

বিজন দবজা খুলতেই এল্‌বিকে দেখল। এল্‌বি দেবনাথেব একপাশে দাঁড়িয়ে হাসছে।

বিজন বলল, গুড মর্নিং।

—তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়বান।

—কেন, এখানেই তো ছিলাম।

—এখানেও খুঁজেছি।

বিজন বিব্রত হযে পডল।

এলবি ভিতরে ঢুকে বলল, ট্রয়কে কিন্তু সব কথাই খুলে বলতে পেরেছি।

বিজন ধন্যবাদ জানল। তাবপর বলল, বোসো।

ছোট ঘর, সোফা নেই। একটা ইজিচেয়াব আছে, কিন্তু পাতবার জায়গা নেই।

ওরা তিনজন এমত কথায় হাসল।

এলবি বলল, আমি বেশীক্ষণ বসব না। হাতে অনেক কাজ। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য দেরী হয়ে গেল। ওরা হয়ত এতক্ষণে চলে গেছে। সেলিমকে রয়েল হাসপাতালে রাখা হচ্ছে। আশা করছি বিকেলে ওকে দেখতে যাবে। যেতে অসুবিধা হলে, আমার ওখানে চলে যেও, সেখান থেকে আমি তোমায় নিয়ে যাব। ব'লে সে আর বসল না। তরতর করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল।

ওরা দুজন ফোকসালে বসে এলবির পায়েব শেষ শব্দটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে যেতে শুনল। দেবনাথ আবও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল বিজনেব। বলল, কি কবে এ-মেয়েকে ধরলি?

বিজন গোপনীয়তা বক্ষাব জন্য ব্যস্ত। সুতবাং সে এ-ব্যাপাবে আদৌ উচ্ছল হল না। আদৌ মুখব হল না। সে জবাবে শুধু বলল, পথে আলাপ।

তাবপব ওবা দুজন চুপচাপ। গ্যালীতে মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। ওবা সেই গন্ধ নীচে বসে পেল। ওবা দুজন কথা বলল না, তখন এক এক কবে সকলে এসে নীচে নামছে। যে যাব হাত মুখ ধুলো। থালা-মগ ধুলো। এবং ধীবে ধীবে উপরে উঠে গেল। ওবা ভোবেব এই আকস্মিক ঘটনায় বিস্মিত হযেছে, খেতে বসে সকলে এমত ভাব প্রকাশ কবতে চাইল।

বিজন এই শীতেব বিকেলে ডেকে এসে দাঁড়াল। ওব পোশাক এবং মুখেব কমনীয়তায় শীতেব বঙ অথবা সমুদ্রেব বঙ। ওব শবীবেব বঙে আশ্চয স্নিগ্ধতা। শীতের দেশে ঘুবে এবং সমুদ্রেব নোনা হাওযায শবীবেব বঙ কমনীয হতে হতে [illegible] এক ভোবে বিজন যেন বিদেশীব মতো কথা বলতে শিখল।

সে বেলিঙে দাঁড়িযে দেখল দুটো সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দবে এসে নোঙব কবেছে। সে ওদেব ফানেলেব বঙ দেখেই বুঝল ওবা আমেবিকান জাহাজ। সে বন্দর দেখে বুঝল ওবা এখানে ইস্পাত-জাতীয দ্রব্য নামাবে। এবং হযত অন্য কোন বিকেলে ভেড়াব মাংস অথবা ফলেব রসদে বোঝাই হয়ে অন্য বন্দবে পাড়ি দেবে।

শেযে অন্যান্য অনেক জাহাজীব মতো সেও সেলিমেব রুগ্ন ফোকসাল অতিক্রম কবে গ্যাংওয়ে ধবে বন্দবে নেমে গেল। অন্যান্য দিনেব মতো সে আজ সাধাবণ জাহাজী হয়ে পথ ধবল না। সব কিছু দেখেই সে চোখ ফেবাল না। সে চলতে থাকল। একজন স্থায়ী বাসিন্দাব মতো সে এই ঝবা পাইনেব পথ ধবে শহরে উঠে যাচ্ছে। ঝুলন্ত সেতু অতিক্রম কবে বন্দবের সিম্যান-মিশান বাঁয়ে ফেলে [illegible] উঠে যাচ্ছে। সেই পাঁচ কলিন স্ট্রীট ও সেই মেয়ে এলবি। সে নির্দিষ্ট আস্তানায় উঠে যাওয়াব জন্য একটা ট্যাক্সি ডাকল। মোটরে বসে এলবি এবং ওর ইউনিয়নের হলঘব, ওব চিলতে ঘবটুকু··· এলবি সুন্দরী, সে সুখে আছে··· এলবির চোখ গভীর, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়···এলবিকে মনে মনে সুন্দরী বিদেশী রমণী অথচ আপনার মতো করে দেখার এক সবিস্ময় কৌতূহলে সে পীড়িত হচ্ছে

থাকল। এবং সহসাই স্মরণ করতে পারল—এলবি যদি বাতিকগ্রস্ত রুগীর মতো ফের বলতে থাকে—তুমি ট্যাগোরের কানট্রি থেকে এসেছ, তুমি কবির কাছের লোক, তুমি কবিকে দেখেছ সুতরাং তুমি কবির আবৃত্তি করে শোনাও। তুমি আমাকে বাংলাভাষা শেখাও। আমি মূল কবিতার রস পেতে চাই। তা হলে··· তা হলে! সে শরীরের আড়ষ্টতায় এমত উচ্চারণ করে কেমন জড়বৎ বসে থাকল, সে ড্রাইভারকে বলতে পারল না তুমি বন্দরে চল, পাঁচ কলিন ষ্ট্রীটে যেয়ে আমার দরকার নেই।

হলঘরের দরজায় বিজন এলবিকে দেখতে পেল। বিজন ট্যাক্সি থেকে নামল ফুটপাথে। এলবি সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে। ওরা পরস্পর অভিবাদন জানাল। তারপর উভয়ে মোটরে চড়ে সেলিমকে দেখতে রয়েল হাসপাতালে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। শীতের সন্ধ্যা। এলবির হাতের দস্তানা লাল রঙের। মোজা বেগুনি রঙের। বব-করা ব্লণ্ডচুলে দুটো প্রজাপতি-ক্লিপ। গলায় সরু সোনার চেনে পাথর বসানো। হলদে স্কার্ট, লাল জ্যাকেট শরীরে। শীতের সন্ধ্যায় এলবিকে এইসব রঙে এইসব পোশাকে অতীব তীক্ষ্ণ মনে হল।

সহরের বড়রাস্তা ধরে ওরা চলেছে। আপাততঃ ওরা কোন কথা বলছে না। এলবি স্টীয়ারিং করছে। বিজন সহর দেখছে। বড়রাস্তা, সুতরাং বড় বড় সব কাঁচ-মোড়া আসবাবপত্রের, কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের, পোশাকের অথবা মোটরের দোকান। ভিন্ন ভিন্ন সব বিজ্ঞাপন ঝুলছে। এলবি দুটো-একটা কথা বলছে এখন। সহরের এইসব দোকানের এবং কোন্ মুল্লুক ধরে কিভাবে রয়েল হাসপাতালে যাচ্ছে এইসব খবর দিয়ে নিঃশব্দ ভাবটুকু অতিক্রম করছে।

এল্‌বি বলল, জাহাজ তবে অনেকদিন থাকল।

—তা থাকল।

—প্রায় দু'মাসের মতো হবে।

—তা হবে।

পাশের পত্রিকাটা তুলে বিজনকে দেখাল। সামনে মোড় ঘুরতে হবে। নীল বাতি জ্বলছে না। সুতরাং এল্‌বি দু'হাতেই পত্রিকাটা বিজনের হাতে তুলে দিল।—খবরটা পড়েছ?

—আকাশে দেখেছি এবং পড়েছি। আচ্ছা এল্‌বি···বিজন একটা প্রশ্ন তুলে ধরার ইচ্ছায় ঘাড়টা বাঁকাল।—আচ্ছা এলবি, তোমাদের ভিতর থেকে কেউ তো বলেনি এ-ঘটনার সঙ্গে আমি যুক্ত। পত্রিকায় তেমন খবর নেই

তো! বিজন পত্রিকাটা ধীরে ধীরে নিজের কোলের কাছে নিয়ে এল। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবটুকু পড়ল। এবং এলবির মুখ দেখে যেন বুঝতে পারছে বিজনের এই দুঃসহ জড়তায় এলবি পীড়িত হচ্ছে।

এলবির কঠিন মুখ সহসা নানা রঙে ক্রমশঃ নরম হচ্ছে।—বিজন, তুমি পাকা জাহাজী হও নি। তুমি দেখছি মিঃ ট্রয়কে খুব কাঁচা লোক ভেবেছ। পত্রিকা পড়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে এ-ব্যাপারে আমরা কিনারার কুলী লোকদের উপর বেশী নির্ভর করেছি। কথা কি জান, এখানকার ইউনিয়নের মতো এত জোরালো ইউনিয়ন পৃথিবীর কম বন্দরেই আছে। পাঁচ কলিন স্ট্রীটে পাঁচ বছর থেকে আছি। এ-ব্যাপারে আমি অভিজ্ঞ। তোমাকে জড়ালে কাপ্তান অন্য বন্দরে তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে ভেবেছ?

ওদের মোটর হাসপাতালের দরজায় এসে থামল। মোটর পার্ক করে পার্কবোর্ডে নাম লিখে ওরা সদর দরজা অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

বিজন দেখল, দুটো বৃত্তের মতো বাগান দু'পাশে রেখে ওরা উঠে যাচ্ছে। এলবি ব্যাগ থেকে ডায়েরী বের করে সিট-নম্বর এবং ব্লক-নম্বর দেখে নিল। তারপর হিসাব মিলিয়ে ওরা একসময় সেলিমের বিছানার পাশে পৌঁছে গেল।

এলবি বলল, গুড ইভনিং। তোমাকে এখন ভালো দেখাচ্ছে।

বিজন সেলিমের বিছানার পাশে বসে ওর চুলে হাত দিয়ে বলল, এমন ভেঙে পড়েছিস কেন? আমি রোজ বিকেলে তোকে দেখতে আসব। জাহাজ এখানে অনেকদিন থাকবে। আশা করি ততদিনে ভালো হয়ে উঠবি।

সেলিম পাশ ফিরে শুল। ওর খুব যেন কষ্ট হচ্ছে। বুকে কষ্ট, হাতে পায়ে যন্ত্রণা। সেলিম বড় বড় চোখে এলবিকে দেখছে। এলবি কিছু ফল এনেছিল সঙ্গে। সেলিমের টেবিলে ফলগুলো রাখল। সেলিম বড় বড় চোখে এলবিকে দেখছে। সেলিম কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েছে এমন ভাব ওর চোখে মুখে। অথচ এইসব যন্ত্রণার ভিতরও সেলিম হাসল। একজন ডাক্তার, দুজন নার্স ওর পাশে এসে এখন দাঁড়িয়েছে। ওরা ওর শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করল। ওরা সেলিমকে বাঁচবার জন্য উৎসাহিত করল।

এলবি একজন সিস্টারকে প্রশ্ন করল, কাল নিশ্চয়ই প্লেট নেওয়া হচ্ছে?

—আজ রাতেই হবে। মিঃ ট্রয় সব ব্যবস্থা করে গেছেন।

এলবি সিস্টারের প্রতি ধন্যবাদসূচক অব্যয়ে মাথা নোয়াল।

বস্তুত বিজন এই অসুস্থ পরিবেশে সহজ হতে পারল না। এই অসুস্থ

পবিবেশের ভিতব সেলিমকে দেখে সে আহত। সব যুবতী নার্সবা এপ্রন শবীরে জডিযে ধীবে ধীবে অথচ সত্বব পা ফেলে শবীবে সংযমী ভাবটুকু রক্ষা কবে ঘোবাফেবা কবছে। ওবা মহীয়সী বমণী হওয়াব ইচ্ছায দীর্ঘদিন ধবে অভ্যাসে বত। অথচ হতে পারছে না অথবা বিজন ওদেব মহীয়সী বমণীরূপে দেখাব চেষ্টা কবছে না। সে এলবিব মতো একজন নার্সেব সঙ্গে আলাপ কবতে চাইল। আলাপ কবে জানতে ইচ্ছা হল—এই যে তোমবা তোমাদেব মুখ মোমেব মতো সাদা নিষ্পাপ কবে বেখেছ এমত তোমবা নিষ্পাপ অথবা করুণাঘন কি না

ওবা উঠে পডল। সব ভিজিটাবেব শেষে ওবা প্রশস্ত পথ ধবে বড বড সব চত্বব পাব হযে সিঁডি ধবে উপবে উঠে, ফেব সিঁডি ধবে নীচে নেমে হাসপাতালেব সদব দবজায এসে হাজিব হল। এলবি বলল, চল একটু ঘুবে আসি। একটু ইউনিভার্সিটিব সামনেব পার্কটায বসব। একটু গল্প কবব। বাত ঘন হলে তোমাকে জাহাজে পৌছে দিযে বাডীতে ফিবে যাব।

মোটবেব ভিতব বসে বিজন প্রশ্ন কবল সেলিম শীগগিবই ভালো হয়ে উঠবে—কি বল ?

—নিশ্চযই। খুব জোব দিযেই যেন এলবি কথাটা বলল। সেলিম ভালো হযে উঠলে, তুমি আমি সেলিম জীলণ্ডে যাব। সেখানে আমাব বাবা মা থাকেন। বাবা তোমাকে পেলে কিছুতেই ছাডতে চাইবেন না। তোমাকে পাশে বসিয়ে কেবল ট্যাগাবের কবিতা শুনতে চাইবেন। আমাদেব পরিবাবের সকলের ‘গীতাঞ্জলি’ব কবিতা মুখস্থ। ব’লে এলবি মোটবে ষ্টার্ট দিল এবং জোবে জোবে বিশুদ্ধ সঙ্গীতেব মতো কবিতা উচ্চাবণ কবল :

> "When the warriors came out first from
> their master's hall, where had they hid
> their power ? Where were their armour
> and their arms ?
>
> They looked poor and helpless, and
> the arrows were showered upon them
> on the day they came out from their
> master's hall.
>
> When the warriors marched back
> again to their master's hall where did
> they hide their power ?

They had dropped the sword and dropped the bow and the arrow; peace was on their foreheads, and they had left the fruits of their life behind them on the day they marched back again to their master's hall.

কবিতা আবৃত্তি কবাব সময আবার সেই ভাবটুকু এলবির মুখে—তুমি কবিব দেশেব ছেলে, তুমি কবিকে দেখেছ, প্রণাম কবেছ, তোমার ঘনিষ্ঠ হয়ে কবিতা-আবৃত্তিতে অশেষ আনন্দ। তখন মোটব চলছে। তখনো এলবি কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে মোটব চালাচ্ছে। সহবের সব ছোট-বড দোকান, বোশনাই আলো, থিয়েটাব-হল অতিক্রম কবে ওবা পশ্চিমেব দিকে চলছে। এলবি ফের বিশুদ্ধ জগতেব বাসিন্দা হযে যেন প্রতিধ্বনি কবল—পিস ওযাজ অন দেয়াব ফোবহেডস্। অথচ বিজনেব কপালে এখন নিষ্ঠুবতাব চিহ্ন। সে এলবির এই সাহিত্য-প্রীতিতে পীডিত হচ্ছে। যেন বলাব ইচ্ছা—আমি বাপু জাহাজী মানুষ, আমাব ইতস্তত মিথ্যা বলাব নিদারুণ অভ্যাস আছে। সাহিত্য-প্রীতি কোনকালে ছিল না, এখনও নেই।

এলবি বিজনেব দিকে মুখ না তুলেই বলল, আমবা এসে গেছি। আমরা এখানে বেশীক্ষণ বসব না। জলপাই গাছেব নীচে বসে তুমি কবিব কবিতা বলো। আমি শুনি।

বিজন অসহিষ্ণু হযে উঠল। সে বলতে চাইল—আমি কবির কবিতা আবৃত্তি করতে পারব না। জাহাজী মানুষেব কবিতা কণ্ঠস্থ করে লাভ নেই। এই নীরস জীবনে সততার আশ্রয়ে বাঁচা নিরর্থক। তবু এলবি ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এলবিকে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ করছে। এলবি যেখানে বসল, সে সেখানেই বসে পডল। এলবির প্রতি বিদ্রূপের ইচ্ছায় অথবা মাতাল হওয়ার ইচ্ছায় নিরন্তর সে কঠিন। এলবি এখন কোন কথা বলছে না। এলবি ঘন হয়ে বসল। এলবি বস্তুতঃ বিজনকে কবির প্রতীকীতে অনন্য করে রাখতে চাইল।

বিজন মরিয়া হয়ে শিশু-বয়সের পডা কোন কবিতার কথা মনে করতে পারল। (দশম শ্রেণীতে কবির কবিতা সে কিছু পড়েছে—কিন্তু এখন বিধির বিধানে তাও মনে করতে পারছে না। তা ছাড়া ঘটনাটা এমত শীঘ্র ঘটবে সে তাও ভাবতে পারে নি।) সে আবৃত্তি করল। ওর কণ্ঠ মসৃণ

বলে কবিতা-আবৃত্তির বিশুদ্ধ ভঙ্গীটুকু এলবিকে আপ্লুত করল।

বিজন টেনে টেনে আবৃত্তি করছে—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।"

ওরা পরস্পর কথা বলতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে ওরা উভয়ে যেন গম্ভীর এবং ঘন। উভয়ে যেন রবীন্দ্রনাথেব মতো বিশুদ্ধ ইচ্ছার পরস্পর মহৎ ভাবটুকু রক্ষা করছে।

বিজন এলবির নিকট রবীন্দ্রনাথের প্রতীকীতে বাঁচবার ইচ্ছায় এও বলল, মোটরে যে কবিতা আমাকে শোনালে এ-কবিতা তারই মূল ভাষা।

বিজন ভাবল—বন্দরে আমি এলবির চোখে রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাঁচব।

তারপর এলবির মোটর থেকে এক সময় বিজন জাহাজে উঠে ফোকসালে ঢুকে দেখল, দেবনাথ বাংকে ঘুমিয়ে আছে। অন্যান্য কেবিনেও বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ানক শীতে সব জাহাজীরা কম্বল মুড়ি দিয়ে জাহাজে ঘুমোচ্ছে। সে ফোকসালে দাঁড়িয়ে কিছু কাসির শব্দ শুনল। দু-একজন জাহাজীর আলাপ শুনল। এ-শীতে উপরে উঠে ওর হাত-মুখ ধুতে ইচ্ছা হল না। কোনরকমে লকার থেকে খাবারটা বের করে খেয়ে নিল। তারপর ঠাণ্ডা জলে কুলকুচা করে পোর্টহোলে মুখ ধুলো। এবং বাংকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছায় হাত-পা সটান করে দিল। অথচ ঘুম এল না। ঘুম আসছে না। বিজন অন্য ফোকসালে ফের কিছু জাহাজীর আলাপ শুনছে। এখন হয়ত এলবি ঘরে ফিরে অন্য কবিতা আবৃত্তি করছে। এই বাংকেও সে এলবির কাছে মিথ্যার মুখোসের জন্য ছটফট করছে। অথচ সে স্পষ্ট হলে সাময়িক যন্ত্রণা, দুঃখ এবং নিষ্ঠুরতার গ্লানিকে ধৈর্য ধরে লালন করতে হত না; এই করে সে এক মিথ্যার জন্য হাজার মিথ্যায় জড়িয়ে পড়ছে।

ওর ইচ্ছা হল একবার দেবনাথকে ঘটনাটা খুলে বলে। সাহিত্য-প্রীতি এবং স্পৃহা দেবনাথের যথেষ্ট আছে। বরং সে দেবনাথকেই সঙ্গে নেবে। অথবা দেবনাথকে প্রশ্ন করে জানবে—ওর কাছে কবির কোন বই অথবা কোন কবিতা কণ্ঠস্থ···যদি থাকে তবে···তবে···সে নিঃসংশয় হতে পারছে না তবু। দেবনাথ! দেবনাথ! সে যেন ডেকেই উঠল। মনে মনে ওর এই ডাক এবং এলবির সরল

বিশ্বাস, দুটো চোখের ঘনিষ্ঠতা—সব মিলিয়ে ওর চোখে জ্বালা। ওর ঘুম আসছে না। এলবি 'পাখীসব করে রব' ইংরেজী হরফে লিখে নিতে চেয়েছিল। সে হয়ত এইসব মুখস্থ করে অন্য কোথাও আবৃত্তি···কিংবা বাহবা···কিন্তু বিজন বলেছে তখন শরীরটা ভালো নেই। আবার কাল হবে। আবার সে ছলনাকে কেন্দ্র করে বাঁচতে চাইল। এলবির ঘনিষ্ঠতা, সঙ্গ এবং দু'দণ্ডের আলাপ থেকে বিচ্ছেদের নিঃসঙ্গতায় সে বাঁচতে চাইল না। বিশেষত এই বিদেশিনীর কাছে স্পষ্ট হওয়ার দরুন কোন পরাভবকে স্বীকার করার দরুণ কোন গ্লানিকে ধৈর্য ধরে সহ্য করতে পারত না। অপমানবোধটুকু বিজনের অসামান্য। সেজন্য এই মিথ্যার মুখোসে আপাতত জাহাজী ভাবটুকু রক্ষা করতে পেরেছে ভেবে সে খুশী।

ভোরবেলায় জাহাজে অনেক কাজ। সালফেট নামানো হচ্ছে। হাড়িয়া-হাপিজ হচ্ছে ফল্কায় ফল্কায়। ভোরে আজ সূর্য উঠল না। আকাশ মুখ গোমড়া করে আছে। সমুদ্রের বাতাস পর্যন্ত। বন্দরের পাইনগাছে কোন পাখী বসে নেই। শীতের জন্য ওরা পৃথিবীতে চলে যাচ্ছে। শীতের জন্য এইসব জাহাজীরা হি-হি করে কাঁপছে। ওরা সাবান-জল নিয়ে আজ ছুটে ছুটে কাজ করতে পারছে না, ওরা স্থাণুর মতো নীল উর্দির ভিতর গুটিয়ে আসছে। ওরা পুরানো জামা-কাপড় সব আফ্রিকার বন্দরে বিক্রি করে এখন পস্তাচ্ছে। শীতের কষ্ট ভয়ানক কষ্ট।

পাশের জাহাজে কিসের যেন সোরগোল। পাশের জাহাজের নাবিকেরা পোর্ট-সাইডের ডেকে জড়ো হয়েছে। ওরা রেলিঙের উপর ঝুঁকছে। ওদের সকলের চোখ বন্দরের জলের উপর। এই জাহাজের নাবিকেরা ঘটনাটা ধরতে না পেরে গলুই-এ জড়ো হয়েছে। মেজ মালোম অন্য জাহাজীদের ডেকে ঘটনার কথা জানতে চাইলেন। ওরা সকলে এখন খবরটা শুনছে। পাশের জাহাজের তিন-নম্বর মিস্ত্রী জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাটা তারপর আরও বিস্তৃত হল। বন্দরের সব লোক জমেছে। এ-শীতেও কিছু লোক জলে নেমে অনুসন্ধান করছে তিন-নম্বর মিস্ত্রীকে অথচ মিস্ত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইংলণ্ডে ওর স্ত্রী এডাল্ট্রি কেসে জড়িয়ে পড়েছে—এই খবরটা এখন জাহাজীদের মুখে মুখে।

ভোরের এইসব সাত-পাঁচ ঘটনায় বিজন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ওর মনে নেই এবং মনে পড়ছে না—গতকাল এক রমণীয় পরিবেশে কোন এক সুন্দরী যুবতীর পাশে মরিয়া হয়ে মিথ্যার পসরা খুলেছিল। মনে পড়ছে না আজও এমত ঘটতে পারে। একজন জাহাজীর আত্মহত্যা এবং সালফেটের গন্ধ আর এই

প্রচণ্ড শীত ওকে ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিলকুল বিপরীত ধারণার বশবর্তী করেছে। সে ভাবল মৃত্যুই শ্রেয়, মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ। পিস্ ওয়াজ অন দেয়ার ফোরহেড্স্—সে একথাও ভাবল। সেলিমের কপালে শান্তির রেখা ফুটে উঠেছে হয়ত। এলবির সেই মুখ—সেখানেও একদিন শান্তির রেখা নামবে—কবিতা আবৃত্তির সময় এলবির সেই গভীর দৃষ্টি, সেই দৃঢ় অথচ প্রীতিপূর্ণ চোখ সে রেলিঙে দাঁড়িয়ে নিঃস্ব পাইনের আঁধারে সহসা যেন দেখল। এলবি তাকে ভালবাসতে চায়। রবীন্দ্রনাথের মতো করে ভালবাসতে চায়। বিজন যেন এখন কবির প্রতীকীতে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে ডাকল—দেবনাথ, দেবনাথ নীচে এস, কথা আছে। বিকেলের কথা রাখার জন্য সে নীচে সিঁড়ি ধবে ফোকসালে ঢুকে গেল।—তুমি তো অনেক বই এনেছ সঙ্গে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন বই আছে তোমার কাছে? এইসব বলার ইচ্ছা হল।

সে দেবনাথের কাছেই 'গীতাঞ্জলি' পেল। সে তিক্ত বিস্বাদে বইটির পাতা উলটাচ্ছে। সে বার বার করে একই কবিতা পড়ল। পড়ে মুখস্থ কবল। সে পড়ল—

"জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে"

বিকেলে মোটর নিয়ে এলবি বন্দরে হাজির। বন্দরে সে বিজনের জন্য অপেক্ষা করছে। কিনারার শ্রমিকেরা এখন জাহাজের কাজ ছেড়ে বাড়ী ফিরছে। ওরা সকলে এলবিকে অভিবাদন জানাল। কোয়ার্টার-মাস্টার তখন খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন বিজনকে। বিজন একবার গলুই-এ উঠে উঁকি দিয়ে এলবিকে দেখল। সে একবার আবৃত্তি করল সিঁড়ি ধরে নামার সময়। সে একবার সেলিমের হাসপাতালের দৃশ্যে, পরে এই কবিতার সুরে এবং আরও পরে পোশাকের ভিতর ঢুকে গিয়ে অম্লান থাকার ইচ্ছায় শিস দিতে থাকল।

নীচে নেমে ওরা উভয়ে পরস্পরকে অভিবাদন জানাল। বিজন মনে-মনে কবিতা আবৃত্তি করল—সেই নির্দিষ্ট কবিতা, সেই সুরে, সেই নিঃস্ব অথচ ভরা কোটালের মতো আবেগধর্মিতায়। অথচ এলবিকে জানতে দিল না মনে মনে সে এখন কবিতা আওড়াচ্ছে। মনে-মনে সে এখন কবিতার মতোই বিশুদ্ধ ভাব নিয়ে বেঁচে আছে। সে সেলিমের পাশে বিশুদ্ধ ভাব নিয়ে বসবে। সে সেলিমের মাথায় হাত বুলিয়ে বিশুদ্ধ শান্তি দেবে। বলবে, তুই ভালো হয়ে উঠবি। বলবে নার্সকে—প্লেট কি বলছে? আর কতদিন সেলিমকে এখানে থাকতে হবে?

মোটরে ওরা ভিন্ন ভিন্ন রকমের কথা বলল। রাজনীতি থেকে খেলাধুলো, এমনকি রয়েল হাসপাতালে দুজন ভারতীয় মেয়ে নার্স ট্রেনিং-এ আসছে এ-খবরও দিল এলবি। ওর বাবা পার্থে যাচ্ছেন। মা এবং বাবা হয়ত যাওয়ার পথে একবার এখানে এসেও যেতে পারেন। কারণ এলবি বিজন সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখে দিয়েছে। সুতবাং বাবা আসছেন, মা আসছেন।

এলবি মোটর চালাবাব সময় একবার হাতের ঘড়ি দেখল। যেন আজ হাতে কিছুটা সময় বেশী আছে। খুব বিশেষ তাডা নেই কাজেব। মোটরের গতি সাধারণ। এলবি খুব খুশী-খুশী হয়ে কথা বলছিল। বলছিল, আশা করি সেলিমের ভালো খববই আমরা পাব।

ওরা হাসপাতালে কিন্তু শুনল অন্য কথা। মিঃ ট্রয় সেলিমেব কাছে এলবির নামে একটা চিঠি বেখে গেছেন। এলবি চিঠিটা পডল। এলবিকে এখন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বিষণ্ণতা বিজনেও সংক্রামিত হল।

এলবি বলল, সেলিমেব মেজব অপারেশন হবে। বাঁ দিকের ফুসফুসটা বাদ যাবে। এলবি এইসব কথা হাসপাতালের সিঁডি ধবে নামাব সময় বিজনকে শোনাল।

বিজন বিছানায় বসে সেলিমেব সঙ্গে রঙ্গতামাসা কবেছিল। দেশে ফিরলে সেলিম বিবিকে প্রথম কোন জাহাজী বন্ধুব গল্প শোনাবে, প্রশ্ন করে বিজন জানতে চেয়েছিল আরও অনেক সব কথা—বিজন এখন সব যেন মনে কবতে পারছে না।

অন্যান্য দু-একজন জাহাজীও ওব পাশে বসে ছিল। সাবেঙ বলে পাঠিয়েছেন তিনি কাল এসে দেখে যাবেন। বিজন সেলিমেব বিছানায় শেষ সময়টুকু পর্যন্ত কাটাতে পেরে খুশী। তাবপর ভিজিটারদের শেষ ঘণ্টা পডল। সিঁড়ি ধরে নামবার সময় সেলিমেব অস্ত্রোপচাবের কথা শুনল। এবং এই শুনে বিজনের কেমন অন্যমনস্কতা বাডছে। এলবি মোটরে বসে লক্ষ্য করছে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় বিজন খুব ভেঙে পডছে। এলবির এখন বিজনকে উত্তেজিত করার ইচ্ছা। জাহাজী বিজন কেমন মফস্বলের মেয়েমানুষ বনে যাচ্ছে।

ওরা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কটায় ঢুকে গেল, যেখানে মিমোসা-ফুলেরা ঝরে গেছে, যেখানে রেস্ট-রুমে বসে যুবক-যুবতীরা সব শরীরী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, যেখানে বাটারকাপ ফুল ফুটে একদা সুন্দরী রমণার টুপির পালকের মতো উদ্ধত হতে হতে শীতের তাড়নায় মলিন হয়ে গেছে—তার ভিতর দিয়ে জলপাইয়ের ঘন বন পার হয়ে ইউকালিপটাসের ঘন আলো-আঁধারে ওরা বসে পড়ল। পাতায়

আড়ালে আড়ালে সব স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ আলো। আলোর ছায়া। জাফরী-কাটা রঙ ওদের শরীরে, মুখে। ওরা এসময় পরস্পর মুখ তুলে তাকাল।

বিজন বলল, সেলিম আমার সঙ্গে দু'সফর ধরে কাজ করছে। দু'সফর ধরে ওর সঙ্গে উঠে বসে কখন যে আমরা একে অপরকে ভালবেসে ফেলেছি জানিনা। এখন বুঝতে পারছি ওর অভাবটা জাহাজে আমার কত বড় হয়ে বাজছে।

তারপর ওরা এইসব স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ আলোয় অথবা মনের আরও সব নীল ইচ্ছায় প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে—তারপর সেই কবিতার জগতে ফিরে আসা কবিতার জগতে ডুবে যাওয়া, ইতিহাসের মৃত নায়কের মুখের মতো ছবি হয়ে বসে থাকা এবং অবশেষে নিজেদের প্রাপ্য হিসাবে মনে-মনে অচঞ্চল থাকার বাসনা—এমন একদিন হয়নি, অনেকদিন হয়েছে। ওরা পরস্পর পরস্পরকে কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে। এলবি বিজনকে বাড়ি নিয়ে গেছে। ওর হাতের আঁকা ছবি দেখিয়েছে। তারপর কোন রেস্টুরেণ্টে অথবা নীল আকাশের নীচে বসে সেলিমের অস্ত্রোপচারের দিনের কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়েছে।

একদিন এলবি বলল, বাবা মা কাল আসছেন।

—জীলঙ এখান থেকে কতদূর? প্রশ্ন করেছিল বিজন।

—খুব বেশী দূর নয়। পুরো তিনশ' আটচল্লিশ মাইল।

—কিসে ওঁরা আসবেন?

—ট্রেনে আসা যায়। বাবা মোটরে আসছেন। খুব প্লেজাণ্ট জার্নি।

একটু থেমে এলবি বলল, ওঁদের সঙ্গে আলাপে তুমি খুব খুশী হবে।

—আমার সঙ্গে আলাপে ওঁরা খুশী হবেন তো?

এলবি হাসল।

দুদিন পর এলবি ওর বাবা-মার সঙ্গে বিজনকে পরিচয় করিয়ে দিল। ওঁরা বিজনকে বললেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য—তোমাকে আমাদের ভিতর পেয়েছি। পরম সৌভাগ্য, এলবি এসময় খবর দিয়ে তোমার কথা জানিয়েছে। আমরা সকলেই কবির ভয়ানক ভক্ত। তুমি তাঁর পাশের লোক। তুমি ওঁর স্পর্শলাভ করেছ—এবং আমরা তোমার সঙ্গলাভ করেছি ভেবে খুশী।

এলবির বাবার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে বিজন সত্যি খুশী। ভদ্রলোক অমায়িক। ভদ্রলোক প্রাণ-উচ্ছল অথচ কথাবার্তায় খুব সংযত। বিজনের মুখ থেকে কবির কবিতা শোনার একান্ত ইচ্ছা ওঁদের। বিজন পর পর কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করল।

ওঁরা খুশী হয়ে বললেন, তুমি আমাদের কথা দাও ডিনারে একদিন উপস্থিত থাকবে। আমরা খুব আনন্দিত হব তোমার উপস্থিতিতে।

—দিন স্থির করুন, আসব।

—কিন্তু একটা কথা। মিঃ চার্লটন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। একটা সিগারেট ধরালেন এবং টেবিল ঘুরে এসে বিজনের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা তোমাকে চাইনিজ ডিশ দেব। খুব মনোরম খেতে। কিন্তু ··· ।

এলবি এবার আর একটু প্রকাশ করল। —বাবা চায়নাতে অনেকদিন ছিলেন। এম্‌ব্যাসিতে কাজ করতেন। সুতরাং বাবা কোন ভদ্রলোককে ডিনার-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেই তাঁকে চাইনীজ ডিস দিতে ভালবাসেন।

চার্লটন আবার আরম্ভ করলেন, কিন্তু কথা হচ্ছে ট্যাগোরের দেশের ছেলে তুমি—বলতে গেলে ঘরের ছেলে। সুতরাং ট্যাগোর কি খেতেন এবং খেতে ভালবাসতেন নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। মেন্যুতে ট্যাগোর-ডিশও একট থাকবে—কি বল। তার প্রিপারেশনের ভার তোমার উপর। কি কি লাগবে বলে দাও, আমি সব সংগ্রহ করে রাখব। আগামী রবিবার ছুটির দিনে আমরা এখানে ফের আসব। এবার তিনি থামলেন। পাশে মিসেস চার্লটন উল বুনতে বুনতে লাফিয়ে উঠলেন, বড় চমৎকার হবে। এলবির পিসিকে বললে হয়। তারপর আরও দু-একজনের নাম তিনি বলে গেলেন।

বিজন বলল, রান্নাতে আমি রপ্ত নই। দেবনাথ বলে একজন জাহাজী আছে—সেও বাঙালী, সে ভালো রাঁধতে জানে। ওকে নিয়ে আসব।

এলবি টেবিলের উপর খাতা রেখে বলল, কি কি সংগ্রহ করতে হবে বল।

—কিছুই দরকার হবে না। কারণ মশলাপাতি তুমি এখানে কোথাও খুঁজে পাবে না। সরষের তেলও বোধহয় নেই। দেবনাথকেই বলব সব সংগ্রহ করতে, পার তো কিছু ডিম, মাংস এবং ভেজিটেবল সংগ্রহ করে রেখ—তাতেই চলবে।

এলবি দীর্ঘদিন পর আজ সকলকে পিয়ানো বাজিয়ে শুনালো। বিজন দেখল আগুনের মত রঙ এলবির শরীরে। এলবির সাদা স্কার্ট এবং হলুদ জ্যাকেট থেকে সে-রঙ যেন চুইয়ে পড়ছে। বাইরে শীতের ঠাণ্ডায় যেন তুষার ঝরছে। ওরা তিনজন আগুনের পাশে বসে উত্তাপ নিচ্ছে। মাঝে মাঝে মিসেস চার্লটন উনুনে কাঠ গুঁজে দিচ্ছেন। মিঃ চার্লটন চীনদেশের গল্প করছেন এখন। সে-দেশের রীতিনীতির গল্প করছেন। এলবি এখন আর পিয়ানো বাজাচ্ছে না। চেয়ারে বসে সেও বিদেশের গল্প শুনছে। সহসা এইসব কথার ভিতর বিজন যেন দেখল

ওরা সকলে একই পরিবারভুক্ত লোক হয়ে শীতের রাতে উনুনের পাশে আগুন পোহাচ্ছে। সহসা মনে হল বাংলাদেশেরই কোন পরিবারের ভিতর সে বসে যেন ঠাকুমার গল্প শুনছে।

দেবনাথ এবং বিজন সকাল-সকাল জাহাজ থেকে নেমে গেল। ছুটির দিন। এই শীতের ভিতরও সহরের সব যুবক-যুবতীরা ছুটি ভোগ করতে দলে দলে বের হয়ে পড়েছে। ওরা সব রেস্তোরাঁয়, পাব-এ অথবা পার্কে কিংবা অনেকে সহরতলীতে ছড়িয়ে পড়ছে। দেবনাথ এবং বিজন হেঁটে যেতে যেতে সব টের পাচ্ছে। ওদের হাতে ছোট নীল ব্যাগ—ট্যাগোর-ডিশের জন্য যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা ওতে। ওরা গল্প করতে করতে অথবা অযথা উচ্ছল হতে হতে হাঁটছে।

ওবা বন্দর ফেলে, জনসন রোড ধরে ছোট পাহাড়টায় উঠে গেল। এখানে ছোট ছোট কাঠের ঘর—নীল অথবা হলুদ রঙের। দবজায় নীল রঙের পালিশ। বাড়ীর সংলগ্ন ছোট ফুলেব বাগান, সবজির বাগান। প্রচণ্ড শীতেব জন্য বাগানে কোন ফুলের চিহ্ন অথবা সবজির চিহ্ন নেই। গোলাপেরা শুধু কুঁড়ি মেলার চেষ্টা করছে। ওরা দ-এর মতো পথে, কখনও সিঁড়ি ভেঙে, কখনও ঘুরে ঘুরে এলবির ছোট নীল আস্তানায় গিয়ে হাজির হল। প্রথমেই ছোট কাঠের দরজা। সংকীর্ণ ফুটপাতের বাঁ পাশের থামটায় লেখা 'শান্তির নীড়' তামার প্লেটে খুব চক্‌চক্ করছে। সদর দরজার উপর আইভি-লতার গুচ্ছ। পাতা নেই—শুধু লতাগুলো ঝুলছে। ভিতরে বাঁ পাশে মুরগীর ঘর। ডানপাশে ফুলের বাগান। 'এল' অক্ষরে পথ। পথের দু'পাশে নানারকমের সামুদ্রিক পাথর। অন্য পাশে কোমর-সমান কাঠের রেলিঙে কিছু নীল প্রজাপতি বসে আছে; মিঃ চার্লটন এবং মিসেস চার্লটন বের হয়ে তখন ওদের অভিবাদন জানালেন। বললেন, গতকালই আমরা এসে গেছি।

এলবিও সেজেগুজে বের হল। যেন ফুলের মতো এই শীতের হালকা রোদে ফুটে উঠল। এলবি ওদের ভিতরে নিয়ে গেল। বিজন দেবনাথের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিল। এলবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেবনাথকে সমস্ত বাড়ীটা দেখাল। এই ওর বাড়ী—এখানে সে থাকে, এই ওর ঘর—এখানে সে রাঁধে, এই ওর ঈজেল—এখানে সে ছবি আঁকে। দেবনাথ সব ঘুরে দেখল। এলবির একটি বিশেষ রুচি আছে এ-বোধ ওর এখন জন্মাচ্ছে। ঘরে সব বড় বড় ক্যানভাস। নানা রঙের ছবি।

ওরা এসে পাশের ঘরটায় বসল। মিঃ চার্লটন কতকগুলো ছোট ছোট কাঠি এনে পাশে রাখলেন। মণ্ডপ করার জন্য কিছু শিরিষ কাগজ। তিনি সকলকে

কাঠিগুলো দেখালেন— এগুলো রাইস-স্টিক্। তারপর দু-আঙুলের ফাঁকে কাঠি চেপে কায়দা-কানুন শেখাতে থাকলেন দেবনাথ এবং বিজনকে। দেখালেন, কি করে স্টিক ধরতে হয়, কি করে মুখে ভাত তুলতে হয়। একটা খালি চিনেমাটির বাসনও রাখলেন সকলের সামনে। ছোটখাটো একটা ডেমনস্ট্রেশন দিলেন।

দেবনাথ এইসব দেখে বিরক্ত হচ্ছিল। সে ঘড়ি দেখল। এখন দশটা বাজে। এখনও এলবি টেবিল সাজাচ্ছে। কখন রান্না হবে এবং কখন খাওয়া হবে এই ভেবে সে উষ্মা প্রকাশ করল।

একটি ঘরকেই এলবি কাঠের পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগ করে নিয়েছে। এ-ঘর থেকে সে-ঘরে যাওয়ার একটি মাত্র খোলা পথ। একটি মাত্র দরজা। দরজায় পাল্লা নেই। দরজায় চাইনীজ সিল্কের দামী পর্দা। পর্দা সরালেই ঘরটা স্পষ্ট। পর্দা সরালেই ধবধবে বিছানা স্পষ্ট। দেবনাথ পর্দা সরিয়ে সব দেখল। বারান্দার দক্ষিণদিকে চিলতে রান্নার জায়গা। পরে বাথরুম, পাশে ছোট একটি লনের মতো জায়গা। সেখানে গরমের দিনে ইজিচেয়ার নিয়ে বসা যায়। সেখানে একটি ভাঙা ঈজেল এখনও রেলিঙের সংলগ্ন হয়ে পড়ে আছে। ছুটির দিনে এলবি সেখানে ছবি আঁকে।

ওরা উঁচু জায়গায় বসে বন্দর দেখল। বন্দরের জাহাজ দেখল। এখানে বসে অসীম সমুদ্রের বিস্তৃতি চোখে পড়ছে। পাহাড়ের নীচে সারি সারি ছবির মতো ঘর, ছবির মতো মানুষেরা হাঁটছে। দেবনাথ চারপাশটা চোখ মেলে দেখল।

দেবনাথ ফের ঘড়ি দেখে বাংলাতে বলল বিজনকে, এরা কি আমাদের নিমন্ত্রণ করে খালি-পেটে রাখার যোগাড় করছে নাকি! এখন বাজে সাড়ে দশটা—অথচ রান্নার কোন আয়োজনই করছে না।

বিজন বলল এলবিকে, সব যোগাড় আছে তো? অর্থাৎ এই কথা বলে বিজন রান্নার প্রসঙ্গে আসতে চাইল।

এলবি ফুলদানিতে কিছু সংগ্রহ-করা ফুল ভরে দিল। এলবি তারপর বিবাহিত রমণী-সুলভ চোখে বিজনকে দেখল এবং বলল, সবই এনেছি। তোমাকে ভাবতে হবে না। রান্নাঘরে ঠিক আমরা এগারোটায় ঢুকব। এবং আশা করছি ঠিক বারোটায় রান্না শেষ করতে পারব। ট্যাগোর-ডিশের কি কি মেন্যু হবে?—এলবি দেবনাথকে প্রশ্ন করল।

দেবনাথ বলল, মেন্যু বেশী করতে হলে অনেক সময়ের দরকার হবে। বস্তুত দেবনাথ ডিমের ঝোল অথবা মাংসের ঝোলই ভালো রান্না করতে পারে। মাছের

ঝোল করতে বেশী দেরী হবে বলে সে বলল, রাইস এবং এগ-কারী।

এলবি বলল, রাইস তো চাইনীজ ডিশেও থাকবে। সুতরাং একমাত্র এগ-কারী।

একসময় দেবনাথ এবং মিঃ চার্লটন রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। দেবনাথ সঙ্গে করে গুঁড়ো মশলা এনেছে। এলবি দেবনাথকে সিদ্ধ ডিমের কৌটা খুলে বড় বড় কিছু ডিম বের করে দিল। মিসেস চার্লটন এবং বিজন ওঁদের সকলকে কাজে সাহায্য করলেন। গ্যাসের উনুনে আতপ চালের ভাত হল। এই ভাত রান্নার কৌশলটুকু আয়ত্ত করে মিঃ চার্লটন এখন গৌরব বোধ করছেন। তিনি ভাত রান্নার সময় গল্প করছিলেন—কোথায়, কখন এবং কি কৌশলে তিনি এই দুর্লভ বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। অন্তত হাজারবার সেই নির্দিষ্ট চাইনীজ মহিলাটিকে তিনি ধন্যবাদ জানালেন। জানালেন ভদ্রমহিলা খুব হৃদয় দিয়ে তাঁকে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে সাহায্য করেছেন।

এলবি কৌটা থেকে কিছু কর্ন-বীফ বের করে দিল। মিসেস চার্লটন ময়দার ডেলা গোল গোল করে সেই কর্ন-বীফ ভিতরে ভরে দিচ্ছেন। সেগুলো জলে সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। এ-সময় ভয়ানক উৎকট গন্ধে বিজন ঘরে থাকতে না পেরে বাগানে চলে এল এবং অনেকক্ষণ ধরে একা-একা পায়চারী করল।

একঘণ্টার ভিতরেই প্রায় সব হয়ে গেল। রাতে ছোট একটা ভেড়ার বাচ্চা রোস্ট করে রাখা হয়েছিল। এখন শুধু ওটাকে ফের চর্বি মাখিয়ে গরম করে নেওয়া হল। গ্রীন পীজ সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। কিছু স্যালাড, স্যাণ্ডউইচ। ইতিমধ্যে মিঃ ট্রয় এসে গেছেন, টনি এসে গেছে, এলবির পিসিও এসে পড়লেন। এবং অন্যান্য আরও দু-একজন অপরিচিত ব্যক্তি যাঁরা সকলেই মিঃ চার্লটন অথবা মিসেস চার্লটনের বন্ধু পর্যায়ের। ওঁরা ঘরে ঢুকে সকলে সকলকে অভিবাদন জানালেন এবং পরিচিত হলেন।

খাবার টেবিলে ওঁরা সকলে সকলকে সাহায্য করলেন। খেতে বসার আগে এলবি বলল, আমরা ভগবানের পৃথিবীতে নিত্য দুটো আহার্য গ্রহণের সময় সকলে প্রার্থনা করব—বেচারী সেলিম আরোগ্য লাভ করুক। সকলে দাঁড়ালেন এবং মিনিট দুই কাল সেলিমের নিরাময়ের জন্য অধোবদনে থাকলেন। তাঁরা সকলে প্রার্থনা করছেন। এলবিকে যথার্থই এখন কোন বাঙালী আটপৌরে গৃহিণীর মতো মনে হচ্ছে।

খেতে বসেই খুব উৎসাহের সঙ্গে চার্লটন ভোজ্যদ্রব্যের ফিরিস্তি দিলেন

প্রথম। কিছু রাইস-স্টিক পরস্পর পরস্পরকে দিলেন। প্রথমেই চীনেমাটির বাসনে কিছু ভাত এবং আধসিদ্ধ মাংসপুর, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো চার্লটন সকলকে পরিবেশন করলেন। এবং কাঠির সাহায্যে সকলকে খেতে অনুরোধ জানালেন। এইসব আধসিদ্ধ মাংসপুর, ভাত কাঠির সাহায্যে মুখে তুলতে গিয়ে বিজন ওয়াক্ তুলতে তুলতে বলে ফেলল, যথার্থই চমৎকার আপনার এই চাইনীজ ভোজ্যদ্রব্য। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ চার্লটন মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন, বলেছি না ওরা তারিফ করবে! চীন ভারতবর্ষ পাশাপাশি দেশ। সংস্কৃতিতে সভ্যতায় ওরা প্রায় এক।

দেবনাথ ছোট ছোট চোখে মিঃ চার্লটনকে দেখল। ইচ্ছে হল ডিশের সবগুলো ভোজ্যদ্রব্য চার্লটনের মুখে ছুঁড়ে দেয়। অথচ সেও বলল, ভেরী নাইস।

দেবনাথ এবার ট্যাগোর-ডিশেব এগ-কাবী সকলকে পরিবেশন করল। সে জানত লঙ্কার গুঁড়োটা একটু বেশীই পড়েছে। সে জানত ঝাল খেয়ে ওঁদেব জিব টাটাবে। সে বিদ্রূপ করে বলল, ট্যাগোর ঝাল একটু বেশী খেতেন।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাল চার্লটনের মাথায় উঠে গেল। চার্লটনের মাথায় টাক—তিনি তালুতে ঠাণ্ডা হাত রাখলেন। ঝাল খেয়ে অন্য সকলের ঠোঁট কুঞ্চিত হচ্ছে প্রসারিত হচ্ছে। সকলে মাথায় ঠাণ্ডা হাত রাখলেন। সকলে জল খেলেন প্রচুর। এবং গাদা গাদা চিনি খেলেন। চোখ সকলের ভারী হয়ে উঠেছে, লাল হয়ে উঠেছে। ওঁরা তবু কোনবকমে উচ্চারণ করলেন, গ্র্যাণ্ড! ট্যাগোর-ডিশ গ্র্যাণ্ড!

দেবনাথ এবং বিজন ভাতের সঙ্গে ডিমের ঝোল বেশ তৃপ্তি করেই খেল। ওরাও বলল, ট্যাগোর-ডিশ গ্র্যাণ্ড। তারপর ওরা কাঠি দিয়ে ভাত খাওয়ার চেষ্টা করল। কিছু খেল, কিছু নষ্ট হল। তারপর স্যাণ্ডউইচ, গ্রীন পীজ এবং ল্যাম্ব-রোস্ট খেয়ে ওরা খুশী হতে পারছে। ওদের এখন সেই ত্রাহি-ত্রাহি ভাবটুকু নেই। শেষে কফি খেয়ে ওরা সকলে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। সকলের মুখ দেখে মনে হবে এখন এইমাত্র টেবিলে বড়রকমের একটা ঝড় বয়ে গেছে।

বিকেলে ষ্টেশন-ওয়াগনে মিঃ এবং মিসেস চার্লটন জীলঙের উদ্দেশে রওনা হলেন। মিঃ ট্রয় ও অন্যান্য দু-একজন আগেই চলে গেছেন। এলবির পিসি গেলেন এইমাত্র। যাওয়ার আগে দেবনাথ এবং বিজনকে ওঁর ঘরে একদিন নিমন্ত্রণ করে গেলেন। দেবনাথ গেল সকলের শেষে। হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ওরা

তিনজন যখন গাড়ীতে উঠতে যাবে তখন দেবনাথ বলল, এবার আমি যাই। জাহাজে আমার একটু দরকার আছে।

গাড়ীর ভিতর এলবিকে আজ একটু উচ্ছল বলে মনে হল। এলবি বলল, সেলিম দেখবে ভালো হয়ে উঠবে। ওকে আজকে খুব ভালো দেখাচ্ছিল। সে নিজে এখন উঠতে নামতে পারছে। এখন অপারেশন হলে বাঁচি।

—আমিও আশা করছি আমরা একসঙ্গে দেশে ফিরতে পারব। একসঙ্গে ফিরতে পারলে খুবই আনন্দের ব্যাপার ঘটবে।

এলবি কথা বলল না। এলবি সন্তর্পণে ওর মুখ দেখল। বিজনের মুখে যেন এখন কোন যন্ত্রণার ছবি নেই। যেন সে এমত ঘটনায় যথার্থই আনন্দিত হবে। এলবি স্টীয়ারিং-এ বসে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

ওরা আবার জাফরী-কাটা আলো এবং পাতার ছায়ায় এসে বসল। বিকেল থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে না। ওরা পাশাপাশি আজ বসল না। ওরা মুখোমুখী বসল। এলবি কেন জানি ইচ্ছা করেই পর পর চার-পাঁচটি কবিতা শোনালো বিজনকে। আজ বিজনকে বাংলা কবিতা আবৃত্তি করার জন্য কোন অনুরোধ করল না, এমনকি বিজন কতটা আগ্রহ নিয়ে শুনছে তাও লক্ষ্য করল না। এবং এই কবিতা-আবৃত্তির সময়ই এলবির একটু মদ খেতে ইচ্ছে হল। বলল, তুমি একটু মদ খাবে বিজন ?

সে-রাতে উভয়ে মদ খেয়েছিল। অথচ পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয় নি। পরস্পর গোলাপী নেশায় উন্মত্ত হয় নি। তবু কেন জানি বিজন ঘাস থেকে উঠতে পারছিল না। সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ওর দস্তানা খুলে যাচ্ছে। পেটের ভিতর এক দুরন্ত যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে উঠছে। সে বলল, এলবি, আমি আর পারছি না।

এলবি সমস্ত শক্তি দিয়ে বিজনকে তুলে ধরল এবং ধীরে ধীরে মোটরের ভিতর শুইয়ে দিল। তারপর বাড়ি ফিরে বিজনকে নিজের খাটে শুইয়ে দিল এবং ফোন তুলে ডায়াল করল ; বলল, ক্যারল আছেন ? ডঃ ক্যারল। প্লীজ ফাইভ বাই এইট নটিংহিল। পেশেন্ট সিরিয়াস।

ডাক্তার বিজনকে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, কনস্টিপেশনের জন্য এমন হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। দু'দিনেই ভালো হয়ে উঠবে। দু'রকমের পিল থাকল। এখন একটা খাইয়ে দিলেই ব্যথাটা কমে আসবে। পেটে একটু গরম জলের সেঁক দিতে পারেন।

ডাক্তারবাবু চলে গেছেন। এলবি বিজনকে বলে দু'মিনিটের জন্য বাইরে গেছে। বিজন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে দেওয়ালের সব ছবি দেখল। বড় বড় সব ক্যানভাসে নানারঙের ছবি। কবির ছবি দেয়ালে। হলুদ রঙের দেয়াল। এলবির হাতে আঁকা কবির এই ছবি যেন বিজনকে বিদ্রূপ করছে। যেন বলছে বাপুরা যাহোক তোমরা আমাকে নিয়ে তামাসা করলে। বিজন এই যন্ত্রণার ভিতরও প্রথম দিনের কথা ভেবে অনুতপ্ত। বস্তুত সে দুঃসহ যন্ত্রণায় অধীর হয়ে ওর প্রথম দিনের ইচ্ছাকৃত তামাসার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিল।

এলবি ঘরে ফিরেই বিজনের কপালে হাত রেখে উত্তাপ দেখল। তারপর জল এনে পিল খাইয়ে দিয়ে হট-ওয়াটার ব্যাগে পেটে সেঁক দিতে থাকল। অধীর আগ্রহে সারারাত জেগে ওর পাশে বসে থাকল। ভোররাতের দিকে দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে বিজন যেন মুক্তি পেল। বিজন পাশ ফিরে এলবির সেই আন্তরিক এবং প্রীতিপূর্ণ চোখের দিকে চেয়ে বলল, এলবি, তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম।

এলবি ওর কপালে হাত রাখল শুধু। কোন কথা বলল না। বিজন ওর চোখ দেখেই বুঝল, বুঝতে পারছে এ-মুহূর্তে ওকে নিরাময় করে তোলার কী আকুল ইচ্ছা এলবির চোখে।

ভোরের দিকে বিজন ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং ঘুম ভাঙতে ওর দেরী হল। জানালার রোদ ওর বিছানায় এসে নেমেছে। এলবি বাইরের ঘরে আছে। কাকে যেন ফোন করল এইমাত্র। বিজন বিছানায় শুয়ে সব ধরতে পারছে—এলবি জাহাজে ফোন করে কাপ্তানের সঙ্গে কথা বলছে, ওর অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর দিচ্ছে এবং সঙ্গে চার-পাঁচদিনের ছুটি মঞ্জুর করার জন্য ফোনে আবেদনপত্র পেশ করছে।

এলবি এ-ঘরে এসে দাঁড়ালে বিজন ভাবল, কি দরকার আর থেকে। শরীর আমার ভালো হয়ে গেছে। বেশ সুস্থ বোধ করছি। বরং আজ জাহাজে চলি। কিন্তু এলবির মুখের দিকে চেয়ে বলতে পারল না কথাগুলো। চোখে ওর সারারাত অনিদ্রার অবসাদ। শরীরে ক্লান্তি। এলবি ওর কপালে হাত রেখে বলল, খুব ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে যাহোক।

—তাই নাকি!

—তা নয়ত কি! একটু মদ খেলে তো, অমনি ঘাসে লুটিয়ে পড়লে।

—তুমি তো জান এলবি, ওটা মদের জন্য হয়নি। ওটা আমার জাহাজে কাজ করার পর থেকেই হচ্ছে। মাঝে মাঝে হত, কিন্তু এমন কঠিন হত না।

একটু থেমে বিজন বলল, বরং এখন জাহাজে চলি।

—তুমি কি পাগল, বিজন! ক্যাবল তোমাকে পুরো পাঁচদিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কাপ্তানকে এইমাত্র খবর দিলাম। তিনি খুব ভালোমানুষের মতো বললেন, সেজন্য কি আছে। নিশ্চয়ই ও চার-পাঁচদিন ছুটি পাবে।

—তুমি তো ছুটি নিলে। এখানে থাকার অর্থই হচ্ছে তোমাকে অসুবিধায় ফেলা।

—আমার কোন অসুবিধা হবেনা। পাশের ঘরে আমি থাকব। যখন যা দরকার আমাকে বলবে।

বিজন পুরো পাঁচ দিন এবং পাঁচ রাতই ওর ঘরে থাকল।

পাঁচ রাতে ওরা পাশাপাশি ভিন্ন ঘরে শুয়ে জানালায় রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখতে দেখতে অথবা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত। অথবা ঘুমিয়ে পড়ার ভান করত। এলবি বালিশের নীচে দুটো হাত সন্তর্পণে ঢুকিয়ে কি যেন বার বার খুঁজত। কি যেন বালিশের নীচে ওর হারিয়ে গেছে। কখনও এলবি রাতের প্রজাপতিদের বিছানার চারপাশে দেখত। ওর প্রতীক্ষার জগতে সেইসব প্রজাপতিরা উড়ে উড়ে একদা অবসন্ন হত এবং সকালের দিকে ওরা ঘুমিয়ে পড়ত। কোন কোন রাতে এলবি এই শীতেও জানালা খুলে রাতের প্রজাপতিদের শরীর থেকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এই ঘন রাতে এবং শীতের রাতেও ওর শরীর মধুর এক উত্তেজনায় অধীর হয়েছে। বাঙালী এক নাবিকের শরীরে কবির যুবা শরীরী বৃত্তিকে স্পর্শ করার ইচ্ছায় সে সহসা কাতর হত। আর বিজন নিজেকে রবীন্দ্রনাথের অনুগামী ভেবে সহজ ইচ্ছার বৃত্তিতে কঠিন তাড়নায়ও ডুব দিতে পারলে না। পর্দার আড়ালটুকু ওদের দুজনকে সেজন্য পরস্পর মহৎ করে রাখল।

জাহাজে ফিরে এসে বিজন প্রথম রাতে অনিদ্রায়, দ্বিতীয় রাতে অসহিষ্ণুতায় ভুগে সারাদিন কাজ করার অজুহাতে ডেক এ পড়ে থাকল। দুদিন এলবি ইউনিয়নের কাজে সহর ছেড়ে অন্যত্র থাকছে মিঃ ট্রয়ের সঙ্গে। দুদিন দেখা-সাক্ষাতের কোন সুযোগ নেই। বিকেল কাটছে হাসপাতালে। পরবর্তী সময়টুকু আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না। খুব নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ ভাব জাহাজে। কেউ থাকছে না। বন্দরে নেমে সকলে গলির আঁধারে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এইসব দেখে সে আর পারছে না, সহজ ভাবটুকু রক্ষা করতে পারছে না।

বস্তুত বিজন এক অহেতুক ঈর্ষায় পীড়িত হচ্ছে। মিঃ ট্রয়কে কেন্দ্র করে এই

ঈর্ষার জন্য। বিজন প্রতিমুহূর্তে নিঃসঙ্গ জাহাজী যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল। এলবিব অনুপস্থিতি যন্ত্রণাব গ্রাসকে কঠোব কবে তুলল। নিদারুণ জাহাজী যন্ত্রণায় সে দেবনাথেব সঙ্গে গোপনে সস্তায় একটু মদ এবং সস্তায় একটু যৌন-সংযোগ-বক্ষার্থে সেজন্য বদ্ধপবিকব। কিন্তু মুখের ভাবটুকু সকল সময়ের জন্য সরল নিঃস্বার্থ এবং যৌন জীবনে নিষ্পাপ, যেন এই মহৎ পৃথিবীতে অশ্লীল হবাব মতো কিছুই নেই। বিজন দেবনাথেব সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে বলল, আব কতদূর তোমাব বাতেব আস্তানা?

অথচ বিজন বাতেব আস্তানায় দব কবতে গিয়ে দেখল যুবতী সব সময়েব জন্য চোখ-দুটো কোটবাগত কবে বেখেছে। প্রতিদিনেব যৌন অত্যাচাবে গালে অশ্লীল টোল। নগ্ন চেহাবাতে যাদুকবেব লাঠিব মতো ভেঙ্কি। এবং সমস্ত শবীবে কিসেব যেন দাগ—যেন অত্যাচাবেব অশ্লীল উল্কি পবে নিত্য জাহাজী যন্ত্রণার সাক্ষী থেকেছে। পাশাপাশি দুটো চোখ—এলবিব চোখ এলবিব প্রীতিপূর্ণ চোখ···সে পাবল না। সে নগ্ন হযে নাচতে পাবল না বাতেব আস্তানায। মদেব গোলাপী নেশা ছুটে গেলে সে যথাসম্ভব সত্বব ছুটে পালাল।

সে জাহাজে ফিবে দেখল ডেক খালি। কোন জাহাজীব সাডাশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ডেকেব উপব কিছু ইতস্তত আলো জ্বলছে। একটা বেডাল এ-শীতেও অফিসাব-গ্যালীতে খাবাব খুঁজছে। বিডালটা শীতে কষ্ট পাচ্ছে এবং ক্ষুধার তাডনায় কাঁদছে। সে আবও এগিযে গেল। সে শুনল—ডেক-ভাণ্ডাবী মদ খেয়ে নীচে হল্লা করছে। নীচে নেমে দেখল সকল জাহাজীদের দবজা বন্ধ। যে দু-একজন জাহাজী এখনও ফেবেনি তাবা আব এ-বাতে ফিববে না। সে ধীরে ধীরে নিজেব দবজাব সামনে গিয়ে দাঁডাল। দেবনাথ আগে ফিরে এসেছে। ফোকসালের ভিতবে লকারের শব্দ। বুঝি দেবনাথ লকাব খুলছে। বুঝি দেবনাথ বাংকে বসে খাচ্ছে। বিজন দবজা খুলে ভিতরে ঢুকে বলল, আমি পারিনি, দেবনাথ—আমি পাবিনি। মেয়েটির শবীব দেখে আমাব করুণা হল।

এই করুণাব কথা ভেবে যখন সে ক্ষতবিক্ষত তখন দেবনাথ খেতে খেতে বলছে—এলবি এসে এই বাংকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবে গেছে তোমার জন্য।

—তুমি কি বললে?

—বললুম রাতের আস্তানায় গেছে।

—দেবনাথ! সে চীৎকার করে উঠল। ইচ্ছা হল দেবনাথের গলা টিপে ধরতে। বিজন লক্ষ্য করল, দেবনাথ দুজনের ভাত একাই গিলছে। ওর নেশা

এখনও প্রকট। সেজন্য দেবনাথের হাত কাঁপছে। এবং গোল গোল চোখে বিজনকে দেখছে।

—বললাম তুমি এলবিকে ঠকিয়েছ। তুমি রবীন্দ্রনাথের নামে 'পাখীসব করে রব' শুনিয়েছ। বললাম তুমি পূর্ববঙ্গের ছেলে, বললাম দেশ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসেছ। কোন এক কলোনীতে পিসিমার ঘরে থাক। তোমার বাড়ী বটতলায় নয়। সুতরাং বটতলা থেকে নিমতলা কাছেও নয়। আর কিছু বলল না দেবনাথ। ফের ভাত খাচ্ছে। অথবা বললে যেন এরকম শোনাত—বিজন, আমি ঈর্ষার তাড়নায় ভুগছি। তুমি এমন প্রীতিপূর্ণ চোখের স্নেহচ্ছায়ায় বন্দরের দিনগুলো কাটাবে, তুমি বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মতো বাঁচতে চাইবে, সে আমার সহ্য নয়। সে বলল, কবির প্রতীকী হয়ে তুমি এলবির কাছে বেঁচে আছ, আমি কোটরাগত চোখে জাহাজী হয়ে বেঁচে আছি, আমি ঈর্ষার তাড়নায় ভুগছি—আমি পারি নি, আমি পারি নি। ঈর্ষার তাড়নায় আমি একটু বেফাঁস হয়েছি।

বিজন বাংকে শুয়ে পড়ল। কোট প্যান্ট পরেই শুয়ে পড়ল। এ-মুহূর্তে সে আর কিছু ভাবতে পারছে না। সে এলবির কাছে ধরা পড়ে গিয়ে বাংকে শুয়ে আজ যথার্থ জাহাজী কায়দায় রাত যাপন করল।

সকালে জাহাজের কিছু কাজ—দেয়ালে রঙ করা, দেয়াল সাবান-জলে পরিষ্কার করা—সে সব কাজগুলো আজ নিখুঁতভাবে করল। সে ইচ্ছা করেই এলবিকে ভাবল না। সে ইচ্ছা করেই কাঁচা খিস্তি করল আজ। ভোরবেলায় দেবনাথ ওর পাশে সুস্থ হয়ে দাঁড়ালে, বলল, আমাকে ছোট করে কি লাভ হল, দেবনাথ?

দেবনাথ ওর দুটো হাত ধরে বলল, বিজন, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। গত রাতে আমার বড় ভুল হয়েছে। গতরাতে টাকার অভাবে আমার রাতের ইচ্ছাটুকু পূরণ হয় নি। বাধ্য হয়ে সস্তায় গলা পর্যন্ত মদ গিলে নেশা করেছি। মাতাল হয়ে জাহাজে ফিরেছি। ফিরে তোমার বাংকে এলবিকে দেখেই ধৈর্য ধরতে পারি নি। আমি ওকে টেনে তুলেছিলুম। এলবি বিরক্ত হয়ে তাকাতেই তোমাকে দুশমন ব'লে ভেবেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, বিজন। ব'লে দেবনাথ যথার্থই ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে ওর পাশে দাঁড়াল।

বিকেলে বিজন হাসপাতালে গেল। সেলিমের অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে। সেলিম ভালো হয়ে উঠছে। সেলিম ফের জাহাজের জাহাজী হয়ে একই সঙ্গে হয়ত ঘরে ফিরতে পারবে। এইসব ভাবনায় দেবনাথ এবং বিজন পথ চলছিল। দেবনাথ বলল, এলবির কাছে তোর একবার যাওয়া উচিত।

—কোন মুখে যাব, বল।

—আমার বড় ভুল হয়ে গেল, বিজন।

ওরা পরস্পর তাকাল। ওরা পরস্পর হাত ধরে হাসপাতালে উঠে গেল।

সিঁড়ি ধরে নামবার সময় ভাবল, এলবি যদি আসে, এই হাসপাতালে এলবি যদি ওর জন্য অপেক্ষা করে, যদি বলে—বিজন, তুমি কি যথার্থই রবীন্দ্রনাথের নামে 'পাখীসব করে রব' শুনিয়েছ, তুমি কি যথার্থই কবিকে নিয়ে তামাসা করেছ—তখন, তখন সে কী উত্তর দেবে! এইসব ভেবে বিজন, হাসপাতালে ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকল। এবং যখন দেখল সেলিমের বিছানার পাশে কেউ বসে নেই তখন সে এক অহেতুক আনন্দে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেল।

সেলিমের শরীরে এখনও রক্ত দেওয়া হচ্ছে। সেলিম এমত দুর্বল যে, কথা বলতে পারছে না। ওরা ওর পাশে বসল এবং বেঁচে থাকার জন্য উৎসাহিত করল।

বন্দরে বিজন এলবিকে এড়িয়ে বাঁচতে চাইল। সামনে পড়লেই ধরা পড়বে অথবা কলিন ষ্ট্রীট ধরে হাঁটলেই সাক্ষাতের সম্ভাবনা। সে সেজন্য জাহাজ থেকে কম নামল, বন্দর ধরে সহরে উঠল না এবং বড় বড় পথ ধরে পায়চারি করল না। সে শুধু বিকেলে হাসপাতালে গেল। এবং একদিন সেলিম বলল, সেলিম তখন ভালো হয়ে উঠছে, সেলিম তখন কথা বলতে পারছে—বলল, এলবি রোজ ভোরে আসেন।

জাহাজে সারাদিন কাজের পর যখন ক্লান্ত হয়ে বিজন রেলিঙে এসে ভর করে দাঁড়াত তখন ওর মনে পড়ত নটিংহিলের সেই ছোট্ট কাঠের ঘর, সেই ছোট অক্ষরে লেখা 'শান্তির নীড়', সেই ইজিচেয়ারটা এবং পাশের ভাঙা ঈজেলটার কথা। মনে পড়ত ওর কবিতা-আবৃত্তির কথা। এলবি 'গীতাঞ্জলি'র সব কবিতাগুলিই যেন ওকে বার বার শুনিয়েছে। সে যেন এখন এই রেলিঙে দাঁড়িয়ে সব কবিতা-গুলিই স্পষ্ট মনে করতে পারছে। ওর একান্ত ইচ্ছা—এলবি যদি আসত, যদি সে ওর সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করত, যদি বলত, তুমি কবিতার মতো না বেঁচে, জাহাজীর মতো বাঁচলে! অথচ সে এল না। একদিন গেল, দু'দিন গেল, দু'সপ্তাহ গেল, অথচ সে এল না। পাইন-গাছগুলো তখন পাতা মেলতে শুরু করেছে। পাখীরা সব আবার ফিরে এসেছে, গাছে গাছে তারা কোলাহল করছে। বসন্তের আগমনে এই ধরণী যেন উচ্ছল যুবার মতো অথবা গর্ভবতী তরুণীর মতো বয়সী হতে চাইছে। অথচ এলবির আর দেখা নেই।

বন্দরে যত দিন যেতে থাকল তত বিজন এলবির কাছে নিজেকে অপরাধী

সাব্যস্ত করল। ততগুলো ভেঙে পড়ল। তত সে নিঃসঙ্গবোধে পীড়িত হতে থাকল। জাহাজ ছেড়ে দেবে দু'দিন পর। সেলিম ভালো হয়ে উঠছে। যে সেতুবন্ধটি গড়ে উঠেছিল সেলিমকে কেন্দ্র ক'রে, সেলিম জাহাজে ফিরে এলে সেটুকুও শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু কোন এক ভোরে জাহাজে খবব এল—কাপ্তান হাসপাতালের সঙ্গে সংযোগ-রক্ষা কবছেন—ডেক-এ ফের উদ্বেগ উত্তেজনা, সারেঙ ব্রিজের নীচে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যান্য জাহাজীরাও ব্রিজের নীচে অপেক্ষা করছে—ওদের চোখে পরস্পরের প্রতি সংশয়ের দৃষ্টি, তখন কাপ্তান বলছেন ব্রিজ থেকে—সেলিম ডেড্—সেলিম মৃত।

বিকালে সব জাহাজীরা জাহাজ থেকে নেমে গেল। ঘন কুয়াশায় শীতের রঙ ক্যাকাশে। শীতের শেষে ওরা কোন তুষার-ঝড়েব মতো ভোরের রোদে ডুবে গেল, গলে গেল। ওবা হাসপাতালের দরজায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মৃত নাবিকের শরীর নিয়ে যাত্রার ইচ্ছায় উন্মুখ হয়ে থাকল। ওদের অবয়বের ইচ্ছা যেন এই—আমরা এই সন্ধ্যায় সকলে কববভূমিতে নেমে যাচ্ছি। আমরা নেমে যাচ্ছি, আমরা নেমে যাব। আমরা মরে যাচ্ছি, আমরা মরে যাব।

সহরবাসীরা নাবিকের শবযাত্রার পথে ভীড় করল। একদল বিদেশী লোক জাহাজী পোশাকে কোন নাবিকের মৃতদেহ নিয়ে সৈনিকের মতো পা ফেলে হাঁটছে। জানালায় যুবতী আর্শির আলোতে সেই শবযাত্রীদের দেখে মুখ ঘোরাল। কিছু স্বজাতীয় দেখল সেই শবানুগমন—এলবি কফিনের বাঁ পাশে পথ দেখিয়ে চলছে। মিঃ ট্রয় এবং কিছু জাহাজী শ্রমিক কফিনের আগে আগে চলছে। ভারতীয় নাবিকেরা পিছনে। বিজন সকলের পিছনে। ওরা নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করছে। ওরা সকলে সহর অতিক্রম করে ক্রমে পাহাড়ের উৎরাইয়ে নেমে গেল। ওরা সকলে আজ কোন কথা বলল না। কত নিঃসঙ্গ, কত নিঃশব্দ এই যাত্রা! ওরা পরস্পর অপরিচিতের মতো ব্যবহার করল যেন, অথবা এই শোকাবহ ঘটনায় ওরা পরস্পর সাময়িক বেদনায় আত্মনিষ্ঠ। এলবি পর্যন্ত কোন কথা বলে বিজনকে কিংবা অন্যান্য জাহাজীদের সমবেদনা জানাল না। এলবি চোখ তুলে বিজনকে দেখল না। অথবা না-দেখার ইচ্ছায় সর্বদা কফিনের আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। অথবা এলবির প্রত্যয় এমনভাবে ভেঙে গেছে যে, সে বিজনকে ফের উৎসাহ দিয়ে বলতে পারল না, সেলিম দেখবে ভালো হয়ে উঠবে।

কবরভূমির সদর দরজা দিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকে গেল। বিজন [illegible] সব-

বেদী দেখতে পেল। গীর্জাব মতো ছোট-বড় কবরের দেয়াল দেখতে পেল। অনেক সুখ-দুঃখেব এপিটাফ চোখে পডল। সেলিম কফিনে এখন শুয়ে আছে। সেলিমেব স্ত্রী এখন হয়ত দবজায় বসে মেয়েটাকে আদব কবছে। অথবা মেয়েকে খসমেব খবব দিয়ে সুখ পাচ্ছে। সেলিমেব কবর এখানেই হল। সে বিবিব কোলে মাথা বেখে মবতে পাবলনা। এইসব ভেবে বিজনেব অশেষ দুঃখ। তবু একবার এলবিকে বলাব ইচ্ছা—কিছু বলাব ইচ্ছা—শোকাবহ ঘটনাব কথা বলে ববীন্দ্রনাথকে স্মবণ কবাব ইচ্ছা—ওব সেই কবিতা-আবৃত্তিব ইচ্ছা—পিস্ ওয়াজ অন্ হিজ ফোব-হেড।

সেলিমেব কবরেব উপব প্রথম এলবিই মাটি দিল। সকলেব শেষে বিজন মাটি দিতে গিয়ে অসহায় মানুষেব মতো কেঁদে উঠল। এই মাটিটুকু দিযে সে আজ কত অসহায়, কত নিঃসঙ্গ এমত ভাব প্রকাশ কবল। এলবি পাশে গিযে দাঁডাল। বিজন শেষ মাটিটুকু কববেব উপব চাপডে চাপডে দিচ্ছে এবং কাঁদছে। সে যেন এই মাটির স্পর্শ ছেডে উঠতে পাবছেনা। উপবে আলো জ্বলছে। শীতেব কুযাশা আলোব ডুমটাকে অস্পষ্ট কবে বেখেছে। সকলে একে একে কবব ছেডে চলে যাচ্ছে। সকলেই যেন এই মৃত্যুতে দুঃসহ এক যাতনায পবস্পব কথা বলতে পারছে না। পরস্পব সান্ত্বনা দিতে পাবছে না। সকলেই মাথা নীচু করে পাহাড়েব ঢাল ধবে চডাইয়ে উঠে যাচ্ছে।

এলবি ডাকল, বিজন, ওঠো। সেলিমকে বহু চেষ্টায়ও বাঁচানো গেল না। মৃত্যুরই জয় হল। প্রভুকে ওব কথা বলো। ওব আত্মাব শান্তি কামনা করো।

এলবি বিজনকে টেনে তুলল। ওবা পবস্পব তাকাল। তাবপব হাত ধরে কববভূমি ফেলে পাহাডেব চডাই ভেঙে সমুদ্রেব ধাবে এসে বসল। এলবিই বিজনকে এই অসীম সমুদ্রেব আঁধাবে বসতে অনুবোধ কবল।

অন্য তীবে সব বড বড সমুদ্রগামী জাহাজ। ওবা এপাবে নির্জন জায়গায় বসে শোকটুকু ভুলতে চাইল। এলবি বিজনকে এই মৃত্যুশোক ভুলে যেতে অনুরোধ করল। এলবি ভিন্ন ভিন্ন বকমেব কথা বলে বিজনেব শেষ দুঃখটুকু মুছে দিতে চাইল—মুছে দেবাব ইচ্ছায় ওকে শেষ পর্যন্ত নটিংহিলেব ছোট কাঠের ঘরে নিয়ে এসে বলল, এ-ঘব তোমার। তুমি এখানে থেকে যাও। যেন আরও বলতে চাইল—তোমাব জাহাজী নিঃসঙ্গতাটুকু আমি, আমি—সব দিয়ে ভরে তুলব।

বিজন মনে মনে ভাবল—মূলত আমি নষ্টচরিত্রের মানুষ। ফলত তুমি

আমায় এ-ঘরে রেখে শান্তি পাবে না। বিশেষত কবির প্রতীকী হয়ে দীর্ঘদিন আমি বাঁচতে পারব না। আমার জাহাজী চরিত্র আমাকে সমুদ্রের মতো অশান্ত করে রেখেছে। বন্দরে বন্দরে চরিত্র নষ্ট করে বেড়াতে না পারলে আমার জাহাজী চরিত্রের শান্তি নেই।

বিজন বলল, আশা করেছিলাম তুমি একদিন অন্তত অভিযোগ করতেও জাহাজে আসবে।

এলবি বলল, ভোরে সেলিমকে দেখে, সারাদিন অফিসে কাজ করে বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত পার্কে তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি।

বস্তুত উভয়ে এক দুর্বিনীত অভিমানে পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠ হয়ে অভিযোগ করতে পারে নি। এলবি জলপাই গাছের নীচে বসে যত আশাহত হয়েছে তত এক ক্ষুব্ধ আক্রোশে ঘরে ফিরে মাতাল হওয়ার ইচ্ছায় জানালায় প্রজাপতি গুনেছে। যখন একান্ত উত্তেজনায় স্থির থাকতে পারেনি তখন রবীন্দ্রনাথের ছবির নীচে বসে একের পর এক কবিতা উচ্চারণ করে এক অশেষ আনন্দে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথবা ঈশ্বরের মতো ইচ্ছায় বিজনকে কবিতার মতো সুস্থ করে তোলার প্রবৃত্তিতে এলবি প্রতিদিন ছটফট করত। রবীন্দ্রনাথের নামে 'পাখীসব করে রব' এবং জাহাজীদের রাতের আস্তানা উভয়ই নষ্টচরিত্রের লক্ষণ জেনেও সে ঠিক থাকতে পারে নি। বিজনকে রমণীয় স্মৃতির অন্তরে বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণায় সে গর্ভবতী হতে চাইল।

এলবি বলল, তিনমাস ধরে তোমাকে পেয়ে কোন নাচঘরে যেতে ভুলে গেছি। তুমি এমত আমায় আপনার করে রেখেছ।

এলবি যেন মনে মনে বিজনকে অনুরোধ জানাল, বিজন, তুমি যদি নষ্টচরিত্রের মানুষ হতে চাও তবে আমায়ও নষ্টচরিত্রের করে রেখে যাও। আমি আর এমত ভাবে বাঁচতে পারছি না। দেয়ালে কবির ছবি, আমরা নীচে বসে এমত ভাবছি —আমরা পরস্পর প্রীতির সম্পর্কে বাঁচছি—তুমি আমার আরও ঘন হয়ে বসো, আমার এতদিনের যৌন আদর্শকে ভেঙে দাও ; তোমার হাতে আমি নষ্টচরিত্রের হয়ে বাঁচি। তোমার স্পর্শে কবির স্পর্শ এমত ভাব নিয়ে বাঁচি। এলবি কেবল বলল, তুমি থেকে যাও, বিজন। বাকিটুকু বলতে পারল না। বাকিটুকু এলবির চোখে ধরা পড়ল—এ পৃথিবীতে বিজন ব্যতীত এলবি নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায় দীর্ঘদিন ভুগবে। এ পৃথিবীতে ভারতবর্ষের এক রূপকথার মতো যুবকের ঘন গভীর প্রীতির সম্পর্ক এলবিকে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন করে রাখবে।

বিজন ইজি-চেয়ারে শুয়ে থাকল। সে কোন কথা বলল না। এলবি দাঁড়াল। ওর পাশে এসে দাঁড়াল। ঘন হয়ে দাঁড়াল এবং বিজনের শীর্ণ ঠোঁটে ধীরে ধীরে ছুঁয়ে চুমু খেল। বিজন এই ঘটনায় এতটুকু উত্তেজিত হল না, বরং সে কেমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হতে-হতে একসময় ইজি-চেয়ারের সঙ্গে যেন মিশে গেল। বস্তুত বিজন কবির প্রতীকীতে বাঁচতে গিয়ে মৃত্যুর মতো শিথিলতায় অথবা কবির প্রতি ঠাণ্ডা ঈর্ষায় এই ঘন চুম্বনে কোন যৌন সংযোগের উত্তেজনা পেল না। বরং সে এলবির প্রতি করুণাঘন হল। এলবির মাথায় হাত বুলিয়ে ঈশ্বরের মতো বলল, আবার যদি এ বন্দরে আসি, তোমার ঘরে আসব। জাহাজী মানুষের মতো আসব। বস্তুত বিজন নিজের সহজ সত্তায় এলবির ঘরে বাঁচবার ইচ্ছায় উঠে দাঁড়াল।

বিজন বলল, কাল ভোরে আমাদের জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। তুমি ভোরে যেও।

এলবি উত্তর দিতে পারল না। সে খাটে পড়ে বালিকাসুলভ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বিজন বুঝল এ-সময় কোন কথা বলে এই আশাহত বিদেশিনীকে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না। সে সেজন্য অনেকক্ষণ ওর পাশে বসে থাকল এবং ওকে কাঁদতে দিল।

অনেকক্ষণ পর যখন বিজন দেখছে এলবি আর কাঁদছে না, বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে, তখন ওর হাত ধরে টেনে তুলল এবং বলল, চল, জাহাজে তুমি আমায় পৌঁছে দেবে।

মোটরে বসে বিজন ভাবল—সেলিম এবং তুমি উভয়ে আমার আত্মার আত্মীয়। দুজনকেই আমি এ বন্দরে ফেলে যাচ্ছি। হয়ত পৃথিবীর অন্য কোন এক বন্দরে আমার জাহাজ ভিড়বে। সেখানে সেলিমের মতো কোন পাইনের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি তোমার জানালায় সেদিন আত্মার গভীরে যে অজ্ঞাত দুঃখের স্পর্শ টুকু পাবে—সে আমারই। তখন তুমি জানালায় বসে এই সমুদ্রকে দেখে কবির কবিতা আবৃত্তি কোরো। সে কবিতার ভিতর আমরা, এইসব মৃত নাবিকেরা ঈশ্বরকে খুঁজব।

বিজন বলল, এলবি, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো। এভাবে চুপচাপ মোটর চালালে আমার খুব কষ্ট হয়।

এলবি কথা বলার পরিবর্তে ধীরে ধীরে কবিতা আবৃত্তির সময় দেখল—এই

সহরের পথের সব আলোগুলো এখনও জেগে আছে। ইতস্তত দুটো-একটা মোটর ওদের অতিক্রম করে বের হয়ে যাচ্ছে। পথের মোড়ে মোড়ে পুলিশের বুটের শব্দ—পুলিশ টহল দিচ্ছে। দোকানের শো-কেসে আলো জ্বলছে না। এলবি এই ঘন রাতে বিজনকে কোন কথাই বলতে পারল না—সে ভেঙে পড়ছে। তাই ধীরে ধীরে শেষ প্রিয় কবিতাটি সে আবৃত্তি করে বিজনকে বিদায় জানালো—

"Art thou abroad on this stormy night
on thy journey of love, my friend ? The
sky groans like one in despair.

I have no sleep to-night. Ever and
again I open my door and look out on
the darkness, my friend !

I can see nothing before me. I
wonder where lies thy path !

By what dim shore of the ink-black
river, by what far edge of the frowning
forest, through what mazy depth of
gloom art thou threading thy course
to come to me, my friend ?"

তি ন

কাকাতিয়া দ্বীপ থেকে ফসফেট নিয়েছে জাহাজটা। জাহাজ আগামী দশদিন পাশাপাশি সব ওসানিক দ্বীপপুঞ্জ সকল অতিক্রম করে অনবরত জল ভাঙবে। দশদিন জাহাজীরা মাটি দেখতে পাবে না, তেরো মাস সফরে যেমন এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে গিয়েছে, সমুদ্রের নোনা জল ভেঙে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে, তেমনি এ-দশদিনও শুধু জলই দেখবে অথবা অসংখ্য নক্ষত্র এবং রাতের আঁধারে অন্য জাহাজের আলো।

তখন বিকেলের ঘন রোদের রঙ জেটিতে, ফসফেট-কারখানার প্রার্থনা-হলের গম্বুজে এবং দূরে, দূরে নারকেল গাছের ছায়াঘন চত্বরে অথবা শ্রমিকদের ভাঙা কুটিরে, আকাশ অথবা নীলের গভীরতায় মগ্ন। সমুদ্র জলের নীল অথবা সবুজ ঘন রঙের ছায়া সাহেবদের বাংলোগুলো উজ্জ্বল করে রেখেছে। কিছু কিছু শ্রমিক বিকেলের আনন্দ হিসাবে ছোট ছোট স্কীপ নিয়ে বঁড়শী নিয়ে সমুদ্রে ভেসে গেল। এবং তারা এই জাহাজের পাশ দিয়ে গেল, গলুইতে জাহাজীরা ভীড় করে আছে। যেখানে দ্বীপের পাথর সমুদ্রে বাতিঘরের মত, যেখানে ফার্ন জাতীয় গাছ সমুদ্রের হাওয়ায় নড়ছে, সেখানে দ্বীপের সব শিশুরা অযথা লাফাল, নাচল, গাইল। কখনও সমুদ্রের জলে নেমে স্নান করল অথবা সাঁতার কাটল। এইসব দৃশ্যের ভিতর জাহাজটা ছাড়বে। গলুইতে জাহাজীরা ভীড় করে থাকল। মাস্টে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর জাহাজ ছাড়ছে এমতভাবের কালো বর্ডার দেয়া নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রীজে কাপ্তান, বড় মালোম। গ্যাঙওয়েতে কোয়ার্টার-মাস্টার এখনও পাহারা দিচ্ছে। সিঁড়ি এখনও জেটি থেকে তোলা হয়নি, অথচ সকল কাজ শেষ। ডেক, ফল্কা সব জল মেরে সাফ করা হয়েছে। হ্যাচ, ত্রিপল এবং কাঠের সাহায্যে ডেকে দেওয়া হয়েছে। তবু মেজ মালোম সাড়েঙকে ডেকে গলুইতে চলে এলেন না, কিংবা ওয়ারপিন ড্রাম ঘুরিয়ে বললেন না—হাসিল হাপিজ। কাপ্তান

না, তোমরা জাহাজীরা এস, আমরা বন্দরের নোঙর তুলে সমুদ্রে পাল তুলি।

সমুদ্রের শান্ত নিবিড়তার ভিতর দ্বীপের পাহাড়, ঘর-বাড়ি, কারখানা এবং এইসব দ্বীপের পুরুষ-রমণীরা সকলে যেন রাজকন্যার মত জেগে সারা রাত ধরে, মাস ধরে এমন কি বৎসর, যুগ যুগ ধরে কোন এক রাজপুত্রের প্রতীক্ষাতে মগ্ন। সুপারী গাছ, নারকেল গাছ এবং উষ্ণদেশীয় সকল শ্রেণীর গাছ দ্বীপে দৃশ্যমান। সুমিত্র, জাহাজী সুমিত্র, সেজন্য বিকেলে প্রতি পথে ঘুরতে ঘুরতে কখনও এ অরণ্য-অঞ্চলে ঢুকে কাগজী লেবু সংগ্রহ কবত। দু পা এগিয়ে গেলে ওপাশে সমুদ্র, ধাবে ধারে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি। সুমিত্র প্রায়ই বালিয়াড়িতে চুপ হয়ে, বালুচরের সঙ্গে ঘন হয়ে এই দ্বীপের নিবিড়তায় মগ্ন থাকত। যেন সে দীর্ঘদিন পব নিজের দেশের মত দৃশ্যমান বস্তুসকলের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

প্রস্থে দৈর্ঘ্যে তিন গুণিত চার মাইল পরিমিত স্থানটুকু জুড়ে এই দ্বীপ। কিছু সমতল ভূমি, কিছু পাহাড়শ্রেণী। দ্বীপেব দক্ষিণ অঞ্চলে সাহেবদের বাংলোসকল, পার্ক, বিদ্যালয় এবং ক্লাব-ঘর। পশ্চিমটুকু জুড়ে শ্রমিকদের নিবাস। পাহাড়েব উপব যেখানে কৃত্রিম উইলোগাছের সংবক্ষিত অঞ্চল আছে, যেখানে মার্বেল পাথরের প্রাসাদ এবং দ্বীপসকলের প্রধান কর্তার অবস্থিতি—তার ঠিক নীচে সুপেয় জলের হ্রদ। পাথুরে সিঁড়ি নীচে বালিয়াড়িতে গিয়ে নেমেছে। ছোট নীল হ্রদ অতিক্রম করার স্পৃহাতে সুমিত্র কোনদিন সিঁড়ির নীচে বসে থাকত। এই উষ্ণতায় সমুদ্রের বুকে মাবেল পাথরের স্থাপত্যশিল্প সুমিত্রকে রূপকথার গল্প স্মরণ করিয়ে দিত। সেখানে একদা সুমিত্র এক যুবতীকে আবিষ্কার করল। যুবতী উইলোগাছের ছায়ায় হ্রদের তীরে বসে ভায়োলিন বাজাত।

সুমিত্র জাহাজ-রেলিঙে ভর করে গতকালের কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ কবতে পারছে। সে দীর্ঘ সময় সিঁড়িতে বসেছিল এই ভেবে—যুবতী হয়তো এই পথ ধরে অপরাহ্ণ বেলায় অন্য অনেকের মত সমুদ্রে নেমে আসবে। যুবতীর প্রিয়মুখ দর্শনে সে প্রীত হবে। কিন্তু দীর্ঘ উঁচু পাহাড়শ্রেণীর ফাঁক দিয়ে যুবতীর মুখ স্পষ্ট ছিল না। সুতরাং অন্য অনেকদিনের মত ভায়োলিনের সুরে মুগ্ধ হওয়া ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তর ছিল না। প্রতিদিনের প্রতীক্ষা তার কখনও সফল হল না। এবং সেই সব নিষিদ্ধ এলাকায় যেতে পারত না বলে সমুদ্রে যুবতীর প্রতিবিম্ব দেখে গল্পের ডালিমকুমার হয়ে বাঁচবার স্পৃহা জন্মাত। আহা, আমি ওর চোখে স্পষ্ট হলুম না গো! যখন জাহাজীরা শ্রমিকদের বস্তিতে পুরানো কাপড়ের বিনিময়ে যৌন-সংযোগটুকু [illegible], তখন সুমিত্র পাথরের আড়ালে বসে উদাস

হবার ভঙ্গীতে আকাশ দেখত।

সূর্য এখন সমুদ্রে ডুবছে। নীল সমুদ্রের লাল রঙ এখন পাহাড এবং পাহাডশ্রেণীব উপত্যকা সকলকে স্নিগ্ধ কবছে। ছোট ছোট ক্বীপগুলো ঘরে ফিরছে। ক্লাব-ঘবে ব্যাণ্ড বাজছে। জেটিতে অনেক মানুষেব ভীড। সুন্দবী বমণীরা, আব পাহাডেব সব বাসিন্দারা যুবতীকে জাহাজে তুলে দিল। সকল জাহাজীবা গলুইতে ভীড কবে থাকল। সেই যুবতী, চঞ্চল দুটো চোখে, গ্যাঙওয়ে ধরে উঠে আসছে। সন্ধ্যাব গাঢ লাল বঙ যুবতীকে সুমিত্রেব চোখে রহস্যময়ী কবে তুলছে।

এবাব সব ডেক-জাহাজীবা দুভাগ হয়ে আগিল পিছিল চলে গেল। উইন্‌চ হাডিয়া হাপিজ কবল হাসিল। ড্যাবিক নামানো হল। যুবতীব বাপকে দেখা গেল কাপ্তানের ঘবে। কিছু কিছু জেটিব লোক ডেকে উঠে এসেছিল। ওবা সিঁডি তোলাব আগে নেমে গেল। যুবতীব বাবা নেমে গেলেন। তাবপব জাহাজ ধীবে ধীরে তীব থেকে সবতে থাকল। রুমাল উডল অনেক জেটিতে, যুবতী কেবিনে ফিবে যাওযাব আগে সন্ধ্যাব গাঢ বঙেব গভীবতায ওই দ্বীপেব ছবি দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হযে গেল। এই তাব দেশ, এত সুন্দব এবং বমণীয়।

কেবিনে ঢুকে যুবতী টুপাতি চেবী দেখল কাপ্তান-বয় সব কিছু সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে। চেবী আয়নায় মুখ দেখল, তাবপর লকাব খুলে হাতেব পোশাক পবে বোট-ডেকে উঠে যাবার জন্য দবজা অতিক্রম করতেই মনে হল জাহাজটা দুলছে এবং মাথাটা কেমন গুলিয়ে উঠছে। চেবী আব উপবে উঠল না। সে দবজা ঠেলে ভিতবে ঢুকে গেল। নবম সাদা বিছানায় শরীবটা এলিয়ে দিয়ে পোর্টহোলেব কাঁচ খুলে দিল। চেরী এখন সমুদ্র এবং আকাশ দেখছে।

দরজায় খুব ধীবে ধীবে কডা-নাডার শব্দে চেবী প্রশ্ন কবল, কে?

—আমি কাপ্তান-বয়।

—এস।

—আপনাব খাবার—বলে সযত্নে টেবিল সাজাল।

চেবী বলল, এক পেয়ালা দুধ, দুটো আপেল।

—আব কিছু?

—না।

—আপনাব কষ্ট হচ্ছে মাদাম?

—না।

—উপরে উঠবেন না? বেশ জ্যোৎস্না রাত। বোট-ডেকে আপনার জন্য আসন ঠিক করা আছে।

—না, উপরে উঠব না। বয় চলে যাচ্ছিল, চেরী ডেকে বলল, শোন!

কাপ্তান বয় কাছে এলো। বলল, তুমি কাপ্তানকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

—জী, আচ্ছা। কাপ্তান-বয় দরজা টেনে চলে গেল।

তখন ফোকসালে ফোকসালে সকল জাহাজীরা চেরীকে কেন্দ্র করে মশগুল হচ্ছিল। সকলে ওর চোখমুখ দর্শনে সজীব। এবং চেরী যেন এই নিষ্ঠুর জাহাজে সকল জাহাজীদের নিঃসঙ্গ মনে সমুদ্রযাত্রাকে সুখী ঘরণীর ঘরকন্নার মতো করে রাখছে। আর এমন সময় ডেক-সারেঙ এলেন, এন্‌জিন-সারেঙ এলেন। তাঁরা দরজায় দরজায় উঁকি দিয়ে বললেন, তোমরা উপরে যাও, বোট-ডেকে মাস্তার দাও।

জাহাজীরা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠল সকলে। ওরা বোট-ডেকে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়াল। ডেক-সারেঙ ওদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা, বাপুরা, ওঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে যাবে না। কাপ্তানের বারণ আছে। জেনানা মানুষ, কাঁচা বয়েস—তার উপর আবার শুনছি রাজার মেয়ে এবং তিনি নাকি আমাদের কোম্পানীর একজন কর্তাব্যক্তি।

সুমিত্র হাসল। কী যে বলেন চাচা! উনি তো কাকাতিয়া দ্বীপের প্রেসিডেণ্টের মেয়ে।

সারেঙ বললেন, ওই হল। যে রাজা, সে-ই প্রেসিডেণ্ট।

এখন রাতের প্রথম প্রহর। অল্প জ্যোৎস্না সমুদ্রে এবং জাহাজ-ডেকে। জাহাজীরা গরম বলে সকলে ফোকসালে গিয়ে বসল না। ওরা ফল্কার ওপর বসে ভিন্ন রকমের সব কথাবার্তা বলল। দু-একজন জাহাজী অভদ্র রকমের ইঙ্গিত করতেও ছাড়ছে না। এ ধরণের কথাবার্তা শুনে অভ্যস্ত বলে সুমিত্র রাগ করল না। বরং হাসল। দীর্ঘদিনের সমুদ্রযাত্রা সুমিত্রকে বিরক্ত করছে।

সুমিত্র ভাবল—সেই মেয়ে—হ্রদের তীরে বসে বেহালা বাজাত, পাথরের আড়ালে বসে হ্রদে প্রতিবিম্ব দেখে যার রহস্য আবিষ্কারে সে ব্যস্ত থাকত, যার প্রতিবিম্ব সমুদ্রের কোন রাজপুত্রের ইচ্ছাকে সকরুণ করে রাখত, অথবা সেই প্রাসাদের ছায়া, ঘন বন, সমুদ্রের পাঁচিল এবং উঁচু পাথরের সব দৃশ্য সুমিত্রকে ঠাকুমার গল্প মনে পড়িয়ে দিত···যেন রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে ··যাচ্ছে···শুধু

পাতালপুরীতে ভোজ্যদ্রব্য, যেন প্রাসাদের পর প্রাসাদ, কোন জন-মনিষ্যির গন্ধ নেই, ফুলেরা, গাছেরা, পাখীরা এবং পতঙ্গসকল পাথর হয়ে আছে। হ্রদের তীরে খুব নীচু উপত্যকা থেকে সুমিত্র যতদিন চেরীকে দেখেছে, ততদিন পাতালপুরীর দৃশ্যসকল কাকাতিয়া দ্বীপের সকল দৃশ্যমান বস্তুসকলের উপর এক ক্লান্ত ইচ্ছার ঘর তৈরি করে চলে গেছে।

এখন জাহাজীরা সকলে বাংকে শুয়ে পড়েছে। সুমিত্রও দরজা বন্ধ করে কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল। সুমিত্র এই বাংকে শুয়ে পর্যন্ত চেরীর কথা ভাবছে— চেরী হয়ত শুয়ে পড়েছে। সিঁড়ি ধরে গ্যাঙওয়েতে যখন উঠে আসছিল চেরী, সুমিত্র তাকে স্পষ্টভাবে দেখেছিল। বড় বড় চোখ মেয়েটির—বাদামী রঙ শরীরে, চোখের রঙ ঘন গভীর এবং সমস্ত শরীরে প্রজাপতির মতন হাল্কা গড়ন যেন ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছার ঘর সবটুকু যত্ন দিয়ে তৈরি করেছেন।

জাহাজ এখন সমুদ্রে। তীর দেখা যাচ্ছে না, কোন দ্বীপ অথবা প্রবালবলয়। ভোরের সূর্য উঠেছে সমুদ্রে। সমুদ্রটাকে দু-ফাঁক করে সহসা যেন সূর্যটা আকাশে উঠে গেল। ডেক-জাহাজীরা এ সময় জাহাজে জল মারছে। এবং অন্য অনেক জাহাজী ইতস্তত রঙের টব নিয়ে মাস্টে, ড্যারিকে রঙ দেবার জন্য ফল্কায় ফল্কায় হাঁটছে। সুমিত্র ভোরে উঠে ওয়াচে যাবার আগে গ্যাঙওয়েতে চোখ তুলে দিল। চেরী সেখানে নেই। বোট-ডেক খালি। ব্রীজে ছোট মালোম দূরবীন চোখে লাগিয়ে দূরের আকাশ দেখছে।

সুমিত্র এন্‌জিন-রুমে নেমে যাবার আগে দুখানা ভাঙা চাঁদের মতো রুটি খেল, জল খেল। চা খেল। অন্যান্য অনেক জাহাজীর মতো প্রশ্ন করে জানতে চাইল, গত রাতে চেরী কেবিনে শুয়ে সারারাত ঘুমিয়েছিল, না, গরমে কেবিনের দরজা খুলে গভীর রাতে ডেকে বসে সমুদ্র এবং আকাশের নিরাময় ভাবটুকু লক্ষ্য করে শরীর নিরাময় করছিল।

সুমিত্র এন্‌জিন-রুমে নেমে যাওয়ার সময় দেখল ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস চুরি করে টুপাতি চেরীর পোর্টহোলে উঁকি দিচ্ছে। সুমিত্রেরও এমন একটা ইচ্ছা যে না হচ্ছে, তা নয়। তারও না-দেখি না-দেখি করে পোর্টহোলের কাঁচ অতিক্রম করে চেরীর অবয়ব দর্শনে খুশী হবার ইচ্ছা। কিন্তু পোর্টহোলের মুখোমুখি হতে কেমন যেন বিব্রত বোধ করল। সে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ধরে এন্‌জিন-রুমে নেমে কসপের ঘর থেকে তেল মেপে এন্‌জিনের পিস্টনগুলোতে এবং অন্যান্য অনেক যুক্তস্থানে তেল ঢালতে থাকল।

ওয়াচ শেষে যখন উপরে উঠবে তখন নিশ্চয়ই চেরী কেবিনে পড়ে থাকবে না, সমুদ্র এবং আকাশ দেখার জন্য নিশ্চয়ই বোট-ডেকে উঠে পায়চারী করবে—সে এমত চিন্তাও করল।

ওয়াচ শেষে অন্য পরীদারদের ডেকে দিল সুমিত্র। এন্‌জিন-রুম থেকে সোজা না উঠে, স্টোকহোলড্‌ দিয়ে ফানেলের গুঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল, প্রত্যাশা—চেরী এখন ব্রীজের ছায়ায় বোট-ডেকে হয়তো বসে আছে। সে ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে এই ইচ্ছায় যথার্থ ই বোট-ডেকে উঠে গেল। যখন দেখল ব্রীজের ছায়ায় চেরী অথবা ওর প্রতিবিম্ব কেউ বসে নেই, তখন সুমিত্র কেমন বিচিত্র এক অপমানবোধে পীড়িত হতে থাকল।

সুমিত্র স্নান করার সময় ভাণ্ডারীকে বলল, মানুষের কত রকমের যে শখ জাগে চাচা!

—বাতিজার হ্যান মনের দশা ক্যান?

—এই কিছু না। সুমিত্র মনে করতে পারল, এন্‌জিন-রুমে সে যতক্ষণ ছিল, সব সময়টা উপরে ওঠার জন্য মনটা ছটফট করেছে। যেন চেরীর সঙ্গে কি এক আত্মীয় সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ। সে মনে মনে এই বোধের জন্য না হেসে পারল না।

এ-ছাড়া সুমিত্র পর পর দুদিনের জন্য একবারও চেরীকে বোট-ডেকে অথবা গ্যাঙওয়েতে এমন কি ডাইনিং-হলেও দেখল না। যুবতী এই জাহাজে উঠেই নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। দশদিনের সমুদ্র-যাত্রা। দুদিনের নিঃসঙ্গতাকে এই অদৃশ্য যুবতী তীব্র তীক্ষ্ণ করে তুলছে—সকল জাহাজীরাই মনে মনে এমত ভাবছে। এ-দুদিন চেরী জাহাজ-ডেকে একবারও বের হল না। সুতরাং সুমিত্র যতবার এন্‌জিন-রুমে নেমেছে, ততবার চেরীর কেবিনের পাশে এসে একবার থেমেছে। সে পোর্টহোলে কাঁচ অতিক্রম করে চেরীর কেবিন প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করত। কিন্তু পোর্টহোলের ঘন কাঁচের ভিতর দিয়ে চেরীর কেবিন সব সময় অস্পষ্ট থাকছে। কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মেস-রুম-মেট অথবা মেস-রুম-বয় এদিকে আসছে না। বুড়ো কাপ্তান-বয় চেরীকে দেখাশোনা করছে। অফিসাররা পর্যন্ত জাহাজে চুপ মেরে গেছেন। যত জাহাজটা চলছে তত যেন নাবিকরা সব ঝিমিয়ে পড়ছে। চেরী দরজা খুলল না, ডেকে বের হল না, পায়চারি করল না। অফিসারসকল প্রতিদিন ডেক-চেয়ারে সাজগোজ করে বসে থাকলেন, অবসর সময় একটু আলাপ অথবা উদ্বিগ্ন হবার ভঙ্গীতে কৃত্রিম ইচ্ছা প্রকাশের জন্য। কখনও কখনও ছোট মালোম দরজা পর্যন্ত হেঁটে আসতেন। তারপর সমুদ্রের

নির্জনতা ভোগ করে একসময় কেবিনে ঢুকে সস্তা সব ক্যালেণ্ডারের ছবি দেখে ভয়ানক অশ্লীল আবেগে ভুগতেন।

সমুদ্রে নীল নোনা জল, আকাশে ইতস্তত নক্ষত্র জ্বলছে। খুব গরম পড়েছে —উষ্ণমণ্ডলের এই আবহাওয়া জাহাজীদের ফোকসালে বসতে দিচ্ছে না, ওরা শুতে পারছে না গরমে। ওরা উপরে উঠে ফল্কাতে মাদুর বিছিয়ে সেজন্য অধিক রাত পর্যন্ত তাস খেলছে। কেউ জাল বুনছে মাস্টের আলোতে। জাহাজটা চলছে, জ্যোৎস্না রাত। সমুদ্রে অকিঞ্চিৎকর তরঙ্গ এবং সহসা সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে এসে জাহাজীদের সুখ দিচ্ছে। এবং সহসা প্রপেলারটা অনবরত ঝিঁঝিঁ পোকার করুণ আর্তনাদের মত যেন কাঁদছে। একটা বিশেষ নিশ্চয় গতিতে জাহাজটা চলছে, দৃশ্যমান বস্তু বলতে এই নক্ষত্রের আকাশ এবং সমুদ্র। গরমে কাপ্তান ব্রীজে পায়চারি করছেন। দুটো একটা আলো দেখা যাচ্ছে সমুদ্রে। দ্বীপপুঞ্জের জেলেরা এখন হয়তো গভীর সমুদ্রে মাছ ধরছে।

সুমিত্র জাহাজীদের বলল, আচ্ছা ব্যাপার তো! দুদিনের ভেতর একবার যুবতীকে ডেকে দেখা গেল না! এ যে দেখছি চাচারা তোমাদের বিবিদের হার মানাচ্ছে!

ডেকের বড় ট্যাণ্ডল বলল, তোমাদের ভয়েই বার হচ্ছে না।

—আমরা খেয়ে ফেলব নাকি!

—বড় বাকি রাখবে না।

সুমিত্র দেখল তখন বুড়ো কাপ্তান-বয় এদিকেই আসছে। সে এসে ওদের পাশেই তাস খেলা দেখতে বসে গেল।

সুমিত্র বলল, রাজকন্যার খবর কি চাচা?

—আর বলবেন না দাদা। রাজকন্যাকে দেওয়ানীতে ধরছে। রাত থেকে মাথা তুলতেই পারছে না। শুধু বিছানায় পড়ে থাকছে।

—রাজকন্যা কিছু বলছে না তোমাকে?

—আমি বুড়োমানুষ, আমাকে কি বলবে দাদা!

অন্য জাহাজী প্রশ্ন করল—মাথা একেবারেই তুলতে পারছে না?

কাপ্তান-বয় বলল, পারছে। বিকেলে দেখেছি কেবিনেই পায়চারি করছে। মনে হয়, কালতক ডেকে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

জাহাজটা তখন তেমন দুলছে না। ওরা ফল্কার উপর বসে গল্প করছে। জ্যোৎস্নার আলোতে ওদের মুখ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। গ্যালীতে মাংস সিদ্ধ করছে

ভাণ্ডারী। উইণ্ডস্‌হোল ধরে নীচ থেকে জাহাজীদের কথা ভেসে আসছে। এবং সেখানেও চেরী-সংক্রান্ত কথাবার্তাতে ওরা নিজেদের কঠিন মেহনতের দুঃখকে ভুলতে চাইছে।

সুমিত্র সকল জাহাজীদের খবরটা দিল—কাল টুপাতি চেরী ডেকে বের হবে। পরদিন আটটা-বারোটার ওয়াচে সুমিত্র এন্‌জিন-রুমে নেমে কসপের ঘর থেকে তেল মেপে নিল। ক্যানে ভর্তি তেল সে এন্‌জিনের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দিচ্ছে। একটু নুয়ে মেসিনের ভিতর ঝুঁকে পড়ল। তারপর ক্যানের তেল উঠাল, নামাল এবং সে ঘুরে ঘুরে একই কাজের পুনরাবৃত্তি করছে···সে ক্যান উঠাল, নামাল। অন্য কোন দিকে তাকাতে পারছে না। সে যেন বুঝতে পারছে উপর থেকে সিঁড়ি ধরে কারা নামছে। সে চিফ-এন্‌জিনিয়ার এবং কাপ্তানের গলা শুনতে পাচ্ছে। সুতরাং এসময়ে কোন অন্যমনস্কতা রাখতে নেই। এ-সময়ে সে তেলয়ালা সুমিত্র। তাকে ক্রমশ উপরে উঠতে হবে। তাকে ছোট ট্যাণ্ডল থেকে বড় ট্যাণ্ডল হতে হবে। বড় মিস্ত্রীর চোখে যেন কোন অন্যমনস্কতা ধরা না পড়ে এবং সে যেন জীবনের ঋণ অনাদায়ে পরিশ্রমী তেলয়ালা সুমিত্র। সুতরাং সে ভীষণভাবে রড ধরে মেশিনের ভিতর ঝুঁকে কাজ করতে থাকল। থামের মতো সব মোটা পিস্টন রডগুলো উঠছে নামছে, ক্রাঙ্কওয়েভগুলো ঘুরছে অনবরত এবং এইসব ভয়ানক শব্দে উপরের কণ্ঠসকল ঢেকে যাচ্ছে। তবু সে এ-সময় কোন রমণীর কণ্ঠ শুনতে পেল এবং চোখ না তুলেই বুঝল বড় মিস্ত্রী আর কাপ্তান চেরীকে নিয়ে এন্‌জিন-রুমে নেমে আসছে। সিলিণ্ডারের পাশে দাঁড়িয়ে রেসিপ্রকেটিং এন্‌জিনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বড় মিস্ত্রী বিস্তারিত বলছেন।

সুমিত্র যেখানে কাজ করছে, সেটা এন্‌জিনের তৃতীয় স্তর। দ্বিতীয় স্তরে চেরী এবং কাপ্তান। চেরী এন্‌জিনটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুমিত্র একবার চেরীকে গোপনীয় ভাবে দেখে ফেলল। চেরী সিলিণ্ডার পরিদর্শন করে সিঁড়ি ধরে ক্রমশ নীচে নামছে। ওরা সুমিত্রের পাশ দিয়ে যথাক্রমে নীচে নেমে যাচ্ছে। সুমিত্র নিজের পোশাকের দিকে তাকাল—নীল কোর্তা ওকে মোল্লা মৌলভী বানিয়ে রেখেছে। চেরী নীচে নেমে যাচ্ছে। মেশিনের হাওয়ায় ওর চুলগুলো উড়ছে। গায়ে সাদা সিল্কের ফ্রককোট। পরনে নেভি ব্লু স্কার্ট। সুমিত্র নিজেকে আড়াল দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, বড় মিস্ত্রী এবং কাপ্তান চেরীকে এন্‌জিনের মতো দ্রষ্টব্য বস্তু হিসাবে সুমিত্রের দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছে—ওরা ইণ্ডিয়ান। কোম্পানী ওদের কলকাতা অথবা বোম্বাই বন্দর থেকে তুলে

নেয়। খুব কম পয়সায় ওরা বেশি কাজ দেয়।

বড় মিস্ত্রী অনেকটা পাদ্রীসুলভ ভঙ্গীতে বললেন, বেচারা!

সুমিত্র লজ্জায় মেশিনের ভিতব আরও ঝুঁকে পডল। চেরী ওর মুখ না দেখে এমত ইচ্ছা এখন সুমিত্রেব।

সুমিত্রের এখন যেন কত কাজ। সে ঘুরে ঘুরে এন্‌জিনের সকল স্থানে তেল দিল। চেরী হেঁটে যাচ্ছে, চেবী ফিরেও তাকাচ্ছে না, চেরী পোর্ট-সাইডের বয়লার ককেব সামনে দাঁড়াল। বড মিস্ত্রী বলল, এটা কনডেনসার। সার্কুলেটিং পাম্পের সাহায্যে ফেব বয়লাবে চলে যায়। ফের চেরী এবং বড মিস্ত্রী ওর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। ওরা গল্প করছে। সে তাকাল না। লজ্জায় সংকোচে সে টানেলের ভিতর ঢুকে গেল। কিন্তু চেরীব চোখদুটো বড গভীর এবং ঘন। সুমিত্র টানেলের মুখে এসে প্রপেলাব শ্যাফ্‌টের একপাশে দাঁড়িয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে চেরীকে আড়াল থেকে দেখতে থাকল। চেরী ওকে দেখতে পাচ্ছে না, ওর শরীরের বাদামী রঙ, হাল্কা পোশাক—প্রজাপতিব মতো যেন এন্‌জিনে ও উড়ে বেড়াচ্ছে।

চেরী ইভাপোরেটারেব পাশ দিযে যেতেই সেই গোপনীয চোখ দুটোকে আবিষ্কার করে ফেলল। চেরী দেখল দুটো ডাগর চোখ (ঠিক যেন ঠাকুমার গল্পের রাজপুত্রের মতো) রাক্ষসের দেশে চেরীকে দেখে দুঃখিত হচ্ছে। এই সব ভেবে একটু অন্যমনস্কতায় ভুগে যখন আবাব চোখ তুলল চেরী, তখন দেখতে পেল চোখ দুটো সেখানে নেই, অন্যত্র কোথাও সবে গেছে।

ভয়ে সুমিত্র এক পাশে সরে দাঁড়াল। সে তেল দিল ইতস্তত এবং কাপ্তানকে টুপাতি নালিশ দিলেও যেন বলতে পারে, না মাস্টার, আমি শুধু এন্‌জিনেই তেল দিচ্ছি। টুপাতি এসময় সামনে এসে দাঁড়াল। লজ্জায়, সংকোচে সুমিত্র চোখ তুলতে পারছে না। সে পেটের সঙ্গে অথবা এই সব যন্ত্রের সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছে। চেরী এখন সুমিত্রের কোঁকডানো চুল, শরীরের বাদামী রঙটা দেখছে; ঘাড়ের নরম মাংসগুলো দেখল। তারপর সিঁড়ি ধরে স্টিয়ারিং-এন্‌জিনে তেল দিতে যাবার সময় সুমিত্র শুনল টুপাতি যেন ওর সম্বন্ধে কি বলছে।

সুমিত্র ফোকসালে এসে কাপড় ছাডল—কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলল না। উপরে উঠে স্নান করল, কোন কথা বলল না। খেতে বসে চুপচাপ খেয়ে উঠল। অন্য তেলয়ালা বলল, কি হয়েছে রে? মুখটা খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

সুমিত্র উত্তর করল না।

অনেকে এমত প্রশ্ন করলেও সুমিত্র জবাব দিচ্ছে না। সে বাংকে বসে অযথা সিগারেট খেল, অযথা কতকগুলি ইংরাজী পত্রিকার সস্তা অশ্লীল ছবি দেখল এবং কোন দুঃসহ ভয়ে সে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। এন্‌জিনের ভিতর থেকে সেই চোখ দুটো যেন এখনও ওকে তাড়া করছে। বার বার মনে হচ্ছে চেরীর প্রতি চোখের এই স্পর্শকাতরতা সুখকর নয়। পোর্টহোলে সুমিত্রকে উঁকি দিতে দেখেছে এবং সেজন্য নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছে চেরী। কাপ্তানকে নালিশ দিয়েছে হয়ত।

আর বিকাল বেলাতেই বুড়ো কাপ্তান-বয় এল পিছিলে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। সুমিত্র বাংকে শুয়ে ছিল, ঘুম আসছে না। সেই চোখ কেবল ওকে অনুসরণ করছে। কাপ্তান-বয় সারেঙের ঘরে উঁকি দিয়ে বলল, সারেঙসাব, বাড়িয়ালার ঘরে সুমিত্রের ডাক পড়েছে।

সুমিত্র শুনল, কাপ্তান-বয় এইসব কথা বলে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। সে শুনল, সারেঙ সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে আসছে এবং ওর ঘরের ভিতরও সেই শব্দ। সুমিত্র ভয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল।

সারেঙ ডাকল, এই সুমিত্র ওঠ। বাড়িয়ালা তোকে ডাকছে।

সুমিত্র উঠে বসল, আমাকে যেতে হবে সারেঙসাব?

—কি করি বল? বাড়িয়ালা যে যেতেই বলল।

—আমি কিছুই করিনি সারেঙসাব। সুমিত্র অপরাধবোধে পীড়িত হতে থাকল। বার বার নামতে উঠতে পোর্টহোলে সহসা কখন ও চোখ রেখেছে এবং এক তীব্র কৌতূহল ওকে বার বার এই বৃত্তিতে প্রলুব্ধ করেছে।

সুমিত্র লকার খুলে সাদা জিনের প্যাণ্ট পরল, জ্যাকেট গায়ে দিল, তারপর পায়ে জুতো গলিয়ে সারেঙসাবকে বলল, চলুন! সে সিঁড়ি ধরে উঠবার সময় দৃঢ় হবার চেষ্টা করল। কেউ প্রশ্ন করলে না। কারণ, বাড়িয়ালা একমাত্র জাহাজীদের অপরাধের জন্য তাঁর ঘরে অথবা ডাইনিং-হলে ডেকে থাকেন। সুতরাং সকল জাহাজীরা সুমিত্রকে দেখল সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে। সুমিত্র যেন ওর অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন, সে সেজন্য চোখ তুলল না। সে এখন অন্য কোন জাহাজীকেই দেখছে না। জাহাজটা যে চলছে এ-বোধও এখন সুমিত্রের নেই। উষ্ণমণ্ডলের গরম কমে যাচ্ছে, বিকেল হতেই ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব ডেকে, সুমিত্র ডেক ধরে যাবার সময় তাও অনুভব করতে পারল না। সে সারেঙের সঙ্গে বোট-ডেক পার হয়ে ব্রীজে উঠে যাবার সিঁড়ি ধরে কাপ্তানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

ওরা এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। বুড়ো কাপ্তানের সংক্ষিপ্ত ছোট ছোট শব্দ। সারেঙ ঘরে ঢুকতে ইতস্তত করছে এবং কোন রকমে গলা সাফ করতেই কাপ্তান দরজা খুলে বের হলেন। তিনি ওদের দেখে বললেন, সারেঙ তুমি কেন? তোমাকে তো ডাকিনি!

—হুজুর, কাপ্তান-বয় যে বলল—

—আরে না না, সুমিত্র হলেই চলবে। আমাদের সম্মানীয়া যে যাত্রীটি যাচ্ছেন, তিনি একবার ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

এতক্ষণ সুমিত্র শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বাড়িয়ালার এইসব কথায় সে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করতে পারছে। সে বলল, মাস্টার, আমি যাব?

—তুমি একবার পাঁচ নম্বর কেবিনে যাবে। যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, তখন যেতেই হবে।

সুমিত্র ইচ্ছা করলে বোট-ডেক অতিক্রম করে টুইন-ডেকে নেমে অফিসার গ্যালী ডাইনে ফেলে পাঁচ নম্বর কেবিনের দরজায় হাজির হতে পারে, অথবা একোমোডেসান ল্যাডারেরই একটা অংশ ডাইনিং হলে নেমে গেছে—সেই সিঁড়ি ধরে নামলেও চেরীর দরজা। একটু ঘোরা পথ অথবা খুব কাছের পথ—কোন্‌টা ধরে যাবে ভাবছিল, ভাবছিল চেরীর সহসা এই ইচ্ছা কেন? পাথরের আড়াল থেকে চেরী ওকে নিশ্চয়ই দেখেনি, কারণ সেখানে সুমিত্রের অবয়ব স্পষ্ট ছিল না। সে অন্যমনস্কভাবেই হাঁটছিল। সে সিঁড়ি ধরে টুইন-ডেকে নেমে দেখল কমলা রঙের রোদ ডেকে, কিছু নীল তরঙ্গ জাহাজের চার পাশটায়। পিছিলে জাহাজীরা অনেকে নামাজ পড়ছে। সে নেমে আসার সময় তাদেরও দেখল।

ডেক-কসপ বলল, কি রে সুমিত্র এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? কাপ্তান তোকে কিছু বলেছে?

সুমিত্র কোন উত্তর না করে অ্যালওয়েতে ঢুকে দেখল কেবিনের দরজা বন্ধ। সে ধীরে ধীরে কড়া নাড়তে থাকল।

ভিতর থেকে কাপ্তান-বয় বলল, কে?

—আমি চাচা, সুমিত্র।

—ভিতরে এস। ভিতরে এস।

সে পা টিপে টিপে কেবিনে ঢুকল। সে দেখল, কাপ্তান-বয় লকার টিপয় এবং অন্য সব বাংকের বিছানা ঝেড়ে দিচ্ছে। চেরীর বাদামী রঙের ঘাড় আওু্রকলের

মতো রঙ ধরছে। চেরী ঘাড় গোঁজ করে বাক্সের ভিতর কি যেন খুঁজছে।

কাপ্তান-বয় বলল, সুমিত্র এসেছে মাদাম।

সুমিত্র দেখল সেই আঙুরফলের মতো ঘাড খুব সন্তর্পণে যেন নড়ছে। যেন বেশি চঞ্চল হতে নেই, উচ্ছল হতে নেই। সে দেখল সুমিত্রকে ঘাড় ঘুরিয়ে এবং যত ধীরে ঘাড় ঘুরিয়েছিল তার চেয়েও ধীরে ঘাড ফেরাল।—ওকে বসতে বলো।

সুমিত্র পাশের ছোট্ট ডেক-চেয়ারে বসল।

চেরী তখনও বাক্সেব ভিতর কি যেন খুঁজছে। সে বলল, বয়, তুমি যেতে পার।

সুমিত্র বাংলায় বলল, চাচা, আপনি চলে যাচ্ছেন!

—মেয়েমানুষকে এত ভয় দাদা, ফোকসালে তো খুব হৈ-চৈ করতে।

সুমিত্র জবাব দিতে পারল না। সে চুপ করে বসে থাকল। কাপ্তান-বয় দরজা বন্ধ করে চলে গেছে। সুমিত্র এসময় উঠল এবং দরজা কিঞ্চিৎ খুলে দিল। সে নীচে এন্‌জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে অথবা সুমিত্রের মুখে উষ্ণবলয়ের শেষ উত্তাপ-চিহ্ন ··সে চুপ কবে বসে পডল ফের। পোর্টহোলের কাঁচ খোলা, উপরে পাখা ঘুরছে এবং দরজা দিয়েও কিছু হাওয়া প্রবেশ করতে পারছে, তবু সুমিত্র ঘেমে নেয়ে উঠল। যত সে দৃঢ় হবার চেষ্টা করছে, তত যেন ওর মুখে আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণতার ছোপ লাগছে। তত সে অসহায় বোধ করল নিজেকে।

এতক্ষণ পরে চেরী মুখ ফেরাল। শরীরে হাল্কা-গাউন, ব্রেসীয়ার স্পষ্ট। চেরী দুহাঁটু ভাঁজ করে বাংকে বসল। সুমিত্রেব দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, পোর্টহোলে রোজ উঁকি মারতে কেন?

—আর উঁকি মারব না মাদাম।

—কেন উঁকি দিতে তাই বল।

—দীর্ঘদিন সফর করছি। দেশে জাহাজ ফিরছে না, কেবল জল আর জল।

—একটু বৈচিত্র্য চাইছ?

—আজ্ঞে···। সুমিত্র আর কিছু প্রকাশ করতে পারল না। ভয়ে এবং বিষণ্ণতায় আড়ষ্ট বোধ করতে থাকল। ওর পায়ে সুন্দর জুতা, নেলপালিশ নখে, সুগোল হাঁটু পর্যন্ত পা···সে নীচু করে রেখেছে মুখ, তবু ওর সব যেন দেখতে পাচ্ছে। গাউনের শেষ প্রান্তে লতার গুচ্ছ, পায়ের কোমল ত্বকে কেবিনের আলো···সে আর পারছে না, সে বলল, মাদাম, আর হবে না। আমাকে ক্ষমা করুন।

—তুমি তো ভারতবর্ষের লোক সুমিত্র ?

সুমিত্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, এবং চোখ তুলে এই প্রথম চেরীর চোখ তুটো খুব কাছাকাছি থেকে দেখল—এত উজ্জল, এত প্রাণবন্ত চোখ সে যেন এই প্রথম দেখল। শালীনতার তীব্র তীক্ষ্ণ ভাব চেরীকে, চেরীর চোখ তুটোকে কঠিন করে তুলেছে। সুমিত্র চেরীকে সহ্য করতে পারছে না। সে বলল, আমি তবে উঠি।

চেরী এবার অদ্ভুত রকমে হেসে উঠল—তুমি ভয়ানক ভীতু সুমিত্র। শুনেছি সম্রাট অশোক দিগ্‌বিজয়ে বের হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছেলে এবং মেয়েকে এই সব দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেই ভারতবর্ষের ছেলে তুমি !

সুমিত্র এবার একটু হাল্কা বোধ করল এবং ভাল করে কেবিনের চারপাশটা দেখে ফেলল। এতক্ষণ পরে সে ধরতে পারছে এই কেবিনে ফুলেল তেলের গন্ধ, বিদেশী দামী সেন্টে অথবা কোথাও ধূপ দীপ অনবরত জ্বলে জ্বলে চেরীকে, ওর পোশাককে রূপময় করেছে। বাংকের উপর ভায়োলিন। দেয়ালে সুন্দর ক্যালেণ্ডার। সমুদ্রে ঢেউ। বাইরে ঢেউ ভাঙার শব্দ। নীচে এন্‌জিন-ঘরের আওয়াজ এবং চেরীর চোখ তুটোতে দ্বীপপুঞ্জের কমলালেবুর গন্ধ। চোখ তুটো কমলালেবুর মতোই সজল।

চেরী কাপ্তান-বয়কে দিয়ে তু' কাপ কফি আনাল। চেরী ইচ্ছা করেই দূরত্ব ভেঙে দেবার চেষ্টাতে এক কাপ কফি খেতে অনুরোধ করল। সুমিত্র এরপর ভারতবর্ষের কোন রাজপুত্রের মতোই দৃঢ় হল এবং বলল, আপনি আমায় কেন ডেকেছেন মাদাম ?

সুমিত্রের দৃঢ়তাটুকু কেন জানি চেরীর ভাল লাগল না। যে মানুষটা কিছুক্ষণ আগেও এন্‌জিনে ঘাড় গুঁজে কাজ করছিল, যার গোপনীয় চোখ তুটো ভয়ে বিব্রত ছিল—সে সহসা এমত দৃঢ় ইচ্ছায় প্রকট হবে, অথচ চোখে কোন করুণার চিহ্ন থাকবে না, অবাধ্য যুবকের মুখভঙ্গীতে বসে থাকবে · চেরী এমত ভাব সহ্য করতে পারছে না। সে ফের প্রশ্ন করল, পোর্টহোলে উঁকি দিয়ে কি দেখার চেষ্টা করতে বল।

—মাদাম, আমার সম্বন্ধে আপনি খুব বেশি ভাবছেন !

—একবার নয়, তুবার নয়, অনেকবার পোর্টহোলে উঁকি দিয়েছ তুমি। ভেবেছ, পোর্টহোলের কাঁচ মোটা বলে আমি কিছু দেখতে পাইনি ? সি-সিকনেসে

ভুগছিলাম, নতুবা কাপ্তানকে দিয়ে তক্ষুণি ডেকে পাঠাতাম।

সুমিত্র মাথা নীচু করে আগের মতো বসে থাকল।

—পরে জেনেছি তুমি ইণ্ডিয়ান, সুমিত্র। টুপাতি একটা বালিশ টেনে কোলেব উপর চেপে বলল, কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে, খেয়ে নাও।

সুমিত্র ভয়ে ভয়ে কফিতে চুমুক দিল। খুব আদর-যত্নে এই মেয়েটি প্রতি-পালিত—সে তাও ধরতে পারছে। সে একবার ভাবল, কাপ্তানকে বলে দেয়নি তো, সুমিত্র কেমন শুকনো মুখে কফি গিলতে থাকল। বলল, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এই পথ ধরেই আব এন্‌জিন-রুমে আসব না। আপনি দয়া করে কাপ্তানকে শুধু কিছু বলবেন না। আমি সব করব। আপনি যা বলবেন সব করব। সে কেমন আড়ষ্ট গলায় এই সব বলে দরজা খুলে বের হয়ে গেল। কারো দিকে তাকাল না। সোজা ফোকসালে গিয়ে বাংকে শুয়ে ভয়ঙ্কব অপমানবোধে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকল।

চেরী বাংকেই চুপ করে বসে থাকল। সুমিত্রের পায়ের শব্দও একসময় মিলিয়ে গেছে। পোর্টহোলের কাঁচে এখন আব কোন প্রতিবিম্ব ভাসছে না। এতক্ষণ এই কেবিনে সুমিত্রের চোখ মৃত এবং সাদা ছিল, এতক্ষণ চোখ দুটোতে যেন নিঃসঙ্গ ভূতের আতঙ্ক—এইসব ভেবে চেবী নিজের উপরই বিরূপ হতে থাকল। সে সুমিত্রকে কোন কৌশলেই যেন আয়ত্ত করতে পাবছে না। অথচ দুদিনের দেওয়ানী চেরীকে যখন এই কেবিনে মৃত্যুর মত শক্ত করে রেখেছিল, তখন পোর্টহোলের কাঁচে কোন এক যুবকের চঞ্চল চোখ—জীবনেব প্রতীক যেন…যেন দর্পণ—তাকে নিয়ত রাজপুত্রের মত করে রেখেছে। ঠাকুমার গল্পের স্মৃতি এই কেবিনে কোন এক যুবকের শরীরে রূপ পাচ্ছিল—রাজপুত্র, কোটালপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে, এক রাজ্য আক্রমণ করে অন্য রাজ্যে, কত গাছ, কত পাখ-পাখালী, কত বন-বাদাড় অতিক্রম করে যাচ্ছে—আহা, ভারতবর্ষের রাজপুত্রেরা ঘোড়ায় চড়ে একদা রাজকন্যা খুঁজতে বের হত, গল্পে রাজপুত্রের চোখ যেমত এই বয়স পযন্ত অনুসরণ করেছে চেরীকে—এই কেবিনে সেই চোখ, সেই মন এতক্ষণ ক্লান্ত ঘোড়ার মত পা ঠুকে ঠুকে নিঃশেষ হয়ে গেল। চেরী উচ্চারণ করল—বেচারা!

বস্তুত টুপাতি চেরী শৈশবের রূপকথার রাজপুত্রের চোখকেই যেন পোর্টহোলে প্রত্যক্ষ করেছিল। দেওয়ানীতে মাথা তুলতে পারছে না, শরীরে ভয়ানক যন্ত্রণা এবং সারাদিন বাংকে পড়ে থাকা, সারাদিনের ভিতর পোর্টহোলের ঘন কাঁচে সুমিত্রের চোখ দুটোই এক অসামান্য রূপকথার রাজত্ব, সুখ এবং আনন্দ এই

দেয়ালে পৌঁছে দিয়ে গেছে। ঠাকুমার কোলে শুয়ে যে রাজপুত্রের গল্প শুনতে শুনতে চেরী ঘুমিয়ে পড়ত, যে রাজপুত্রের চোখ দুটো জীবনের এতদিন পর্যন্ত অনুসরণ করে আসছে, পোর্টহোলে সহসা সেই চোখ দুটোকে যেন আবিষ্কার করেছে চেরী এবং প্রত্যক্ষ করেছে।

রাত্রিবেলায় সুমিত্র ওয়াচে নামার সময় অন্যপথ ধরে গেল।

ওয়াচ থেকে উঠে আসবার সময় কসপ বলল, কাল রাজকন্যা তোমাকে কি বলল সুমিত্র ?

সুমিত্র জবাব দিল, আমার দেশ কোথায়, কি নাম—এইসব নানারকমের কথা। সব মনে নেই।

—সাহেবদের ফেলে তোমার দিকে এমন নজর !

—কি করি ! রাজকন্যার মর্জি বোঝা দায়।

বিকেল বেলায় সুমিত্র দেখল চেরী ছোট ডেকে বসে আছে। কাঁটা দিয়ে উল বুনছে। পাশে ছোট মালোম বসে—নিশ্চয়ই গল্প করছেন। ডেক-অ্যাপ্রেন্টিসরাও সেখানে আছে। বেশ গুলজার বলতে হবে। সে পিছিলের ছাদের নীচ থেকে সব দেখল। রঙিন কাগজের মত মখমলের পোশাক চেরীর সমস্ত শরীরে জড়ানো। পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত গাউনের শেষ প্রান্ত ঝুলছে। চুলের গুচ্ছ বুফা কায়দায় জড়ানো। ঘাড়ের মসৃণ ত্বক, কমলা রঙের রোদ, চুলের সোনালীগুচ্ছ এই সমুদ্রের নীল নির্জনতাকে ভেঙে দিচ্ছে। সুমিত্র গ্যালীতে ঢুকে, গ্যালীর জানালা দিয়ে প্রায় গোপনীয় ভাবেই চেরীকে দেখতে থাকল। অন্যান্য জাহাজীরাও সেখানে এসে ভীড় করছে। ওর এই ভীড় ভাল লাগছে না। ওর মনে হল ফের জাহাজী নিঃসঙ্গতা ওকে জড়িয়ে ধরছে। এই মনোরম বিকেল, কমলা-রঙের রোদ এবং ছোট মালোমের উপস্থিতি কেন জানি তাকে কেবল পীড়া দিচ্ছে। সে গ্যালী থেকে বের হয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে-ফোকসালে ঢুকে বাংকে শুয়ে পড়ল। এক অহেতুক ঈর্ষার জন্ম হচ্ছে মনে। সে বাংকে শুয়ে চেরীর অসামান্য রূপে দগ্ধ হতে থাকল।

কাপ্তান-বয় ছুটতে ছুটতে এসে বলল, সুমিত্র, আবার যে ডাক পড়েছে পাঁচ নম্বর কেবিনে।

সুমিত্র বলল, কেন, চেরী তো বোট-ডেকে বসে আছে দেখে এলাম।

—এখন আর নেই। কেবিনে ঢুকেই বলছে, সুমিত্রকে আসতে বল।

—কি ফ্যাসাদে পড়া গেল চাচা !

—কোন ফ্যাসাদ নেই। আল্লাতায়লা ঠিক রক্ষা করবে। খুশী হয়ে চলে যাও।

কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে সুমিত্র প্রথম অনুমতি নিল, পরে ঘরে ঢুকে ডান-দিকের বাংকে বসল। চেরী সুমিত্রের জন্য প্রতীক্ষা করছিল এমন ভাব চোখে-মুখে। সে-ও সুমিত্রের পাশে বসে পড়ল এবং বলল, জাহাজে কতদিন ধরে কাজ করছ?

—এই নিয়ে দু সফর।

—যাত্রী-জাহাজে কোনদিন চড়নি?

—না মাদাম।

—তাই তুমি জানতে না অন্যের কেবিনে কখনও উঁকি দিতে নেই।

—পোর্টহোল দিয়ে কেবিন অস্পষ্ট বলে আমিও আপনার কাছে অস্পষ্ট—এই ভেবেছি। আপনি ঘরের অন্ধকারে পড়ে থাকতেন, আমি বাইরের আলোতে থাকতাম। সে কথাটা তখন আমার কিন্তু একবারও মনে হয়নি।

—তবে বল আমাকে দেখার জন্য চুরি করে উঁকি দিতে?

সুমিত্র মাথা নীচু করে রাখল আগের মত।

—হুঁ এ-তো ভাল কথা নয়, সুমিত্র।

সুমিত্র মাথা তুলছে না। সুমিত্রের চোখে-মুখে ফের অপরাধবোধ জেগে উঠছে।

—এইসব জাহাজে তোমার কাজ করতে ভাল লাগে?

—না মাদাম। কাজ করতে ভাল লাগে না।

—তোমার দেশ ভারতবর্ষ, কত বিরাট আর কত অসামান্য দেশ!

—আজ্ঞে, মাদাম?

—ঠাকুমার কাছে তোমার দেশের রাজপুত্রদের গল্প শুনেছি। সমুদ্রের ধারে ঠাকুমা আমাদের তোমার দেশের রূপকথার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন। এইসব কথা বলে চেরী উত্তেজিত হল অথবা কেমন উত্তেজিত দেখাল চেরীকে। চেরী বলল, চিফ-এনজিনিয়ারের কথায় তোমার কিন্তু প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।

—কোন কথায় মাদাম?

—তোমাদের সস্তায় নেয়া হয়। যেন অনেকটা গরু-ভেড়ার মত ভাব।

—ওঁরা তো ঠিকই বলেছেন মাদাম। আমরা তাঁদের কাছে—

—এইসব লোকদের আমি ঘৃণা করি।

সুমিত্র এবার কথা বলল না। সব কিছুই রহস্যময় মনে হচ্ছে। চেরীর সকল কথাই কেমন অসংলগ্ন। সুমিত্র বুঝল না চেরী যথার্থ কাকে ঘৃণা করছে। সুতরাং সে ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থাকল এবং চেরীর অসামান্য রূপে বিহ্বল হতে থাকল।

—আমি কাপ্তানকে ধমক দিতে পারতাম। কিন্তু দিইনি। এতে তোমাদের আরও বেশী অপমান করা হবে। একটু থেমে চেরী ফের বলতে থাকল, কাপ্তান এবং চিফ-এন্‌জিনিয়ার আমাকে এন্‌জিন রুমের সব কিছু দেখালেন। তোমাদের দেখালেন, যেন তোমাদের বাদ দিনে এন্‌জিন রুমের একটা এন্‌জিনকেই বাদ দেওয়া হল।

—মাদাম, আমরা নাবিক। এর চেয়ে বড় অস্তিত্বের কথা ভেবে আপনি অযথা কষ্ট পাবেন না।

—তার চেয়ে বড় কথা তুমি ভারতবর্ষের ছেলে। বুদ্ধদেব, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ তোমার দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন।

—আপনি দেখছি ভারতবর্ষের প্রতি খুব অনুরক্ত।

—আমি একটি মহান জাতির প্রতি অনুরক্ত। এখন চেরীকে দেখে মনে হচ্ছে সে এই মুহূর্তে জাহাজে বিপ্লব শুরু করে দিতে পারে।

—আমি উঠি মাদাম। ওয়াচের সময় হতে বেশী দেরি নেই।

যেন চেরী শুনতে পেল না, যেন খুব অন্যমনস্ক। চেরী আবেগের সঙ্গে বলতে থাকল, সুমিত্র, আমিও ভারতবাসী। আমার পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষ থেকে বাণিজ্য করতে এসে এই সকল দ্বীপে থেকে গেল। আর ফিরল না। তোমাকে দেখে আমি তবে খুশী হব না, তোমার অপমানে আমি আমার অপমান ভাবব না?

সুমিত্র ফের স্মরণ করিয়ে দিল তার ওয়াচের সময় হয়ে গেছে। অথচ চেরী এতটুকু কর্ণপাত করছে না কথায়। এবং সেজন্য সুমিত্র চেরীর সকল কথার ভিতর নষ্ট চরিত্রের লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছে। এই বিষণ্ণ আলাপ সুমিত্রকে চেরী সম্বন্ধে আদৌ কোন কৌতূহলী করছে না। সুমিত্র মৃত চোখ নিয়ে বসে থেকে সকল কিছুকে বিরক্তিকর ভেবে পোর্টহোলের কাঁচে ঠাণ্ডা হাওয়ার গন্ধ নিতে সহসা উঠে দাঁড়াল।

সুমিত্র চলে যাচ্ছে। দরজায় এক পা রেখে দেখল চেরী কথাবার্তায় এখন নরম এবং সহজ হয়ে উঠছে। চেরীর মুখ প্রসন্নতায় ভরা। যেন প্রগাঢ় স্নেহ এই জাহাজী মানুষটির জন্য সে লালন করছে। সুমিত্র নির্ভয়ে দরজা টেনে দিতে শুনল, চেরী ভিতর থেকে বলছে, ঠাকুমা আমাদের সকলকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। ভারতবর্ষের রাজপুত্রদের গল্প করতেন। ভয় অথবা বিষণ্ণতা এ-ক'দিন ধরে সুমিত্রকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, চেরীর শেষ আলাপ, প্রগাঢ় স্নেহবোধ সুমিত্রকে নূতন জীবন দান করছে। সে ডেকের উপর দিয়ে প্রায় ছুটে এল।

হাল্কা শিস্ দিল ফোকসালে নামার সময়।

চেরী বাংকে বসে থাকল। ভয়ানক নিঃসঙ্গ এই সমুদ্রযাত্রা—চেরী ঠাকুমার স্মৃতি মনে করল। সেই সব রাজপুত্রের ঘোড়াসকলকে মনে করল। অথবা রাক্ষসের প্রাণ রুপোর কৌটায় সোনার ভ্রমরে···যেন পা ছিঁড়ছে হাত ছিঁড়ছে—রাক্ষসটা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে···চেরী এই কেবিনে উঠে দাঁড়াল। অথবা নির্জন দ্বীপে রাজকন্যা নিদ্রিত, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে, ছুটছে···চেরী ঠাকুমাকে স্মরণ করতে পেরে এইসব ভাবল। সেইসব মনোরম বিকেলের কথা তার মনে হল। যেন সুমিত্রকে দেখেই সে তার কৈশোর-জীবনের কথা মনে করতে পারছে। বিকালের সমুদ্র পাহাড়ের ধারে, ছোট ছোট মাছেরা খেলছে। সমুদ্রের ধারে ওরা ছুটোছুটি করছে। নারকেল গাছের ছায়ায় ঠাকুমা ভারতবর্ষের দিকে মুখ করে বসে আছেন, যেন যথার্থই তিনি ভারতবর্ষকে, তাঁর পিতৃপুরুষের দেশকে, দেখছেন। তখন অ্যাণ্টনী নারকেল গাছ থেকে ডাব কেটে দিচ্ছে সকলকে। ওরা বালিয়াড়িতে ছুটে ছুটে ক্লান্ত। ওরা ডাবের জল খেতে খেতে ঠাকুমার পাশে বালুর উপর শুয়ে পড়ল। তখন সমুদ্রে সূর্য ডুবছে। নির্জন পাহাড়ী দ্বীপে কচ্ছপেরা ডিম পেড়ে গেল এবং ঠাকুমা তাঁর ঠাকুমার-মত-রূপকথার গল্প আরম্ভ করে চেরীর মুখ টিপে বলতেন, তোর জন্য ভারতবর্ষ থেকে এক টুকটুকে রাজপুত্র ধরে আনব। চেরীর সেই কৈশোর মন ঠাকুমার কথা যথার্থই বিশ্বাস ক'রে এক রঙীন স্বপ্নে ঠাকুমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ত।

চেরী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পোর্টহোলের কাঁচ খুলে দিল। পর্দা তুলে দিল, অথচ সেই চোখ দুটোকে আর খুঁজে পেল না। যতক্ষণ সুমিত্র এই বাংকে বসেছিল, যতক্ষণ গল্প হল পোর্টহোলের চঞ্চল চোখ দুটোর গোপনীয় ভাব সুমিত্রের চোখে-মুখে ফিরে এল না। কেমন নিষ্প্রভ, কেমন পাথরের মত চোখ নিয়ে এতক্ষণ ওর কেবিনে বসে থাকল সুমিত্র। সুতরাং সকল দুঃখকে ভুলে থাকবার জন্য পোর্টহোলের পাশে দাঁড়িয়ে ভায়োলিনটা বাজাতে থাকল চেরী। উপরে নীচে, সামনে পিছনে শুধু নিরবচ্ছিন্ন আকাশ, শুধু নীল সমুদ্র এবং মনে হল সমুদ্রে রূপকথার রাজপুত্রেরা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। এবং সেইসব দ্বীপপুঞ্জের অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকদের চেরী পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে দেখল ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্রে সুমিত্রের সমানে সমানে ছুটতে পারছেনা। জীবনের প্রথম লগ্নে ভারতবর্ষের এক সুপুরুষ যুবাকে, যুবার কোমল চোখ দুটোকে পরম অপার্থিব বস্তু ভেবে চেরী কমন প্রীত হতে থাকল। চেরী, সেই দীঘির (ঠাকুমার বর্ণিত রূপকথা) সিঁড়িতে

সুমিত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। যেন রাজপুত্র কোটালপুত্র নামছে, নামছে। মানিকের আলোয় দীঘির সিঁড়ি ধরে রাজকন্যার দেশে নামছে। নিঝুম পুরী, কোন শব্দ নেই। লোক নেই, প্রাণী নেই, পাখি নেই, নিঃশব্দ ভাব। সোনার গাছ। গাছে হীরা-পান্নার ফল। সোনার ঝরণা, সোনার পাখি। একই গাছের ডালে নাচ এবং গান। রাজপুত্র গান শুনতে শুনতে নাচ দেখতে দেখতে সদর দেউড়ি পার হয়ে সাত দরজা ডাইনে ফেলে অন্দরের চাবিকাঠিতে হাত বুলাল। এখানে ছোট নদী বইছে—সুবর্ণরেখা নদী। নদী ধরে পদ্ম ভাসছে—কখনও হীরা, কখনও মানিক্যের। এবং রাজপুত্র চন্দনকাঠের পালঙ্কে রাজকন্যাকে দেখল। এই সব গল্প শুনে টুপাতি চেরী বলত, আমরা কোনদিন ইণ্ডিয়ায় যাব না ঠাকুমা ?

ঠাকুমা বলতেন, বড় হলে যাবে। দেখবে তখন কত রাজপুত্র তোমাদের খুঁজতে বের হয়েছে।

চেরী যেন এই বয়স পর্যন্ত কোন রাজপুত্রকে অনুসন্ধান করে সহসা পোর্ট-হোলের কাঁচে তাকে আবিষ্কার করেছে।

ছোট বড় ঢেউ উঠছে সমুদ্রে। দূরে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডলফিনরা, ফ্লাইং-ফিশের ঝাঁক বর্শার মত ছুটে আসছে জাহাজের দিকে। দুটো-একটা দ্বীপ, দুটো একটা আগ্নেয়গিরি আকাশ লাল করছে। দ্বীপে ছোট ছোট পাখীরা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। জলে, লাল নীল হলুদ রঙের মাছ। তখন সূর্য উঠছে।

আবার বিকাল। সূর্য পাটে বসেছে। পোর্টহোলের ঘন কাঁচে কোন চোখ ধরা দিচ্ছে না। টুপাতি দেখল, সুমিত্র আর অ্যালওয়ে ধরে এন্‌জিনে নামছেনা। অথবা এন্‌জিন-রুম থেকে উঠে আসছে না। অভিমানে টুপাতির চোখে জল আসতে চাইল।

সেই বিকালে ছোট মালোম এসে বললেন, আসুন, আমরা একসঙ্গে চা খাই।

চেরী বলল, ক্ষমা করবেন মিস্টার। আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

পরদিন ডিনার-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেন করলেন কাপ্তান। বললেন, আজ আপনি আমাদের গেস্ট্‌। আমরা সকলে একসঙ্গে ডাইনিং-হলে খাব।

চেরী বলল, বেশ হবে।

বুড়ো কাপ্তান উঠলেন। চেরী ফের প্রশ্ন করল, আর ক'দিন বাদে বন্দর ধরবে ক্যাপ্টেন ?

তিনি কি হিসাব করে একটি তারিখের উল্লেখ করলেন এবং কাপ্তান কি ভেবে ফের বললেন, সন্ধ্যায় ডাইনিং-হলে একটু নাচ-গান হোক—এই আমার ইচ্ছা।

—বেশ হবে।

—আপনি অংশগ্রহণ করলে বাধিত থাকব।

—অংশগ্রহণ করব।

—ভারতীয় জাহাজীটি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করছে? কাপ্তান কথাপ্রসঙ্গে যেন এই কথাগুলো বললেন।

—কোথায় করছে! চেরী এই বলে বড় বড হাই তুলল।

—ছোঁড়া ভারী বেয়াদপ দেখছি!

—ভয়ানক। আবার হাই তুলল চেরী।

—দাঁড়ান, ঠিক ব্যবস্থা করছি।

—তা করুন। সে কেবল হাই তুলতে থাকল।

—এবার আমি আসি।

—আচ্ছা।

তখন ঘড়িতে সাতটা বাজল। আটটা-বারোটা ওয়াচের জাহাজীরা বোট-ডেকে উঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ওরা ফানেলের পাশ দিয়ে স্টোকহোলডে নেমে যাবে এমন সময়ে কাপ্তান-বয় ছুটে ছুটে এল। বলল, সুমিত্রকে বাড়িয়ালা তাঁর কেবিনে ডাকছে।

সুমিত্র এই ডাকে ভীত অথবা সন্ত্রস্ত নয়। চেরীর চোখে যে স্নেহ দেখেছিল, নিশ্চয়ই তা বেইমানী করতে পারে না। অন্য কোন কারণ অথবা সারেঙের কান-ভারী কথা—এমন সব ভেবে সে অ্যাকোমোডেশান ল্যাডার ধরে ব্রীজ অতিক্রম করে কাপ্তানের ঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা খোলা ছিল বলে কাপ্তান তাকে দেখতে পাচ্ছে। কাপ্তান যেন চার্ট-রুমে কোন মানচিত্র দেখছে এমন চোখে সুমিত্রকে দেখে দেখে এক সময় বলল, তুমি এই জাহাজে কোল-বয়ের চাকরী করতে?

—ইয়েস মাস্টার।

—আমি তোমাকে ফায়ারম্যান করেছি?

—ইয়েস স্যার।

—তারপর ইফাতুলা কার্ডিফে নেমে গেল বলে তুমি গ্রীজার হলে?

—ইয়েস স্যার।

—ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার! বেয়াদপ পাজি, ন্যাস্টি হেল্! কাপ্তান চিৎকার করতে থাকলেন।

সুমিত্র নীচের দিকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। সুমিত্র বুঝতে পারছে না। ওর বেয়াদপি কোথায় এবং কখন ঘটেছে। তবু স্বীকার করাই ভাল। নতুবা কাপ্তান এখনই লগ-বুক এনে খচ খচ করে হয়তো লিখবেন—সুমিত্র, অ্যান ইণ্ডিয়ান সেলর ডাজ নট ক্যারী আউট হিজ জব্। সে বলল, ইয়েস মাস্টার, আর কোনদিন বেয়াদপি হবে না।

—তাহলে কোনদিন বেয়াদপি করবে না বলছ?

—না মাস্টার কোনদিন করব না।

—ফের কোল-বয় হবার যদি ইচ্ছা না থাকে, চেরীকে যথাযথ সম্মান দেখাবে।

সুমিত্র ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর কাপ্তানের কথামত যখন ব্রীজ পার হয়ে সিঁড়ি ধরে বোট-ডেকে নেমে এল, যখন দেখল সকল জাহাজীরা নেমে যাচ্ছে স্টোকহোলডে, তখন উত্তেজনায় অধীর হতে হতে সে বাংলায় অশ্লীল সব কথাবার্তা বলল চেরীকে উদ্দেশ্য করে এবং এ-সময় একটু মদ খাবার শখ জাগল।

বিকেল বেলা, চেরীর ঘরে ডাক পড়তেই সুমিত্র তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। এক মুহূর্ত দেরী করল না, অথবা সাজ-গোজের জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াল না। সে অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখল—চেরী ভয়ানক ভাবে সাজগোজ করে বসে আছে। কোলের উপর ভায়োলিন। প্রসাধনের তীব্র তীক্ষ্ণভাব সুমিত্রকে সুচতুর যৌনবিলাসী হতে যেন বলছে। চেরীকে সে দেখল। মখমলের পোশাক দেখল এবং নগ্ন ভঙ্গীতে বসে ঠোঁটে বিদ্যুৎ খেলতে দেখল। চিবুকে ভাঁজ পড়েছে —পায়ের ভাঁজে ভাঁজে কেমন আড়ষ্ট ভঙ্গী।

সুমিত্র চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, কোন কথা বলল না।

—এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোস।

সুমিত্র কোথায় বসবে ঠিক করতে পারল না।

—ডেক-চেয়ারটাতে বোস সুমিত্র।

সুমিত্র খুব আড়ষ্টভঙ্গীতে বসল।

—অমন পুতুল-পুতুল ভাব কেন? কোন সজীবতা নেই চলাফেরাতে। কেবিনে ঢোকবার আগে পোর্টহোলের চোখদুটো কোথায় রেখে আস?

—আমাকে ক্ষমা করবেন মাদাম। সেই চোখদুটো কিছুতেই আর সংগ্রহ করতে পারছি না।

—কেন, কেন পারছ না?

—আজ্ঞে, কাপ্তান অযথা ধমকালেন।

চেরী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অযথা হো হো করে হেসে উঠল, আচ্ছা কাপ্তানের পাল্লায় পড়েছ!

—ইয়েস মাদাম। আপনি কিন্তু ও-কথা আবার কাপ্তানকে বলবেন না।

—কাপ্তানকে তুমিও কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারলে না?

সুমিত্র জিব কাটল।—তা হয় না মাদাম। আমাদের কাপ্তান খুব ভাল লোক। অন্য জাহাজের কাপ্তান ভারতীয় জাহাজীদের সঙ্গে সাধারণতঃ কোন কথাই বলেন না। সব সারেঙের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। অথচ আমাদের প্রিয় কাপ্তান সকল জাহাজীদের নাম জানেন। তাছাড়া নাম ধরে ডেকে ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করেন। আমি কিছু ইংরেজী জানি বলে তিনি খুব খুশী আমার উপর। এই জাহাজে কোল-বয় হয়ে উঠেছি, তাঁর দয়ায় এখন আমি গ্রাজার। জাহাজীদের এর চেয়ে বড় উন্নতি এত অল্প সময়ে নেই।

—তবে বলতে হয় কাপ্তান তোমাকে খুব ভালবাসেন?

—হ্যাঁ মাদাম।

—আমি ভায়োলিন বাজাই, কই কোনদিন তো বললে না আপনার বাজনা শুনতে ইচ্ছা হয়, ভাল লাগে।

কথার আকস্মিক পরিবর্তনে সুমিত্র ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, সাহসে কুলায় না মাদাম।

—সাহসে কুলায় না, না, ইচ্ছা হয় না?

সুমিত্র এবারও জিব কাটল। চোখে পোর্টহোলের প্রতিবিম্ব ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠেই ফের মিলিয়ে গেল। যদি অভয় দেন তো বলি।

সুমিত্র আবার ভাবল কোন বেয়াদপি করে ফেলছে না তো! সে বলল, না থাক মাদাম।

—কেন থাকবে? তুমি বল। অভয় দিচ্ছি।

—সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় আপনার বাজনা শুনেছি, দীঘির পারে উইলোগাছের ছায়ায় বসে রোজ বিকালে ভায়োলিন বাজাতেন।

—তুমি লুকিয়ে এত সব করতে?

—কিছু মনে করবেন না মাদাম। আমরা সেলার। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর বন্দরে এলেই একটু বৈচিত্র্য খুঁজি। কেউ মদ খায়···কেউ···। চুপ করে গেল সহসা। না থাক।

চেরী খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, ডাইনিং-হলে নাচ-গান হবে। তুমি এস।

সুমিত্র জবাব দিল, সে হয় না মাদাম। জাহাজীদের অত দূর যাবার সাধ্য নেই।

চেরী বলল, আমি কাপ্তানকে যদি অনুরোধ করি।

—মাদাম, আপনি জাহাজে আর চার-পাঁচ দিন আছেন। আপনি নেমে গেলে সকল জাহাজীরা, সকল অফিসাররা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে।

চেরী চুপ করে থাকল। অন্যমনস্কভাবেই ছড় চালাল ভায়োলিনের তারে। এই সুর সুমিত্রের সেই পরম অপার্থিব চোখদুটিকে যেন খুঁজছে।

ছোট মালোম এলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সেই শব্দে সুমিত্র উঠে দাঁড়াল। —আমি তবে আসি মাদাম।

—বোস। ছোট মালোমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যাচ্ছি। একটু দেরি হবে। চেরী এবার সুমিত্রকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি রোজ এই পথ ধরে নামবে সুমিত্র, কথা দাও।

—আপনি দুঃখ পাবেন মাদাম। আমার চোখদুটো ফের বেইমানী করতে পারে।

—না, কথা দাও।

—এই পথ ধরেই নামব। কথা দিলাম।

চেরী বসেছিল চুপচাপ। সুমিত্র চলে গেছে। ছোট মালোমও চলে গেছেন। সে ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজার দেরি নেই। সে বাংক থেকে নেমে জামা-কাপড় বদলালো। সে তার দামী ইভনিং-পোশাক পরে আয়নায় প্রতিবিম্ব ফেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। এ-সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ। চেরী প্রশ্ন করল, কে?

—আমি, ক্যাপ্টেন স্মিথ।

—হয়ে গেছে আমার। আমি যাচ্ছি। বলে চেরী ভায়োলিন হাতে বের হল। কাপ্তেনের সঙ্গে চলতে থাকল। ওরা ডাইনিং-হলের দিকে যাচ্ছে। যে সকল অফিসারদের, এন্‌জিনিয়ারদের ওয়াচ নেই, তারা পূর্বেই নির্দিষ্ট স্থানে বসে আছে। চেরী ঢুকলে সকলে উঠে সম্মান দেখাল চেরীকে। মালবাহী জাহাজের ছোট ডাইনিং-হল, অল্প পরিসরে কয়েকজন মাত্র পুরুষ। ঘরে নীল আলো। বাটলার, কাপ্তানের আদেশমত এই ছোট্ট ঘরটিকে বিচিত্র সব রঙীন কাগজে এবং ভিন্ন ভিন্ন রকমের চেয়ার-টেবিলের জেল্লায় জলুস বাড়াবার চেষ্টা করেছে। চেরী কেমন খুঁতখুঁত করতে থাকল।

কাপ্তান একটু ইতস্তত করে বলল, সমুদ্রের দিনগুলোতে কোন আনন্দ নেই মাদাম। সুতরাং স্বল্প আয়োজন থেকেই যতটা আনন্দ নিতে পারি।

—আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি কাপ্তান। সেটা আপনাকেও ভেবে দেখতে বলি।

—বলুন।

—এই ছোট্ট ঘরে না হয়ে খোলা ডেকে হলে ভালো হয় না?

কাপ্তান এবারও একটু ইতস্তত করল। আপনি সকল জাহাজীদের এ-আনন্দে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন?

—মন্দ কি! আমার কিন্তু মনে হয় সেই ভালো হবে। ডেকে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। সমুদ্রে ঢেউ নেই। এমন সুন্দর দিনে···।

—তাই হবে।

সুতরাং চার নম্বর এন্‌জিনিয়ার দৌড়ে গেল ডেকে। ডেকের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়, ড্যারিকে, মাস্টে সবুজ লাল-নীল আলো জ্বেলে দিল। সতরঞ্চ পেতে সকল জাহাজীদের বসতে বলা হল। তারপর কাপ্তান নিজেই বলতে থাকলেন, আমাদের মাননীয়া অতিথি মিস টুপাতি চেরীর সম্মানার্থে এই আনন্দের আয়োজন। আমাদের সমুদ্রের দিনগুলো ভয়ানক নিঃসঙ্গ। সুতরাং সকলেই আজ খোলা মনে আনন্দ করব। এবং এই সম্মানীয়া অতিথির প্রতি নিশ্চয়ই অশালীন হব না।

অফিসারদের জন্য কিছু চেয়ার, কাপ্তান একপাশে এবং তার ডাইনে রেলিঙের ধারে চেরী বসল। সমুদ্রে ঢেউ নেই বলে জাহাজ বিশেষ দুলছে না। একটু একটু শীত লাগছে। সকল জাহাজীরা চারপাশে বসে আছে। চেরী সহজ হয়ে দাঁড়াল, প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলল, আমরা আজ সকলে পরস্পরের বন্ধু। আসুন, আমরা আজ সকলে একসঙ্গে ঈশ্বরের প্রার্থনা করি। এই কথায় সকলে উঠে দাঁড়াল। ওরা প্রার্থনার ভঙ্গীতে আকাশ দেখতে থাকল।

তারপর ছোট মালোম চেরীর অনুমতি নিয়ে গান গাইলেন, লেট্‌স লভ মাই গার্লফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড কিস্‌ হার···।

মেজ মিস্ত্রি তাঁর ছোট্ট ক্যানারী পাখিটা খাঁচা-সহ টেবিলের উপর রাখলেন। শিষ দিয়ে পাখীটাকে নানারকমের অঙ্গভঙ্গীতে নাচলেন। সকলে হেসে গড়াগড়ি দিল।

কাপ্তান কীটসের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন সকলকে।

একটু বাদে এলেন জাহাজের মার্কিন সাব। মুখোশ পরে চারিধারে বিজ্ঞ

ব্যক্তির মত ঘুরে বেড়ালেন কিছুক্ষণ। হাতের লাঠিটা মাঝে মাঝে ঘোরাচ্ছেন, তিনি যেন কি খুঁজছেন, অথবা কি যেন তাঁর হারিয়ে গেছে। শেষে কাপ্তানের কাছে এসে বললেন, দিস্ ম্যান, মাই ফ্রেণ্ড, দিস ম্যান ইজ দি রুট অফ অল ইভ্ল্স্। সুতরাং আসুন ওকে খতম করে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে যাই। ব'লে তিনি তাঁর লাঠিটা কাপ্তানের মাথায় তুলে ফের নামিয়ে আনলেন, না, মারব না। নোবেল কমিটির শান্তি পুরস্কারটা আমার ভাগ্যে ফসকে যাক্— সে আমি চাই না। এবং দুঃখে দুটো বড় হ্যাঁচ্চ দেওয়া যাক্। তিনি বড় রকমের দুটো হ্যাঁচ্চ দিলেন। লাঠিটা আপনারা নিয়ে নিন, বলে ক্লাউনের কায়দায় লাঠিটা ছুঁড়ে মেরে ফের ধরে ফেললেন। এবারও সকলে না হেসে পারল না।

এন্‌জিন-রুমে যাদের ওয়াচ ছিল, তারা উপরে উঠে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে যাচ্ছে। সুমিত্র সকলের পিছনে বসে আছে। ব্রীজে ঘণ্টা বাজল। এখন সাতটা বাজে। সুতরাং আর আধঘণ্টা এখানে বসে থাকা যাবে। সুমিত্র উঠি-উঠি করছিল, এ সময় চেরী বলল, এবার সুমিত্র আমাদের একটু আনন্দ দিক।

কাপ্তান বললেন, সুমিত্র গান গাইবে।

—স্যার, আমাদের গান আপনাদের ভাল লাগবে না।

—না সুমিত্র, ঠিক কথা বলছ না। আমরা এখানে কেউ সঙ্গীতজ্ঞ নই। শুধু একটু আনন্দ—সে যেমন করে হোক। একটু আনন্দ, আনন্দ করো।

সুমিত্র একটি সাধারণ রকমের বাংলা গান গেয়ে সকলকে শোনাল।

এ-সময় ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস এল পায়ে খড়খড়ি লাগিয়ে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে অথবা শুয়ে বসে নাচল। এবং সবশেষে চেরী ওর দীর্ঘ দিনের অভ্যাসকে ভায়োলিনের তারে মূর্ত করে তুলে সকলকে আনন্দ দিল।

তারপর রাত নামছে, ডাইনিং-হলে কাঁটা-চামচের শব্দ। সেখানে বাটলার এবং অন্যান্য বয় সকল ছুটোছুটি করে পরিবেশন করল। সকলে মদ খেল অল্প-বিস্তর। চেরী মদ খেয়ে মাতাল হল আজ।

রাত দশটা বেজে গেছে। চেরী নেশাগ্রস্ত শরীরে কেবিনের ভিতর ডেক-চেয়ারে বসে আছে। সুমিত্র সকলের পিছনে চুপচাপ বসেছিল। উইংস থেকে একটি আলোর তির্যক এসে ওর চোখে পড়েছে। চেরী ক্ষণে ক্ষণে সুমিত্রকে দেখছিল। দুটি পরস্পর গোপনীয় দৃষ্টি ঘনিষ্ঠ হতে হতে এক সময় লজ্জায় আনত হল। চেয়ারে বসে চেরী সেই চোখদুটোর কথা ভেবে পোর্টহোলের কাঁচ খুলে দিল। পর্দা সরিয়ে দিল। ঘুম আসছে না। এ সময় সুমিত্রকে ডেকে পাঠালে হত।

—বয়, বয়! দরজায় পায়ের শব্দে চেরী উঠে গেল এবং দরজা খুলে দিল। শরীর টলছে।—বয়, আজ সুন্দর রাত। বয়, তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

—মাদাম, অনেক রাত হয়েছে। শুয়ে পড়ুন। গ্লাসে জল রেখে গেছি।

—বয়, তুমি জান আমি ভারতীয়?

—জী, না।

—জেনে রাখ আমি ভারতীয়। বড় দুঃখ বয়, আমরা আর সে-দেশে যেতে পারব না। বয়, একটা কথা বলব তোমাকে। কিন্তু সাবধান, কাউকে বলবে না।

—মাদাম, আপনার শরীর ভাল নেই। শুয়ে পড়ুন।

—বয়, সুমিত্র কিন্তু রাজপুত্র হতে পারত। ওর চোখ, মুখ, শরীর সব সুন্দর।

—মাদাম, সুমিত্র যে রাজার ঘরেরই ছেলে। ভাগ্যদোষে—

চেরী এবার কিছু বলল না। সে ধীরে ধীরে উঠে পোর্টহোলে মুখ রাখল।—তুমি যাও, বয়।

—মাদাম, দরজাটা বন্ধ করে দিন। কাপ্তান-বয় বের হয়ে যাবার সময় এ-কথাগুলো বলল।

চেরী পোর্টহোল থেকে যখন দেখল কাপ্তান-বয় ঘরে নেই—ওর পায়ের শব্দ অ্যালওয়েতে মিশে গেছে এবং যখন মনের উপর শুধু সুমিত্রই একমাত্র দৃশ্যমান বস্তু, তখন দরজা বন্ধ না করে নীচে এন্‌জিন-রুমে নেমে সুমিত্রের পাশে এসে দাঁড়ানোই ভালো। চেরী দরজা খুলে বাইরে বের হল। এন্‌জিন-রুমে নামার মুখেই দেখল সুমিত্র তেলের ক্যান নিয়ে উপরে উঠে আসছে।

—এই যে, মাদাম!

—সুমিত্র, তোমার ওয়াচ শেষ?

—না মাদাম, পিছিলে যাচ্ছি, স্টিয়ারিং-এন্‌জিনে তেল দিতে।

—রাত এখন কত?

—এগারোটা বেজে গেছে, মাদাম।

—জাহাজে আর কারা এখন জেগে থাকে সুমিত্র?

—অনেকে মাদাম। অনেকে। ব্রীজে ছোট মালোম, এন্‌জিন-রুমে তিন নম্বর মিস্ত্রি, স্টোকহোল্‌ডে চারজন ফায়ারম্যান, তিনজন কোল-বয়, কম্পাস ঘরে কোয়ার্টার-মাস্টার, ফরোয়ার্ড পিকে কোন ডেক-জাহাজী।

—তুমি এত কষ্ট করতে পার সুমিত্র!

—এখন তো কোন কষ্টই নেই মাদাম। যখন কোল-বয় অথবা ফায়ারম্যান ছিলাম সে কি কষ্ট!

—তুমি আমার ঘরে আসবে সুমিত্র?

—আপনার শরীর ভাল নেই মাদাম। আমি আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছি। কারণ চেরীর এই উচ্ছৃঙ্খল ভাবটুকু ভাল লাগছে না সুমিত্রের। সে চেরীর অন্য কোন অনুরোধ রাখল না। সে চেরীকে ধরে বলল, আসুন।

—কোথায় সুমিত্র?

—কেবিনে।

—আমার ভাল লাগছে না।

—ভাল না লাগলে তো চলবে না মাদাম।

—তুমি কেবিনে বসবে, বল?

—বসব।

—তোমার ফের ওয়াচ কটায়?

—ভোর আটটায়।

চেরী কেবিনের দিকে না গিয়ে ডেকের দিকে পা বাড়ালে সুমিত্র বলল, এ তো আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি। রাত দুপুরে জাহাজীরা দেখলে বলবে কি?

—কি বলবে সুমিত্র?

—কি আবার বলবে! আসুন। ধমকের সুরে কথাগুলি বলল সুমিত্র। তারপর জোর করে চেরীকে কেবিনে ঠেলে দিতেই সুমিত্র শুনতে পেল—চেরী বলছে ভাল হচ্ছেনা সুমিত্র। আমি মাতাল বলে কিছুই বুঝতে পারছিনা ভাবছ। কাল ঠিক কাপ্তানকে নালিশ দেব দেখো। আমার উপর জোর খাটালে ঈশ্বর সহ্য করবেন না।

ফের সুমিত্র নিজের অবস্থা বুঝে খানিক বিব্রত বোধ করছে। এমত ঘটনার কথা কাপ্তানকে বললে—তিনি নিশ্চয়ই খুশী হবেন না। অথবা মনে হল বৃদ্ধ কাপ্তানকে খবর দেওয়া যাক—চেরী ডেকের অলিগলিতে ঘুরতে চাইছে। চেরী মদ খেয়ে মাতাল এবং চেরীর এইসময় যৌনেচ্ছার বড় ভয়ানক সখ। কিন্তু দেখল যে রাত গভীর। ফরোয়ার্ড পিক থেকে ওয়াচ করে ডেকজাহাজী হামিদুল ফিরছে। ওয়াচের ঘণ্টা বাজছে ব্রীজে। সুতরাং বৃদ্ধ কাপ্তানকে এ-সময় ডেকে তোলা নিশ্চয়ই সুখকর হবেনা। বরং কাপ্তান বয়ের খোঁজে গেলে হয়, যথার্থ উপকার এসময় তবে হতে পারে। সে আরও কিছু ভাবছিল তখন চেরী ওর হাতটা পিছন থেকে খপ

করে ধরে ফেলল। বলল, দোহাই সুমিত্র আমকে একা ফেলে যেও না। ভয়ানক ভয় করছে।

সুমিত্র ছোটমালোমের কথা মনে করতে পারল।. প্রতিদিন ওয়াচের শেষে অথবা রাতের নিঃসঙ্গতায় ভুগে ভুগে এই দরজার ফাঁকে চোখ রাখার জন্য উপস্থিত। ছোট মালোম এই দরজায় হাত রেখে বলত, বোট ডেকে বড় সুন্দর রাত।

চেরী বলত, আমার শরীরটা যে ভাল যাচ্ছেনা থার্ড।

—আমরা এখন একটা নির্জন দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, মাদাম।

—সেটা আমার দ্বীপের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী সুন্দর হবে না থার্ড।

চেরী কতদিন এমন সব কথা বলে প্রাণখুলে হাসত।—তোমাদের থার্ড আচ্ছা বেহায়া, সুমিত্র। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় কেবিনে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দি। বেচারা! চেরী ভয়ানক টলছিল। সে এখন এক হাত বাংকে রেখে অন্য হাতে সুমিত্রের কলার চেপে বলছে, মাই প্রিন্স।

—মাদাম আপনি কি সব বলছেন!

—আমি ঠিক বলছি সুমিত্র। আমি ঠিক বলছি। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও সুমিত্র, নতুবা আমি জোরে জোরে চীৎকার করব। বলব, প্রিন্স প্রিন্স। একশবার বলব। সকলকে শুনিয়ে বলব। তুমি কি করবে? কি করতে পারছ?

ভয়ে সুমিত্র কাঠ হয়ে থাকল। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বলল, চুপ করুন মাদাম, চুপ করুন। আপনার ঈশ্বরের দোহাই।

সুমিত্র দেখল কেবিনের পোর্টহোল খোলা। ফরোয়ার্ড পিকে কোন জাহাজী যদি এখন এইসময় ওয়াচে যায়, চোখ তুলে দেখলে ওদের দুজনকে স্পষ্ট দেখতে পাবে। সে তাড়াতাড়ি পোর্টহোলের কাঁচ বন্ধ করতে গিয়ে দেখল—ক্যালেণ্ডারটা উড়ছে। সে সন্তর্পণে পোর্টহোল দিয়ে মুখ কিঞ্চিৎ বার করে যখন দেখল কেউ এ-পথে আসছে না, বারোটা চারটার পরীদাররা সব এনজিন-রুমে নেমে গেছে এবং শেষ ওয়াচের পরীদারদের চীৎকার স্টোকহোল্ড থেকে উঠে আসছে তখন দ্রুত পোর্টহোলের কাঁচ এবং লোহার প্লেট উভয়ই বন্ধ করে দিয়ে চেরীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল এবং বাংলায় বলল, বেশ্যা। তারপরের খিস্তী উচ্চারণ না করে মনে মনে হজম করে ফেলল। শেষে অভ্যস্ত ইংরাজীতে উচ্চারণ, মাদাম আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

—বোস সুমিত্র।

সুমিত্র পূর্বে এ-কেবিনে যে সংকোচ নিয়ে যে ভয় এবং মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে বসত আজও তেমন দুহাতের তালুতে মাথাটা রেখে কেমন অসহায় ভঙ্গীতে বসে থাকল। সে এ-মুহূর্তে কিছুই ভাবতে পারছে না। চারঘণ্টা ওয়াচের পর ক্লান্ত শরীরটাকে যখন ফোকসালে নিয়ে যাবে ভাবছিল, যখন স্নান সেরে শরীরের সকল ক্লান্তি, উত্তাপ দূর করবে ভাবছিল তখন চেরীর এই মাতাল ইচ্ছা ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের মত ক্রমশ ওকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

চেরী বলল, তুমি ইচ্ছা করলে স্নান সেরে নিতে পার সুমিত্র।

সুমিত্র যেহেতু একদা এইসব কেবিনের দেয়াল সাবানজল দিয়ে পরিষ্কার করেছে যেহেতু ওর সব জানা······সুমিত্র সুতরাং উত্তর করছে না।

চেরী বাংক থেকে উঠে ওর পাশে বসল। বলল, মাই প্রিন্স। বলে সুমিত্রের কপালে চুমু দেবার জন্য ঝুঁকে পড়লো। সুমিত্র উঠে দাঁড়াল এবং বলল, মাদাম আপনি পাগল।

চেরীর পা দুটো টলছে এবং চোখ দুটো তেমনি মায়াময়।

সুমিত্রের এই অপমানসূচক কথায় চোখ দুটো কেমন সজল হয়ে উঠল। নীচে এন্‌জিনের শব্দ। আরও নীচে সমুদ্র অতল থেকে যেন ফুঁসছে। চেরী বলল, আমি ভারতবর্ষে যাব সুমিত্র। তুমি নিয়ে চল। তুমি আমাকে ঘোড়ার পিছনে নিয়ে কেবল ছুটবে, ছুটবে—কোথাও পালিয়ে যাবে।

চেরীর সেই রাজপুত্রের কথা মনে হল। সেই রাজকন্যার কথা মনে হল। রাজকন্যা স্বয়ম্বর সভা অতিক্রম করে দূরে দূরে চলে যাচ্ছে। ঝাড় লণ্ঠন পরিত্যাগ করে আঁধারের আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে। মুক্তোর ঝালর—, দ্বারীরা হাঁকছে অথচ নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে প্রতিবিম্ব রাজপুত্রের। সকলের অলক্ষ্যে রাজপুত্র রাজকন্যার জন্য প্রতীক্ষা করছে। চেরীর এইসব কথা মনে হলে বলল, তুমি পার না সুমিত্র, তুমি আমাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে পার না!

সুমিত্রকে উদাস দেখে ফের বলল, পার না তুমি? আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না ভারতবর্ষে?

মাতাল রমণীকে খুশী করার জন্য সে বলল, নিয়ে যাব।

—তোমার দেশের গ্রাম মাঠ দেখব সুমিত্র।

সুমিত্র সহজভাবে কথা বলতে চাইল।—ফুল দেখবে না? পাখী দেখবে না?

—ফুল দেখব, পাখী দেখব।

—আমার দেশের আকাশ দেখবে না? আকাশ?

—আকাশ দেখব, নক্ষত্র দেখব।

—সাপ বাঘ দেখবে না? সাপ বাঘ? বিধবা বৌ, যুবতী নারী? এইসব বলতে বলতে সুমিত্র কেমন উত্তেজিত বোধ করছিল। সে মরিয়া হয়ে যেন বলে ফেলল, আমি সব দেখাতে পারি। কিন্তু দেখাব না। তুমি নেশায় টলছ। নিজের সম্বন্ধে সচেতন নও, সুতরাং সব দেখালে অন্যায় হবে।

প্রথমটায় চেরী ধরতে না পেরে বলল, কি বললে? চেরীর চোখ দুটো তার-পর সকল ঘটনার কথা বুঝতে পেরে ছোট হয়ে এল।—কাপুরুষ! চেরী সুমিত্রের মুখের কাছে এসে কেমন একটা থু শব্দ করে দরজার পাট সহসা খুলে দিলে। গেট আউট, ইউ গেট আউট! এমন চীৎকার সুরু করল যে সুমিত্র পালাতে পারলে বাঁচে। সুতরাং সুমিত্র ছুটতে থাকল। সে ডেক ধরে ছুটে এসে পিছিলে উঠে দেখল পরীদারেরা সকলে যে-যার মত ঘুমিয়ে পড়েছে। সে এইসব কথা গোপনে লালন করে দীর্ঘসময় ধরে মেয়েটির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দুঃখবোধ করল।

তখন চেরী পোর্টহোলের প্লেট খুলে দিল। কাঁচ খুলে দিল। সে শরীরটাকে বাংকে এলিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—এমন সময় দরজায় শব্দ, কড়া নাড়ছে কে যেন। ধীরে ধীরে এবং সন্তর্পণে। অথবা চোরের মত। সে বুঝতে পারছে—কারণ চট্ করে শরীরের মাতাল ভাবটা কেটে গেছে পোর্টহোলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় এবং নিজের বেলাল্লাপনার রেশটুকু ধরতে পেরে লজ্জিত, কুন্ঠিত। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দরজায় সামনে। বলল, কে?

—আমি মাদাম।

—আপনি কে?

—আমি থার্ড।

—আজ তো আকাশে নক্ষত্র নেই। আকাশে মেঘ দেখতে পাচ্ছি। এইসব কথার ভিতর চেরীর মাতাল মন ধীরে ধীরে যেন সুস্থ হচ্ছে। এতক্ষণ প্রায় সে সকল বস্তুকে দুটো অস্তিত্বে দেখছিল—দুটো ক্যালেণ্ডার, দুটো লকার, চারটা বাংক এবং এমনকি সুমিত্র পর্যন্ত দুটো অস্তিত্বে ওর পাশে বসেছিল। পোর্টহোলের ঠাণ্ডা হাওয়ার সব কিছুই মিলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে। যেন সবই এখন এক অখণ্ড বস্তু। তবু থার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, চলুন কাপ্তানের ঘরে। রাত দুপুরে কেমন জ্বালাতন করছেন টেরটি পাবেন।

—এতক্ষণ মাদাম, দয়া করে আপনার কেবিনে কে ছিলেন?

চেরী বিদ্রূপ করে বলল, কেন আপনি নিজে। তারপর দরজাটা মুখের উপর ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিয়ে বলল, লক্ষ্মী ছেলের মত ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

কিন্তু সুমিত্র নিজের বাংকে বেশীক্ষণ শুয়ে থাকতে পারল না। সুমিত্রের মনে পড়ল মাতাল রমণী যদি দরজা খুলে শুয়ে থাকে, যদি থার্ড সেই ফাঁকে বেড়ালের মত সন্তর্পণে ঢুকে পড়ে এবং চুরি করে চেটে চেটে মাংসের স্বাদ নিতে নিতে যদি··· ভাল নয়, ভাল নয় সব—এমত ভেবে সে ডেকের উপর উঠে এল। কাপ্তান-বয়ের দরজায় কড়া নেড়ে ডাকল, চাচা, অ চাচা একটু উঠুন।

বৃদ্ধ কাপ্তান-বয়ের সারাদিন পরিশ্রমের পর এই বিশ্রামটুকু একান্ত নিজস্ব। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সুতরাং দু এক ডাকে সাড়া পেল না সুমিত্র। সুমিত্র বার বার ধীরে ধীরে ডাকল, চাচা, অ চাচা। সে জোরে ডাকতে পারছে না কারণ পিছনে মেসরুম মেট্ এবং মেসরুম বয় থাকে। তারপর এন্‌জিনের স্কাইলাইট পার হলে ফানেল। ফানেল অতিক্রম করে অ্যাকোমোডেশান ল্যাডার, যা ধরে কাপ্তানের ঘরে উঠে যাওয়া যায়। জোরে ডাকাডাকি করলে বৃদ্ধ কাপ্তানের ঘুম পর্যন্ত ভেঙ্গে যেতে পারে। সুতরাং ধীরে ধীরে সে কড়া নাড়তে থাকল।

বৃদ্ধ কাপ্তান-বয় এক সময় দরজা খুললে বলল, চেরীর দরজা বন্ধ করে আসুন চাচা। মদ খেয়ে ভয়ানক মাতলামি করছে।

তাড়াতাড়ি কাপ্তান-বয় গায়ে উর্দি চাপিয়ে নীচে ছুটল। গিয়ে দেখল দরজা বন্ধ। কাজেই সে ধীরে ধীরে ঠেলে দেখল—দরজা খোলা এবং খুলে যাচ্ছে। চেরী বাংকের উপর বসে ক্যালেণ্ডারটা দেখছে নিবিষ্ট মনে। কাপ্তান-বয়ের কোন আওয়াজই চেরী যখন শুনতে পাচ্ছে না তখন দরজাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। কিন্তু কি ভেবে ঘরের ভিতর ঢুকল কাপ্তান-বয়। টিপয়ে খাবার জল রাখল, তারপর পিতৃত্বের ভঙ্গীতে বলে উঠল, মাদাম, শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়েছে! এখন প্রায় একটা বাজে।

চেরী বড় বড় হাই তুলছে। সে কম্বলটা নীচে ঠেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল। কাপ্তান-বয় দাঁড়িয়েছিল—চেরী কাত হয়ে শুয়ে ক্যালেণ্ডারটা দেখছে। ওর পোষাকের গাঢ় রঙের ভাঁজ এখন আর নেই। চোখে অবসাদের চিহ্ন। কেমন এক তন্দ্রাচ্ছন্নভাব ওর সমস্ত অবয়বে। কাপ্তান বয় কম্বলটা ওর শরীরের উপর বিছিয়ে দিয়ে বাইরে এল। দরজা টেনে সন্তর্পণে তালা মেরে দিল। ডেকে বের হয়ে দেখল ঠাণ্ডায় সুমিত্র তখনও পায়চারী করছে।

কাপ্তানবর কাছে এসে বলল, দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিলাম।
—যাক বাঁচা গেল। এইটুকু বলে সুমিত্র পিছিলের দিকে উঠে যেতে থাকল।

ভোরবেলায় জাহাজীরা সাবানজল নিয়ে কেবিনের দেয়াল ধুতে অথবা ফলকা বেঁধে নীচে নেমে অদৃশ্য হতে চাইছে। তখন চেরী বিছানায় উঠে বসল। দরজা বন্ধ দেখল। সে গতবাতের কিছু কিছু ঘটনাব কথা স্মবণ করতে পাবছে। সুমিত্র জাহাজী সুমিত্রের প্রতি চেবীব বলতে ইচ্ছা হল, গতরাতেব ঘটনার জন্য আমাকে ক্ষমা কর সুমিত্র। এই জাহাজ, সমুদ্রেব ভয়ানক নিঃসঙ্গতা এবং তোমার পাথরের মত শরীবের স্থিব অথবা অচঞ্চল উপস্থিতি আমাকে নিয়ত তীব্র তীক্ষ্ণ কবছে। আমাকে অস্থির, চঞ্চল করছে। অথচ তুমি কখনও পুতুলের মত শরীর নিয়ে, কখনও একান্ত বশংবদেব চিহ্ন শবীরে এঁকে আমার কেবিনে সময়, কাল অতিক্রম করার হেতু আমি ক্রমশ এক অস্থিব নিয়তির ইচ্ছায় কালক্ষয়ের বাসনায় মগ্ন। কৈশোরের স্বপ্ন তোমার অবয়বে কেবল রূপ পাচ্ছে। আমার প্রিয়তম দ্বীপে এমত ঘটনা ঘটলে কি হ'ত জানি না, 'আমার বাবা বর্তমান—তিনি আমাকে কি বলতেন জানি না এবং তোমার উপস্থিতি সহসা আমাকে অন্ধকারে নিদারুণ চঞ্চলতার জন্মদানে আমার সম্মানিত জীবনকে বিব্রত করে কেন জানিনা, তবু তুমি কখনও এই কেবিনে এসে দাঁড়ালে আমি অধোবদনে লজ্জিত থাকব। তারপর আয়নায় চেবী মুখ দেখে উচ্চারণ কবল—গতবাতে ঘটনার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো সুমিত্র।

রাতের বিড়ম্বনার জন্যই হোক অথবা অন্য কোন কারণে, সুমিত্র ভোর রাতের দিকে শরীরে ভীষণ ব্যথা অনুভব করতে থাকল। পাশের বাংকে অনাদি নাক-ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওব যেহেতু চারটা আটটা পরী, যেহেতু এক্ষুণি তেলয়ালা হাফিজদ্দি ওকে এসে ডেকে তুলবে সুতবাং জল তেষ্টাতে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে ওকে ডাকা ভাল।

সুমিত্র ডাকল, অনাদি, ও অনাদি। একটু উঠে জল দে ভাই।

এই রাতে জল চাওয়ায় অনাদি আশ্চর্য হল। সে বলল, উঠে খেতে পারিসনা!

—শরীরে ভয়ানক কষ্ট।

—কেন কি হল!

—মনে হয় জ্বর এসেছে।

অনাদি তাড়াতাড়ি উঠে কপালে হাত রেখে দেখল জ্বরে সুমিত্রের শরীর পুড়ে

যাচ্ছে। সে জল দিল সুমিত্রকে এবং শরীরটা টিপে দেবার সময় বলল, রাত একটা পর্যন্ত তুই কোথায় ছিলিরে?

সুমিত্র উপরের দিকে হাত তুলে দেখাল।

—কি করছিলি?

—চেরীকে পাহারা দিচ্ছিলাম।

—চেরী তোকে কিছু বলেছে!

—না।

—জাহাজের একঘেয়েমী তোর কাটছে ভাল।

সুমিত্র জবাব দিলনা। চুপ করে অন্যদিকে দেখতে দেখতে সুমিত্র কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

ভোরের দিকে সারেঙ ঘরে ঢুকে বলল, কিরে বা অসুখ বাধাইছ!

—না, তেমন কিছু নয় চাচা। মনে হয় ফ্লু গোছের কিছু। মেজ মালোমের কাছ থেকে একটু ওষুধ এনে দেন চাচা।

সারেঙকে চিন্তিত দেখাল। ওর পরী কে দেবে এখন এমতই কোন চিন্তা যেন সারেঙের মনে। সুতরাং সে একজন কালতু আগওয়ালাকে ডেকে সুমিত্রের পরী দিতে বলে গেল এবং যাবার সময় বলে গেল—পরীতে সুমিত্রের আজ যেতে হবেনা এবং এখুনি কোন কয়লায়ালাকে দিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। এমন কথাও জানাতে পেরে সারেঙ যেন খুশী। তবে সুমিত্র যেন ডেকে উঠে ফের ঠাণ্ডা না লাগায়, বেশী হাঁটাহাঁটি না হয় সেজন্য সারেঙ শাসনের ভঙ্গীতেও কিছু কথা বলে গেল। বিশেষত, ভাতের জন্য ভাণ্ডারীকে পীড়াপীড়ি করলে নির্ঘাত পরী দিতে হবে এইসব কথার দ্বারা সারেঙ সকলের উপরে, সেই জাহাজের সব খালাসীদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা এমন এক ধারণার ভিত্তিতে সারেঙ মেজ মিস্ত্রির মত ডেকের উপর দিয়ে হেঁটে গেল—যেন এনজিনিয়ার হাঁটছে ডেকে।

সুমিত্র শুয়ে ছিল, সে পরীদারদের ওঠানামার সঙ্গে ধরতে পারছে, এখন কটা বাজে। পোর্টহোল খোলা ছিল, কিন্তু সে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছে না। উপরের ঘরে ট্যাণ্ডেলের তামাক কাটার শব্দ ভেসে আসছে। পাশের ফোকসালে কোন জাহাজী এখন নামাজ পড়ছে। তা ছাড়া সমুদ্রে ঢেউ একটু বেশী আজ। জাহাজটা কিঞ্চিৎ বেশী দুলছে যেন।

মুখটা ওর বিস্বাদ লাগল। সে এক মগ চায়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে এখন। ভাণ্ডারী এক মগ চা এনে দিলে ঢক ঢক করে সবটা খেয়ে কম্বল সমস্ত শরীরে

ঢেকে পড়ে থাকবে—তারপর যদি ভীষণভাবে ঘাম হয় শরীরে তবে নিশ্চয়ই শরীরটা ঠাণ্ডা হবে এবং অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ থেকে সে মুক্তি পাবে।

চেরী কেবিনে বসে চা-এর সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ, কিছু ফল এবং মাখনের স্বাদ এতবার চেখেও যখন তৃপ্তি পেল না, যখন আটটা বারোটার পরীদাররা সকলে নেমে গেছে ধীরে ধীরে অথচ সুমিত্র নামছে না—দূরে সমুদ্রেব বুকে সূর্যের ম্লান আলো তেমনি ছড়িয়ে পড়ছে এবং তরঙ্গ সকলকে আলোকিত করছে; কিছু উড়োক্কো মাছ তেমনি ঝাঁক বেঁধে সাঁতাব কাটছে, ছোট মালোম দূরবীণে আকাশ এবং সূর্যের অবস্থান প্রত্যক্ষ করছেন তখন চেরীর মনে হল ডেক ছাদের ছায়া ধরে একটু হেঁটে এই জাহাজেব রেলিঙে ভব করে সুখ এবং শান্তিকে খুঁজলে হয়। সমুদ্রের উপর জাহাজের প্রপেলার জল কেটে যাচ্ছে, জলে ফসফরাস জ্বলছিল—সূর্যের ম্লান আলোর জন্য সে কিছুই দেখতে পারছে না। অন্ধকার থাকলে এখন যেন ভাল হত। ফসফরাস জ্বলছে, এইসব দেখে গতরাতের মত ঘোর উত্তেজনায় ভুগতে পারত। রাতের নিঃসঙ্গতায় এখানে চেরী কতবার এসে ভর করে দাঁড়িয়েছে। রেলিঙে ঝুঁকে ফসফরাস জ্বলতে দেখেছে। কখনও সুমিত্র থাকত, কখনও থাকত না। একদিন সে সুমিত্রকে খুশী করার জন্য বলেছিল নেমে সোজা আমাদের প্রাসাদে গেলেনা কেন? সুমিত্র তুমি ··তুমি···।. সুমিত্র এই সময় কোথায়! ডেক সারেঙ এক নম্বর ফক্কার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। জাহাজীবা সাবানজল নিয়ে মাস্টের উপর উঠে হাসি ঠাট্টায় মসগুল। চেরী তখন ডাকল, সারেঙ, সারেঙ।

ডেক সারেঙ দৌড়ে এলে চেরী বলল, সুমিত্র কোথায়? সে তো এখনও নীচে নামেনি। ওর তো আটটা-বারোটা ওয়াচ।

সারেঙ জবাব দিল, মাদাম ওর অসুখ হয়েছে।

চেরী অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলল, যাঃ!

—জী মাদাম। অপনাকে আমি মিথ্যা বলতে পারি?

—ওকে কে দেখাশুনা করছে?

—কে করবে মাদাম? সময় তো কারো হাতে নেই। সকলেই কাজ করছে। ও জ্বরে কাতরাচ্ছে।

—তোমরা ওকে দেখতে পার না! জ্বর হয়েছে···একলা ফেলে ·:

—তা দেখি, মাদাম। সারেঙ নিজের দোষ কাটাবার জন্য বলে গেল, সব ব্যবস্থা করা হয়েছে মাদাম। এনজিন-সারেঙ মেজ মালোমের কাছ থেকে ওষুধ এনেছে।

তারপর চেরীর মনে পড়ল এই মালবাহী জাহাজে সেবা শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা নেই। জাহাজীদের জন্য ভাল ওষুধ নেই। কোন ডাক্তার নেই। সাধারণ রকমের অসুখে মেজ মালোমই ওষুধ দেন। সাধারণ রকমের অসুখে প্রয়োগ করার মতো কিছু ওষুধপত্র এই জাহাজের কোন এক প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত আছে। কাপ্তানের উপর, কোম্পানীর উপর চেরীর রাগ ক্রমশ বাড়তে থাকল। অথচ চেরী ফোকসালের দিকে হেঁটে যেতে পারছে না। গতরাতের ঘটনাসকল চেরীকে সঙ্কুচিত করছে। যেন এই মুখ সুমিত্রকে দেখানো চলে না। যেন সুমিত্রের ফোকসালে ঢুকলে—সে দুঃখবোধ করতে পারে। গতরাতের দুঃসহ অপমানের কথা নিশ্চয়ই সে ভুলে যায় নি। সুতরাং, সুতরাং কি ভেবে চেরী নিজের কেবিনে ঢুকে কিছু ফল তুলে নিল হাতে এবং কাপ্তান-বয়কে ডেকে বলল, যাও, সুমিত্রের কেবিনে এই ফলগুলি রেখে এস। কিছু বললে বলবে, বাটলার দিয়েছে। অন্য কোন কথা বলবে না।

কাপ্তান-বয় দরজার চৌকাঠ পার হলে চেরী বলল, জ্বর কত এবং কেমন আছে দেখে আসবে।

কাপ্তান-বয় অ্যালওয়েতে হাঁটছিল এবং শুনতে পাচ্ছে, ওকে বেশী নড়াচড়া করতে বারণ করবে। মনে থাকে যেন, অন্য কোন কথা বলবে না।

কাপ্তান-বয় খুব ধীরে ধীরে হাঁটছে। কারণ তখনও চেরী নানারকমের নির্দেশ দিচ্ছে।—কম্বল গায়ে না থাকলে দিয়ে দেবে। কাপ্তান-বয় সব শুনে হাসল। বস্তুত চেরী আভিজাত্যবোধে ফোকসালের দিকে হেঁটে যেতে পারছে না। কাপ্তান-বয় বুঝল, চেরীর ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। ডেকছাদের নীচে দাঁড়িয়ে একবার পিছন ফিরে তাকাতেই দেখল—দূরে কেবিনের দরজাতে ভর করে চেরী অপলক চোখে কাপ্তান-বয়ের মুখে কোন খবরের প্রতীক্ষাতে মগ্ন। কাপ্তান-বয় এবার সত্বর ছুটে গেল। কারণ ওরও চেরীর দুঃখবোধে মনের কোণে এক স্নেহসুলভ ইচ্ছার রঙ করুণ হয়ে উঠছে।

সিঁড়ি ধরে নামছিল কাপ্তান-বয়। নীচের ফোকসালগুলি সবই প্রায় খালি। কিছু কিছু জাহাজী ডেকে হল্লা করছে। ওরা দেশের গল্পে, বিবিদের গল্পে মসগুল। প্রতিদিনের মত ফলক্কা বেঁধে কেউ কেউ জাহাজে রঙ করছে। কাপ্তানবয় প্রতিদিনের এইসব একঘেয়েমি দৃশ্য দেখতে দেখতে নীচে নেমে গেল। সুমিত্রের শিয়রে দাঁড়িয়ে কপালে হাত রাখল। ডাকল, সুমিত্র, সুমিত্র ওঠ বাবা।

এইসময় ঠাণ্ডা হাত উত্তপ্ত কপালে—সুমিত্রের মনে হল বড় প্রীতিময় এই

জাহাজীদের সংসার। দীর্ঘদিনের সফরে কাপ্তানবয়কে আপনজনের মত করে দেখতে গিয়ে চোখে জল এল।

সে ডাকল, চাচা!

—কেমন আছ?

—শরীরটা বড় ব্যথা করছে।

—একটু নুনজল এনে দেব? গরম জল?

—গরম জল ভাণ্ডারী দিয়েছে।

—কি খেলে?

—কিছু না। ভাবছি ভাত খাবনা। শবীরটা খুব ঘামছে। মনে হয় ভাল করে ঘাম হলে শরীরটা খুব ঝরঝরে হবে।

যখন কাপ্তান-বয় দেখল শরীরে কোন উত্তাপ নেই এবং যখন বুঝল ফ্লু গোছের কিছু হয়েছে তখন আর বেশী দেরী করল না। পকেট থেকে আপেলগুলি বের করে দিয়ে বলল, নাও রাখ। খাবে। কি খেতে ভাল লাগে বলবে। বিকেলে এনে দেব। সুমিত্রকে একটু বিস্মিত হতে দেখে বলল, বাটলার দিয়েছে। বড় বড় চোখে তাকাবার মত কিছু হয়নি।

সুমিত্রের শরীরে কম্বল টেনে দিয়ে কাপ্তান-বয় বাইরে বের হয়ে গেল। সিঁড়ি ধরে উঠছে। সুমিত্র শুয়ে শুয়ে উপরে কাপ্তান-বয়ের জুতোর শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে শুনতে পেল। ওর পোর্টহোলটা খোলা নেই। খোলা থাকলেও সে আকাশ দেখতে পেতনা। মাল বোঝাই জাহাজ। সমুদ্রের জল মাঝে মাঝে পোর্টহোলটাকে ঢেকে ফেলছে। সমুদ্রের এই জল দেখে গতরাতের কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছে সুমিত্র। চেরীর যৌন ইচ্ছা এবং প্রগলভতা ওর মনে এখনও কামনার জন্ম দিচ্ছে। অথচ সে পারছে না। বার বার এই আত্মঘাতী ইচ্ছা ওকে নিদারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ করছে, রাতে চেরীর কেবিন থেকে ফিরে এসে এই ফোকসালে দীর্ঘসময় পায়চারী করেছে এবং সকল দগ্ধ যৌন ইচ্ছার প্রতি উষ্মা প্রকাশের জন্য বার বার জাহাজীসুলভ খিস্তি করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চেয়েছে।

কিন্তু বিকালে সুমিত্রের জ্বরটা থাকল না। বাংকে বসে সে—শরীর এখন নিরাময় নিরন্তর এই বোধে খুশী। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে একটি বেঞ্চিতে বসল। সমুদ্রের হাওয়ায় ওর শরীর প্রাণ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। সে এবার ধীরে ধীরে চারনম্বর কক্ষা অতিক্রম করে ডেকছাদের নীচ দিয়ে এলওয়ে পথটাকে দেখল—সেখানে কোন পরিচিত মুখ ভেসে উঠছেনা। সেই মুখ, নরম ঘাড় আর তার

কোমল মন সুমিত্রের নিঃসঙ্গ এবং পীড়িত শরীরের জন্য বড় প্রয়োজন। এবং গতরাতের বেশ্যা এই শব্দটি গ্লানিকর সুতরাং উচ্চারণে কিঞ্চিৎ সংযত হওয়া প্রয়োজন। তারপর এই মুহূর্তে নিজেকে ছোটলোক ভেবে ক্ষোভ থেকে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হওয়া গেলে মন্দ কি? চেরীব মাতাল যৌনেচ্ছাতে সমুদ্রের নেশা ছিল। ওর ঘরে পিতৃ অবয়ব অনেক দূরের যাত্রির মত এবং এই জন্যই বুঝি সমুদ্রের ঢেউ অথবা আকাশ দেখতে দেখতে একটু প্রেম কবা চলে—ভালবাসলে ক্ষতি নেই তারপর রাত যদি ঘন ঘন শরীরেব রমণীয়তায় তন্ময় কবে বাখে, যুক্ত করে রাখে তবে বিস্ময়কাবী জানোয়ারেব মত ইতর হবার প্রয়োজন কোথায়! সে ভাবল, সুতরাং আজ বাতে চেরীর দরজাব পাশ দিয়ে একবার হেঁটে যাবে। এবং গৃহ-প্রবেশের দিনে গিন্নিমার মত একবার যৌনসংযোগ ঘটাবে—এই নিরন্তব ইচ্ছার জন্য সে এবার ডাকল—ভাণ্ডাবী-চাচা আমাকে একমগ চা দিন।

ভাণ্ডারী উঁকি দিল গ্যালী থেকে। জাহাজীরা ঘরে ফেরাব মত একে একে সকলে পিছিলে জমছে। ওদের হাতে রঙেব টব ছিল। ওর' হাতের রঙ কেরোসিন তেলে মুছে দিচ্ছে। ওরা এবার স্নান করবে। নামাজ পডবে এবং আহার করবে। সমুদয় কাজ সেরে ওরা গিয়ে বেঞ্চিতে বসে ন্যক্কারজনক কথাবার্তায় ডুবে ডুবে জল খাবে। সুমিত্র ওদেব সকলকে দেখল। ওরা সকলে ওকে এক প্রশ্ন করল, তোমার শরীরটা ক্যামন আছেবে ব। এইসব বলে ওবা ফোকসালে নেমে গেলে ভাণ্ডাবী বলল, চা কডা করে দেব?

—তাই দাও।

সুমিত্রের এখন আর কিছু করণীয় নেই। সুতরাং পা ঝুলিয়ে বসে থাকল। শরীরে সমস্ত দিনের সঞ্চিত গ্লানি এই সমুদ্র এবং এক কাপ চা দূর করে দিল। সে এবার জাহাজের অলিগলি না খুঁজে সোজা দিগন্তে নিজের দৃষ্টিকে নিযুক্ত করে তার দেশ বাড়ীর চিন্তা—সেখানে কি মাস, কি ফুল ফুটছে অথবা কোন ঋতু হতে পারে দুর্গাপূজাব সময় হতে কত দেরী, শেফালী ফুল ছড়ানো উঠোন অথবা বৃষ্টি বৃষ্টি··· এবং জাহাজে থেকে থেকে বাংলা দেশের মাস কালের হিসাব ভুলে গেল সুমিত্র। অথবা এইসব চিন্তার দ্বারা দেশের আকাশকে উপলব্ধি করার জন্য আঁকু-পাঁকু করতে থাকল সুমিত্র।

ডেক সারেঙ বলল, তবিয়ত কেমন?

—ভাল, চাচা। জরটা মনে হয় সেরে গেছে।

—কি খেয়েছিলে?

—চপাটি খেলাম চাচা।

—ভাল করেছ।

—রাত্রে দেখি বাটলারকে বলে একটা পাউরুটি সংগ্রহ করতে পারি কি না।

অনাদি উঠে এল পিছিলে। সে বলল, এখানে বসে শরীরে ঠাণ্ডা লাগানো হচ্ছে?

—এক্ষুনি নেমে পড়ব। বলে, সুমিত্র অনাদিকে অনুসরণ করে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। সারেঙের ঘরটা অতিক্রম করে ষ্টোর রুমের পাশের নির্জন জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়ে সুমিত্র ডাকল, অনাদি!

—কিছু বলবি?

—তুইতো সারাদিন পাঁচ নম্বরের সঙ্গে ডেকে কাজ করছিলি?

—হ্যাঁ তা করছিলাম।

—চেরীকে ডেকে বের হতে দেখলি না?

—না। তবে এলওয়ে ধরে আসবার সময় দেখলাম চেরী বিছানায় শুয়ে আছে।

—কিছু করছে না?

—ঘরটা অন্ধকার। দরজা জানালা সব বন্ধ করে রেখেছে।

—সুতরাং ভাল মত দেখিসনি!

—না।

সুমিত্রকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আশাহত। অনাদি নিজের ফোকসালে চলে গেল এবং পিছনে এসে এ-সময় কাপ্তান বয় ডাকল, সুমিত্র এই নাও তোমার বিকাল এবং রাতের খাবার। বাটলার দিয়েছে।

—চাচা, বাটলার এত সদয় কেন আমার প্রতি?

—তা আমাকে বললে কি হবে! বরং বাটলারকে জিজ্ঞেস কর। একটু থেমে বলল, তোমার শরীর এখন কেমন?

—ভাল চাচা।

—বেশী নড়বে না। এ-জ্বর কিন্তু খুব খারাপ। আবার ফিরলে অনেক ভোগান্তি হবে। ব'লে চলে যাবার জন্য উদ্যোগ করলে সুমিত্র কেমন সঙ্কোচের সঙ্গে ডাকল, চাচা।

কাপ্তান-বয় মুখ ফিরিয়ে বলল, কি!

—চেরী আমার যে শরীরটা খারাপ করেছিল, জানে?

—তা আমি কি করে জানব বাপু।

—তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি!

—না। আমি কতক্ষণ থাকি ওর কাছে? কাপ্তান-বয় আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমিত্র ফোকসালে ঢুকে ফের বাংকে শুয়ে পড়ল। শরীরটা বেশ দুর্বল মনে হচ্ছে। গতরাতের ঘটনাগুলো ওকে এখনও যেন যন্ত্রণা দিচ্ছে। অথচ একবার চেরীর কেবিনে যেতে পারলে সব দুর্ঘটনার যেন অবসান হত। তবু সে নিজের শরীরে কম্বল টেনে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। নির্জনতায় ভুগে কেমন বিস্বাদ বিস্বাদ সব। অনাদি পাশের বাংকে শুয়ে বকবক করছে ছোট ট্যাণ্ডলের সঙ্গে। এইসব কথা এবং যৌন আলাপ শুনতে ভাল লাগছে না। ফোকসালের সর্বত্র একই জৈব-ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মুসলমান বৃদ্ধ পুরুষসকল অযথা বদনা নিয়ে বারবার এই ঠাণ্ডা দিনেও গোসলখানায় ঢুকে স্নান করছে এবং আল্লা আল্লা করছে।

ফোকসালে ফোকসালে এখন অন্ধকার। এবং সন্ধ্যা অতিক্রম করছে বলে সকলে আলো জেলে দিল। কিন্তু সুমিত্রের এই আলো ভাল লাগছেনা। আলোটা ওর চোখে লাগছে। সে অনাদিকে আলোটা নিভিয়ে দিতে বলল। এবং এই অন্ধকার এখন ওকে গ্রাস করছে। রাত বাড়ছে। ফোকসালে ফোকসালে জাহাজীরা ভীড করে আছে। ওরা এবার উপরে উঠবে। ওরা রাতের আহার শেষ করে আবার নীচে নেমে আসছে। তারপর শুয়ে অযথা একটার পর একটা বিড়ি টেনে কখনও সুখটান, কখনও বাড়ীতে বিবির মুখ শরীর এখন এই রাতে কোন ভঙ্গীতে অবস্থান করছে এবং ঘরে ফিরে বিবির শরীরটা কত প্রকার যৌনসুখের আধার হতে পারে সেটা যেন পরখ করে দেখাব বাসনা।

সুতরাং সুমিত্র দীর্ঘসময় এই বাংকে বিস্বাদের গন্ধ নিয়ে পড়ে থাকতে পারছেনা। রাত যত বাডছিল, ঘন হচ্ছিল তত শরীরের দুর্বলতা যৌনক্ষুধাকে আবেগমথিত করছে। এবং যখন দেখল ফোকসালে ফোকসালে ডেক জাহাজীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, এন্‌জিন অথবা ডেক সারেঙের ঘরে আলো জলছেনা তখন ধীরে ধীরে সে সিঁড়ি ধরে চোরের মত পা টিপে টিপে উপরে উঠতে থাকল।

ডেকে উঠতেই শীত শীত অনুভব করল সুমিত্র। অষ্ট্রেলীয় উপকূলের যত নিকটবর্তী হচ্ছে তত শীতটা যেন বাড়ছে। তত সমুদ্র যেন শান্ত হয়ে আসছে। আজও সে ডেকে এসে দেখল কেউ কোথাও নেই। মাস্টের আলোগুলি ভূতের মত রাতের আঁধারে দুলে দুলে পায়চারী করছে। ব্রীজে ছোটমালোম পায়চারী করছেন; ওঁর এখন ওয়াচ নিশ্চয়ই। সুমিত্র আড়াল থেকে দেখল সব এবং খুশী হল।

ছোটমালোম পাশের কেবিনে থাকেন। সুতরাং চেরীর কেবিনে কোন শব্দ হলে পোর্টহোল দিয়ে উঁকি মারতে পারেন। সে উত্তেজনায় দাঁড়াতে পারছিল না, চুলোয় যাক ছোটমালোম—সে ছুটে এলওয়ে পথে ঢুকে গেল। এবং চেরীর দরজার উপর ভর করে ছোট ছোট আওয়াজে ডাকতে থাকল, মাদাম, মাদাম! আমি এসেছি। দরজা খুলুন! যেন বলার ইচ্ছা, আমি যথার্থই কাপুরুষ নই। আপনাকে বেশ্যা ব'লে নিরন্তর আমি দগ্ধ। আমরা সকলেই উনুনের তাপ চুরি করে শরীর গরম করছি। আপনি দরজা খুলুন মাদাম।

চোরের মত সুমিত্র কড়া নাড়তে থাকল। রাত বলে এন্‌জিনের আওয়াজ প্রকট। সুতরাং এখন কেউ সুমিত্রের কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাবে না। কেউ এদিকে এলে সে এন্‌জিন রুমে নেমে যাবার মত ভান করে দাঁড়িয়ে থাকবে। বড় মালোমের ঘর পর্যন্ত খোলা নেই। সে আবার কড়া নাড়তে থাকল এবং এ-সময়েই দেখল ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। চেরীর পায়ের শব্দ ভিতরে। চেরী দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। ভিতর থেকে প্রশ্ন এল, কে! কে?

—আমি সুমিত্র, মাদাম। সে আর কিছু প্রকাশ করতে পারছে না। সে উত্তেজনায় অধীর। শরীরের প্রতি লোমকূপে সমস্ত দিন ধরে উত্তাপ সঞ্চিত এবং যেন ভোরের ক্লান্তি সকল উত্তাপকে এখন ফের অবসন্ন করতে চাইছে। সে শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। সমস্ত গা পুড়ে যাচ্ছে। গলা ভয়ে শুকনো, কাঠ। সে কোনো রকমে গলা ঝেড়ে আবার ডেকে উঠল, মাদাম, আমি সুমিত্র।

দরজা খুললে চেরী দেখতে পেল সুমিত্র দরজায় দাঁড়িয়ে ঘামছে। এই শীত-শীত রাতেও এমত ঘাম সুমিত্রের মুখে শরীরে সর্বত্র। কেবিনের আলোয় মুখের বিন্দুসকল ঝলমল করছে। সুমিত্রের চোখের নীচে কালি পড়েছে; বিশেষ করে গত রাতের সেই যুবকটিকে যেন আর চেনাই যাচ্ছেনা। চেরী এবার সুমিত্রের হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল। পাখা খুলে দিয়ে বলল, বোস। ইজিচেয়ার ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল চেরী। তারপর ধীরে সুস্থে বাংকে বসে বলল, এত রাতে!

সুমিত্র চেরীর কণ্ঠে গতরাতের কোন ইসারাকেই খুঁজে পেল না। এতরাতে! এই শব্দ দ্বারা চেরীর আভিজাত্য বোধ অথবা প্রথম বারের অভিযোগের মত··· তুমি কেন এই কেবিনে, কি ইচ্ছা শরীরে মনে কাজ করছে, তুমি আমায় মাতাল রমণী ভেবে থাকলে···অসহ্য। এবং আতঙ্কে সুমিত্র চোখ তুলে তাকাতেই দেখল—দুই ঠোঁটে চেরীর ফুল ঝরছে। এইসব দেখে সুমিত্রের বলতে ইচ্ছা হল, মাদাম আপনি প্রসন্ন হোন। আমাকে আতঙ্কগ্রস্ত করবেন না। ঘুম গভীর হওয়ার জন্য

চোখ আপনার ভারি ভারি। মুখটা বেশ ভরে উঠেছে। আজ গতরাত্রের মত চেপে যাওয়া নয়। চেরী বিছানা থেকে উঠে প্রসাধন করেনি বলে মুখে কোন কৃত্রিমতার চিহ্ন নেই। বিশেষ করে পোর্টহোলের কাঁচ খুলে দিলে চেরীর চুল উড়তে থাকল। মুখ সমুদ্রের হাওয়াতে তাজা আপেলের মত গন্ধ ছড়াতে থাকল। আর তখনই চেরী সুমিত্রের একটা হাত নিজের হাতে স্থাপন করে…কি হচ্ছে মাদাম, আমি যে আর পারছি না। আপনি স্পষ্ট হোন গত রাতের মত, আমি কাঁপছি, জ্বরে নয় আবেগে। চেরী ওর হাতের নাড়ী দেখল এবং হাতটা পূর্বের মত যথাস্থানে স্থাপন করে বলল, জ্বর নেই। সুমিত্রের মুখ চোখ নৈরাশ্যবোধে পীড়িত হতে থাকল। যেন বলার ইচ্ছা ছিল, এই দেহ নিয়ে আজ আপনি ইচ্ছা-মত ব্যবহার করতে পারেন অথবা শরীরে সংস্থাপন করে কোলাহল পূর্ণ জীবনের কোন কালকে অমৃতময় করে রাখতে পারেন—আমার কোন আদর্শ নেই, আমি জাহাজী·· তখন চেরী সহসা ওর পায়ের কাছে নেমে হাঁটুগেড়ে বসল। বলল, গতকালের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত সুমিত্র। মদ খেয়ে আমি বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। তারপর চেরী কিছুক্ষণ ঘনিষ্ঠভাবে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে থাকল। অথচ তখন সমুদ্রে কোন তরঙ্গ উঠছে না। স্থির। কোন আবেগ চেরীকে মথিত করছে না। চেরী পাশের বাংকে উঠে যাচ্ছে এবং সমাজবদ্ধ জীবের মত ব্যবহারে কিঞ্চিৎ সমীহ। সে বলল, রাত জেগে থাকলে শরীর বেশী খারাপ করবে। বরং শুয়ে ঘুমাও।

—আমার শুতে ইচ্ছা হচ্ছেনা মাদাম। ঘুম আসছেনা।

—শরীরে কোন যন্ত্রণা হচ্ছে না তো?

—মাদাম!

—কিছু বলবে?

চেরী দেখল সুমিত্রের চোখ দুটো জ্বলছে। সমস্ত শরীর থেকে কামনার আবেগ গলে গলে পড়ছে। স্থিরভাবে তাকাতে পারছে না—যেন অবসন্ন সৈনিক কুয়াশার অন্ধকার থেকে পথ খুঁজে খুঁজে অবিরাম হেঁটে হেঁটে কোন আশ্রমে উপস্থিত। পানীয় জলের মত যুবতীর চোখ এবং উদগ্র বাসনা নিরন্তর ভোগাচ্ছে। সে ফের ডাকল, মাদাম আপনার শরীর ভাল তো? সুমিত্র নিজের উপরে এবার যত রাগ—সে যথাযথভাবে বলতে পারছেনা, রাতে এ-ঘরে শয়ন করার বাসনা মাদাম, কাপুরু-ষোচিত সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে চাই। কিন্তু সে শুধু বলল, আপনি ফুল ভালবাসেন মাদাম?

—ভালবাসি সুমিত্র।

—পাখী?

—পাখী ভালবাসি।

—আমার ফুল, পাখী কিছুই ভাল লাগছেনা মাদাম।

—কেন, কেন!

—কি জানি। এই জাহাজ কেবল উচ্ছৃঙ্খল হতে বলছে।

—সুমিত্র! খুব দূর থেকে যেন চেরীর গলা ভেসে আসছে। গলা আবেগে কাঁপতে থাকল।

—আমাকে কিছু বলবেন মাদাম?

—তুমি উচ্ছৃঙ্খল হলে আমার যে কিছু থাকল না। নিজের সতীত্ব প্রমাণে চেরী যেন মরীয়া হয়ে উঠল।

—না না। আপনি ভুল বুঝবেন না মাদাম। আমি যত্নের সঙ্গে সব পরিহার করে চলছি মাদাম। অথবা বলতে পারেন, চলার চেষ্টা করছি।

—সুমিত্র, কখনও যদি সময় অথবা সুযোগ পাই আমি ভারতবর্ষে যাবই।

—ভয়ানক গরীবের দেশ। রাজপুত্রেরা এখন ফুটপাথে হেঁটে বেড়াচ্ছে মাদাম।

চেরী নিজেও তার ইচ্ছার কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারছে না। এক কৃত্রিম আদর্শ উভয়কে সঙ্কুচিত করে রাখছে। অথবা এও বলা যেতে পারে, চেরী ব্যবহারে কেবলই মাতৃসুলভ হয়ে উঠছে। সে সুমিত্রের কপালে হাত রেখে বলল, সারাটা দিন আমার কি যে গেছে!

সুমিত্র আর পারছে না। সুতরাং মাথাটা ইজিচেয়ারের উপর আরাম করার জন্য স্থাপন করল। যেন ঘুমোচ্ছে সুমিত্র এবং দেখলে মনে হবে মৃত। শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড়। সে যেন আর দাঁড়াতে পারছে না। সে হেঁটে যেতে পারছে না ফোকসালে—দেখলে এমতই মনে হবে সুমিত্রকে। দীর্ঘসময় ধরে চেরীও চুপ করে শুয়ে থাকল বাংকে। এখন ওরা উভয়ে পরস্পর আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য প্রথম শহীদ কে হবে, কে প্রথম যৌন বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবে এমতই কোন এক প্রতিযোগিতায় মত্ত। চেরী শুয়ে শুয়ে সুমিত্রের অবয়বে সেই রাজপুত্রের প্রতিবিম্ব দর্শনে আর স্থির থাকতে পারল না। সে খৃষ্টের নাম স্মরণ করে ডাকল, এস সুমিত্র।

চেরী আবার ডাকল, সুমিত্র এস। নীল আলো জ্বলছে, দেখ।

সুমিত্র জবাব দিচ্ছেনা। এমন কি ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ল না। যেমন শিথিল

শরীর নিয়ে পড়েছিল তেমনি পড়ে থাকল।

—সুমিত্র, সুমিত্র। চেরী বাংক থেকে নেমে সুমিত্রের ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে দেখল, সুমিত্র যথার্থই ঘুমিয়ে পড়েছে। যে আবেগ এবং ইচ্ছা এতক্ষণ ধরে বাজীকরের মত অভিভূত করে রেখেছিল, সুমিত্রের অসহায় মুখ দেখে সেই বঙ জলের মত নির্মল হল। চেরী সন্তর্পণে কাছে গিয়ে কম্বলটাতে পা শরীর ঢেকে দিয়ে কেবিনের নীল আলোর ছায়ায় ভারতবর্ষের রাজপুত্রের মুখ দেখতে দেখতে রাত ভোর করে দিল। বাইরে আলো ফুটে উঠছে। পোর্টহোলের কাচ খুলে দিতেই বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া এই কেবিনের সকল ঘটনাকে প্রীতিময় করে তুলছে। চেরী বাংক থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকে পোষাক পাল্টাল। শেষে কাপ্তান-বয়ের খোঁজে ডেকে বের হয়ে গেল। ডেক-ছাদের নীচে এসে দাঁড়াতেই দেখল দুটো নির্জন দ্বীপের পাশ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে। সবুজ এক প্রান্তর, এই ভোরের মিষ্টি আলো, এবং দিগন্তের ফাঁকে সূর্য উঠছে, শুধু বক্তিম আকাশ—কোবনে সুমিত্র ঘুমোচ্ছে, চেরীর বুক ঠেলে কেমন এক কান্নার চিহ্ন ঠোটে মুখে ফুটে উঠল। দূরের দ্বীপ থেকে মাটির গন্ধ ভেসে আসছে, সবুজের গন্ধ এই জাহাজের ফাঁক ফোকরে যত অন্ধকার আছে সব নির্মল করে দিচ্ছে। দ্বীপের পাখীসকল জাহাজটাকে দেখে চক্রাকারে উড়তে থাকল। নীলরঙের পাখীরা ডাকল আর আকাশের চারধারে সাদা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এবং তার ফাঁকে ফাঁকে দ্বীপের সকল পাখীরা কোন এক নিরুদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে। চেরী ভাবল, এই দ্বীপের কোন গুহায় তার এবং সুমিত্রের জন্য একটু আশ্রয় মিলতে পারে না। একটু আশ্রয়ের জন্য মাটির কাছে তার প্রার্থনা, ঈশ্বর আমার কি হবে!

কাপ্তান-বয় এসে ডাকল, মাদাম।

—কফি। দু কাপ।

ধীরে ধীরে জাহাজটা দ্বীপ দুটোকে পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে। সূর্যের আলো দ্বীপের সব অপরিচিত গাছের ফাঁক দিয়ে সমুদ্রে এসে পড়েছে। জনহীন এইসব ছোট ছোট দ্বীপ কতকাল থেকে এমন নিঃসঙ্গ কাটাচ্ছে কে জানে। দ্বীপের ঝোপ জঙ্গলের পাশে সুমিত্র এবং তার জন্য যদি কোন তপোবন থাকত, যদি একফালি রোদ এসে সেই কুটির-সংলগ্ন উঠোনে এসে পড়ত এবং সারাদিন পর সমুদ্র থেকে ঘরে ফিরে এসে সুমিত্র ওকে জড়িয়ে জীবনের স্বাদ যদি গ্রহণ করত— কত রঙিন স্বপ্ন দেখল চেরী, কত আকাঙ্ক্ষার কথা, বিচিত্র সব সখ সারাদিন ধরে ডেক পাটাতনে ভেবে কখনও অন্যমনস্ক, কখনও বেদনায় বাংকে শুয়ে শুয়ে

স্মৃতিকে ধরে রাখার স্পৃহাতে এক নির্দিষ্ট যুবকের পায়ের শব্দ শুনতে চায়।

তখন সুমিত্র চোখ খুলে দেখল এই কেবিন। গভীর ঘুমের আচ্ছন্নভাবটুকুর জন্য বুঝতে পারল না কোথায় এবং কি ভাবে, সে দেখল এই কেবিন ওর পরিচিত। তারপর একে একে বিগত রাতের ঘটনার কথা স্মরণ করে সে ফের আতঙ্কিত হল। দিনের আলো পোর্টহোল দিয়ে কেবিনে গলে গলে পড়ছে। চেরী ঘরে নেই। সুতরাং মনে ভিন্ন ভিন্ন সব অগোছালো চিন্তা জট পাকাচ্ছে। অথবা রাত হলেই এমন সব অসুখের ঘোরে সে ভুগছে: নিজের এই অপরিমাণদর্শিতার জন্য সে দুঃখিত হল। তারপর চেয়ার থেকে সন্তর্পণে উঠে ডেকে এসে দেখল, চেরী দূরের দ্বীপসকলকে দেখছে। চেরী খুব ঝুঁকে আছে রেলিঙে। সে তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনে ঢুকে বিছানায় শুয়ে রাতে চেরীকে কোন্ কোন্ সংলাপে জৈব ক্ষুধা মেটাবাব স্পৃহা জানিয়েছিল, কোন্ কোন্ শব্দ মনের ইতর চিন্তা প্রকাশে উন্মুখ ছিল এইসব ভাবতে গিয়ে চোখমুখ প্রচ্ছন্ন বিষাদে মগ্ন। সে রুগ্ন পুরুষের মত কম্বল টেনে বাংকে শুয়ে পড়ল।

কাপ্তান-বয় এসে ডাকল, মাদাম।

—এই যে!

—আপনাব কফি দেওয়া হয়েছে।

—দু কাপের মত?

—হ্যাঁ মাদাম।

চেরী তাড়াতাড়ি কেবিনে ঢুকবে ভাবল এবং সুমিত্রকে হাত মুখ ধুতে বলবে বাথরুমে। তারপর একসঙ্গে কফি খেতে খেতে সুস্থ সব গল্প, ওর দেশ বাড়ী এবং অন্য অনেক সব খবর নিতে হবে—কিন্তু ভিতরে ঢুকেই দেখল, কেবিন ফাঁকা। সুমিত্র নেই। তারপর সে দেখল পোর্টহোলের কাঁচ খোলা। সে এবার কফির সবটুকু বেসিনে ঢেলে দিল। একটু এগিয়ে গিয়ে কাঁচ এবং লোহার প্লেট দিয়ে পোর্টহোল বন্ধ করে দিল। যেন সুমিত্রের কোন প্রতিবিম্ব ভাসবে না এবং লজ্জায় আর অধোবদনও হতে হবে না। নিজের এই দুর্বলতাকে পরিহার করার জন্য সে আজ ভালভাবে স্নান করল। সুমিত্রকে এড়িয়ে চলার জন্য নানারকমের পত্র পত্রিকা খুলে বসল বাংকে। মনের বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাগুলোকে সংযত করতে গিয়ে বার বার সে হোঁচট খাচ্ছে। কোথায় যেন কি বিশাল পাথরের বোঝা হয়ে ভারতীয় জাহাজটা মনের উপর চেপে বসে আছে। চেরী আর পারছে না। চেরী নিজেকে রক্ষার জন্য দরজা খুলে তাড়াতাড়ি

কাপ্তানের কেবিনে ছুটে গেল। বলল, আপনার এই বারান্দায় একটু বিশ্রাম নিতে চাইছি।

—যতক্ষণ খুশী।

একটি ইজিচেয়ারে বসে সমুদ্র দেখতে থাকল চেরী। এখানে সুমিত্র নেই, শুধু সমুদ্র, শুধু ঢেউ। কিছু পারপয়েজ মাছ। কিছু মেঘ হয়েছে আকাশে। সমুদ্রের ও পাশ দিয়ে একটা জাহাজের ছোট চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। কাপ্তান নীচে আছেন। তিনি দূরবীণ চোখে রেখে জাহাজকে দেখলেন। চেরী উঠে দাঁড়ালে কাপ্তান ওর হাতে দূরবীণ দিয়ে বললেন, দেখুন দূরে একটা তিমি মাছ দেখতে পাবেন। চেরী কিন্তু দূরবীণ চোখে রেখে সুমিত্রের দিকে চেয়ে থাকল। পিছনের রেলিঙে সুমিত্র ঝুঁকে আছে—সে বোধ হয় প্রপেলারের শব্দ কান পেতে শুনছে। চেরী দূরবীণটা কাপ্তানের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ইজিচেয়ারটা ইচ্ছা করে দূরে সরিয়ে নিল। সুমিত্রকে আর দেখা যাচ্ছে না এবং সে খুশী হওয়ার ভান করে কাপ্তানকে পরবর্তী বন্দর সম্বন্ধে প্রশ্ন করল, আশা করছি দু দিন বাদেই আমরা সিডনি পৌঁছাব।

—আপনার সমুদ্রযাত্রা ভাল লাগছে না বোধহয়?

চেরী কথা বলল না।

—ভাল লাগবে কি করে! যাত্রী জাহাজে যেতে পারলে আপনার এতটা অসুবিধা হত না।

চেরী বলল, কাল বিকেলটা বেশ লাগল।

—তা বটে।

—আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে ক্যাপ্টেন।

—আপনার কথাও আমাদের মনে থাকবে। কাল আপনার ভায়োলিনের সুর অপূর্ব লাগছিল।

—ক্যাপ্টেন, এবার কিন্তু কথাটা একটু খোশামোদের মত মনে হল।

—না মাদাম, আপনি বিশ্বাস করুন। সকলেই আপনার প্রশংসা করছে। সুমিত্র ভারতীয়, সে পর্যন্ত বলল, মাস্টার, এ সফরের কথা আমরা সকলেই মনে রাখতে বাধ্য হব। তারপর সে আপনার কথায় এল।

চেরীর বলতে ইচ্ছা হল, আর কিছু বলেছে, আর কিছু? কিন্তু সম্মানিত জীবনের কথা ভেবে সে ওই প্রগাঢ় ইচ্ছাকে জোর করে থামিয়ে দিল।

কাপ্তান চেরীর নিকট থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে চার্ট-রুমে ঢুকে গেল এবং

নিজের কাজ করতে থাকল।

চেরী ব্রীজে পায়চারি করছে। একবার উইংসটার পাশে ঝুঁকে অথবা কখনও কম্পাসটার সামনে এসে (যেখানে কোয়ার্টার-মাস্টার স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাচ্ছে) নিজেকে বারবার আড়াল দিল। সুমিত্রকে আর দেখাই যাচ্ছে না। সুমিত্র পিছিলে কোথাও নেই। সে অ্যাকোমোডেশান ল্যাডার ধরে নেমে বোট-ডেক পার হয়ে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সুমিত্র এখন এন্‌জিন-রুমে—সে হাত ঘড়িতে সময় দেখে এমত ধারণা করল। এবং কেন জানি অপার বিষণ্ণতা চেরীকে গ্রাস করছে। এবার দুহাত ছুঁড়ে চেরীব যেন বলবার ইচ্ছা—কে আছ তোমরা এস, সুমিত্র নামে এক ভারতীয় যুবক আমার জীবন নিয়ে ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমাকে রক্ষা কর!

সুতরাং বিকেলে জোর করে নিজেকে কেবিনে আবদ্ধ করে রাখল। সুমিত্র যে ক'বার এন্‌জিন-রুম থেকে উঠেছে নেমেছে, প্রত্যেকবার চেরীর দরজা, পোর্টহোল বন্ধ দেখেছে। বিকেলবেলাতে সুমিত্র কাপ্তান-বয়কে প্রশ্ন করল, চাচা, রাজকন্যার দরজা-জানালা যে সব বন্ধ!

—কি জানি, মেয়েমানুষের মর্জি বোঝা দায়। আমাকে বলল, ঘুমালে ডেকো না। বারোটার সময় দবজার কড়া নাড়লাম, খাবার দিতে হবে···কোন সাড়া-শব্দ নেই। কাপ্তানকে বললাম—তিনি বললেন, বোধহয় ঘুমোচ্ছে, সুতরাং বাটলারকে বলে দাও যেন খাবারটা গরম রাখার ব্যবস্থা রাখে। ও আল্লা, নীচে নামতেই দেখি হৈ-হল্লা বাঁধিয়ে দিয়েছে।

সুমিত্র বলল, কাপ্তান আচ্ছা রাজকন্যার পাল্লায় পড়েছে!

—তা হবে। কিন্তু কাল রাতে তোমার কথাই বার বার বলছিল।

—কেন? কেন?

—না, থাক। ও সব আমার বলা বারণ আছে, বলে কাপ্তান-বয় টুইন-ডেকে নেমে গেল।

এবং এসময় সুমিত্র দেখছে চেরী সান্ধ্য-পোশাকে টুইন-ডেক অতিক্রম করে এদিকেই আসছে। সুমিত্র অন্যান্য সকল জাহাজীদের সঙ্গে কথা বলছে—চেরীকে দেখছে না এমত ভাব ওর চোখে-মুখে। চেরী অ্যাফট-পার্টে চলে আসছে। সুমিত্রের গলা শুকনো শুকনো ঠেকছে। চেরী অ্যাফট-পার্টে উঠে সুমিত্রের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সুমিত্রের দিকে তাকাল না, অথবা কথা বলল না। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে জাহাজ-ডেকে। সুতরাং সকলে সরে দাঁড়াল।

চেরী স্টারবোড-সাইডের ডেক ধরে এক নম্বর, দু নম্বর কক্ষা পার হয়ে ফের অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমিত্র পাশের জাহাজীকে বলল, চেরীকে খুব শুকনো শুকনো লাগছে না চাচা ?

—জাহাজে চড়লে প্রথম সকলেরই একটু শরীর খারাপ হয়। সুখী ঘরের মেয়ে। তা, একটু শুকনো লাগবে।

সুমিত্র এইসব কথা শুনল না। সে পিছিল থেকে নডছে না। সে চেরীকে ফরোয়ার্ড-ডেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল। চেবীর মুখ শুকনো, সেইহেতু একটা কষ্ট-কষ্ট ভাব সুমিত্রের মনে। চেরী চুপচাপ চলে যাচ্ছে—গেল। সুমিত্র স্থাণুবৎ। এই প্রথম একজন পরিচিত যুবতীর জন্য মনে মনে দুঃখ বোধ করছে এবং যতবার অস্বীকাবের ইচ্ছায় দৃঢ় হয়েছে তত এক দুর্নিবার মোহ সুমিত্রকে উত্তেজিত করে করে এক সময় নিদারুণ প্রেমে ঘনিষ্ঠ কবতে চেয়েছে।

সুমিত্র অনেকক্ষণ স্থাণুবৎ দাঁডিয়ে থেকে সহসা দেখল ডেক এবং অন্যত্র সকল স্থান আলো আলোময় করে জাহাজ গতিশীল। সে স্থাণুবৎ দাঁডিয়ে থাকতে পারছে না। সে ডেক ধরে নেমে গেল। সে হাঁটতে থাকল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। অথচ এক সময় সে নিজেকে দেখল চেরীব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চেরীর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মনে হচ্ছে ভিতবে কোন আলো জ্বলছে না। চেরী অন্ধকারে শুয়ে আছে চুপচাপ। সে ধীরে ধীরে কড়া নাড়ল।

ক্লান্ত গলায় ভিতর থেকে প্রশ্ন করল চেরী, কে ?

—আমি, সুমিত্র।

সুমিত্র ভিতরের শব্দে বুঝল চেবী খুব দ্রুত কাজসকল সম্পন্ন করছে। আলো জ্বালছে, প্রসাধন করছে। সব কিছুতেই ত্রস্তভাব। সুমিত্র এ-সময় এতটুকু ভীত হল না।

চেরী দরজা খুলল। চোখে ভয়ানক ক্লান্তি, তবু সুমিত্রের হাত ধরে এনে ভিতরে বসাল।

—আপনাকে আজ ভয়ানক অসুস্থ মনে হচ্ছে। কাল রাতে বুঝি এতটুকু ঘুমোন নি ?

—সুমিত্র, আমি তোমাকে মিথ্যা বলব না। কাল আমি ঘুমোতে পারিনি।

—আমি দেখছি মেজ-মালোমের কাছে ওষুধ পাওয়া যায় কি না।

—না সুমিত্র, তুমি বোস। ঘুমোতে পারছি না বলে আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

—কিন্তু আপনার চোখের কোল যে ভয়ানক ফুলে উঠেছে!

—সব সেরে যাবে। তুমি বোস। একটু কফি খাও। চেরী দরজায় গলা বের করে কাপ্তান-বয়কে ডাকল।

কফি খেতে খেতে চেরী প্রশ্ন করল, তোমাব কে কে আছে সুমিত্র?

—কেউ নেই।

—কেউ নেই?

—না।

—মা?

—না।

—বাবা?

—না।

—আত্মীয়-স্বজন?

সুমিত্র এবারেও ঠোঁট ওল্টাল।

—কি করে এমন হল?

—সব দাঙ্গাতে মারা গেছে। আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে ছিল।

—ঈশ্বব! চেরী আর কিছু প্রকাশ করতে পারল না। অনেকক্ষণ নির্জনে বসে থাকার মত চুপচাপ বসে থাকল পরস্পর। দীর্ঘসময় ওরা হতবাক হয়ে থাকল।

সুমিত্রই কথা বলল, আমি না ডাকতেই এসেছি বলে রাগ করেন নি তো?

—সুমিত্র, আমি খুব খুশী হয়েছি, খুব।

—আপনার শুকনো মুখ দেখে আমার আজ কেন জানি বারবারই মনে হল, এই জাহাজে আপনি আমার মতই একা। আমার মত আপনারও কেউ নেই। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ধরনের কষ্টে পীড়িত হতে থাকলাম। শেষে বিশ্বাস করুন, কে যেন জোর করে আপনার দরজায় আমাকে এনে হাজির করল।

এই সব কথায় চেরী-আবেগে প্রগাঢ় হল। সমস্ত শরীরে এক অদৃশ্য কম্পন। সে তার সকল দৃঢ়তা, সকল প্রত্যয়, সকল সম্মানিত জীবনের আলো গান পরিত্যাগ করে সুমিত্রের দু' হাত চেপে ধরল। কিন্তু আবেগের প্রগাঢ়তায় কিছুই প্রকাশ করতে পারল না। বলতে পারল না, মাই প্রিন্স! আমার আশৈশবের রাজপুত্র! সে মাথা নত করে সুমিত্রের মুখোমুখী বসে থাকল। মনে কোন আলো গান জাগল না। নিমজ্জমান তরীর মত জীবনের এক প্রবল

মাধ্যাকর্ষণে ক্রমশ গভীর সমুদ্রে ওরা মিলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে। এবং একসময় সুমিত্র যখন চোখ তুলল চেরীকে দেখবার জন্য, তখন চেরী অবাক হতে হতে দেখল, সেই চোখ, সেই বিষণ্ণ চঞ্চল চোখ কাঁচের জানালায় প্রতিবিম্ব হয়ে ভাসছে। কত ইচ্ছাই না চেরীকে এ-সময় বিব্রত করেছে, কিন্তু কোন ইচ্ছার সফলতাকেই অমৃতময় বলে মনে হল না, সুতরাং চেরী সুমিত্রের প্রিয়মুখ দর্শনে শুধু বিহ্বল হতে থাকল।

রাত্রির বিষণ্ণ আলোতে চেরীকে সুখী করার জন্য সুমিত্র বলল, তোমাকে যদি রাজা-রানীর গল্প বলি, তুমি খুশী হবে? চেরী শুধু চেয়ে থাকল ফ্যাল ফ্যাল করে।

পরদিন ভোরে সুমিত্র টুপাতির কেবিনে ঢুকে বলল, তোমার সময় হবে?

চেরী বলল, আমার হবে, তোমার হবে কি না বল?

—আমার আজ থেকে কোন ওয়াচ থাকবে না।

--কেন?

—কাপ্তান সারেঙকে বলে পাঠিয়েছে, আজ এবং কালকের জন্য অন্য কাউকে দিয়ে ওয়াচ চালিয়ে দিতে। সুমিত্র আজ বেশ আরাম করে দুটো পা বাংকের উপর তুলে দিয়ে বসল, তারপর ঠাকুরমার মুখে শোনা চম্পা এবং আর দুই সখীর গল্প করে চেরীকে আনন্দ দিল। গল্পটা বলতে বেশী সময় নিল না সুমিত্র। বারোটার পর সাহেবদের লাঞ্চ। চেরী খাবে তখন। সুমিত্র এগারোটা বাজতেই উঠে গেল।

বিকেলে বোট-ডেকে গল্প করতে এসে দেখল চেরী বসে বসে সমুদ্র দেখছে। সে ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর কি ভেবে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই ব্রীজে কাপ্তানের গলা পেল।

—সুমিত্র, গুড আফটারনুন।

—গুড আফটারনুন, মাস্টার!

—কাল আমরা বন্দর পাব।

—কখন স্যার?

—সন্ধ্যায়।

চেরী এখনও চোখ তুলছে না, অথবা ওদের দেখছে না।

কাপ্তান বলল, বেশ সমুদ্র-যাত্রা আমাদের। কোন ঝড় নেই, সমুদ্র একেবারে শান্ত।

—মাস্টার, আকাশ খুব পরিষ্কার।

—দশটা রাতেই ডেকে জ্যোৎস্না। মাদাম কি বলেন? চেরীকে উদ্দেশ্য করে কাপ্তান ব্রীজ থেকে কথা বলতে চাইল।

চেরী মুখ না তুলে এক ধরনের সম্মতিসূচক শব্দ করল।

সুমিত্র চলে যাচ্ছিল, চেরী ডেকে বলল, সুমিত্র, কাল আমরা বন্দর পাব।

—আশা করছি।

—বন্দরে আমার এক আত্মীয়া এবং এক বন্ধু আসবেন তুলে নিতে, তুমি তাদের সঙ্গে পরিচয় করবে না?

—নিশ্চয় করব। কি রকম আত্মীয়া হন তাঁরা?

—একজন পিসিমা। অন্যজন পিসেমশায়ের দাদার ছেলে। একটা মোটর কোম্পানীর পরিচালক।

—এই সব কথার ভিতর কেবলই তোমাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বল তো আর-একটা গল্প শোনাই। খুব আনন্দ পাবে।

—না, আর রূপকথা নয়। এবার জীবনের কথা বল। আমি জাহাজ থেকে নেমে গেলে তোমার কষ্ট হবে না?

—হবে, খুব কষ্ট হবে।

—তোমাকে অযথা মন্দ কথা বলেছি।

—এ-কথা এখন আর ভাল শোনাচ্ছে না।

—হয়তো আর দেখাই হবে না কোন দিন। অথচ ·

—দেখা হবে না কেন? জাহাজে যখন কাজ করছি, তখন নিশ্চয়ই দেখা হবে।

—সুমিত্র, তুমি তো জিজ্ঞাসা করলে না তোমার জন্য আমার কষ্ট হবে কি না?

—তোমারও হবে। সুমিত্র পাশেই বসে পড়ল। বলল, বেশ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।

এই কথা শুনে চেরী ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়ছিল। অথচ সুমিত্রকে দেখে মনে হল না, যে চেরীর বিদায়বেলাতে কোন দুঃখবোধে পীড়িত হবে। চেরী বলল, আমার কেবিনে এস। বলে, সে হাঁটতে থাকল।

—একটু বোস না, এই সমুদ্রকে তোমার ভাল লাগছে না?

—এখনই সন্ধ্যা হবে। চল, কেবিনে নীল আলো জ্বেলে তোমার গল্প শুনব।

—একটা অনুরোধ করলে রাখবে?

—বল। যা বলবে আমি সব করব।

—আমাকে ভায়োলীন বাজিয়ে শোনাবে ?

—শোনাব। কেবিনে চল।

—কেবিনে নয় চেরী। এই বোট-ডেকে। খোলা আকাশের নীচে বসে।

—তাই হবে।

এখন রাত নামছে সমুদ্রে। ফরোয়ার্ডপিকে পাহারা দিতে দুজন জাহাজী চলে গেল। ব্রীজে পায়চারী করছেন মেজ মালোম। ওরা লাইফ-বোটের আড়ালে বসে আকাশ দেখল, নক্ষত্র দেখল। পরস্পর গল্প করতে করতে এক সময় ঘনিষ্ঠ হল এবং পরস্পর হাতে হাত রেখে সমুদ্রের গর্জন শুনল যেন যথার্থই কোন রাজপুত্র কোটালপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে·· ছুটছে। চেবী এ সময় গর্ভিণী তিমির মত উদগ্র আবেগে ছটফট করতে থাকল।

চেরী ভায়োলীন বাজাতে বাজাতে বলল, কেমন লাগছে সুমিত্র ?

শীতের নদীতে কাশফুলের রেণু উড়ছে। প্রজাপতি উড়ছে যেন এবং শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে নতুন বৌ। কলের গান বাজছে নৌকার পাটাতনে। তুটো ফুটফুটে ছেলেমেয়ে সাদা ফ্রক গায়ে তখন চরের কাশবনে প্রজাপতি খুঁজে বেড়াচ্ছে—টুপাতি চেরীর বেহালার বাজনা সুমিত্রের মনে সে রাতে এমন একটা ভাব সৃষ্টি করেছিল।

তারপর অধিক রাতে যখন পরস্পব বিদায় জানিয়েছিল কেবিনে—চেরী সুমিত্রের চোখ তুটোতে চুমু খেল যে চোখতুটো দীর্ঘকাল ধরে চেবীকে অনুসরণ করে ফিরছে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জাহাজীরা জমি দেখার চেষ্টা করল। আকাশের কিনারায় কোন দ্বীপ অথবা মাটির রেখা ভেসে উঠছে কি না দেখল। ওরা খবর পেয়েছে, জাহাজ বিকালে নোঙর ফেলবে। এবং রাতে পাইলট-জাহাজ এসে বন্দরে জাহাজ টেনে নেবে। সুতরাং জাহাজীরা মন দিয়ে কাজ করল, ডেকে ফল্কায়, অথবা ড্যারিকে। ফানেলে কেউ রঙ করল। চেরী একবার ডেকে বের হয়ে সকল কিছু দেখে কেবিনে ঢুকে গেছে। এবং সুমিত্র এই ভোরেও বাংকে পড়ে ঘুমোচ্ছে। কাপ্তান-বয় এল এ-সময়। ফোকসালে ঢুকে ডাকতে থাকল সুমিত্রকে।

সুমিত্র একটা বড় রকমের হাই তুলে বলল, তারপর চাচা, নতুন কিছু খবর আছে ?

—কাপ্তান যে আবার ডেকে পাঠিয়েছে।

সুমিত্র ব্রীজে গেলে কাপ্তান বলল, বিকালে পাইলট ধরবে জাহাজ। সুতরাং তখন থেকে তুমি আর চেরীর কেবিনে যাবে না। পাইলট-জাহাজে ওর আত্মীয়-স্বজন আসার কথা আছে।

—কিন্তু স্যার…।

—আমি সব বুঝি সুমিত্র। মনে রেখো, তুমি জাহাজী। কত বন্দরে কত ঘটনা ঘটবে। তোমাকে যে একটু দৃঢ় হতে হবে।

সুমিত্র ব্রীজের একপাশে দাঁড়িয়েছিল—আকাশ তেমনি পরিষ্কার। জাহাজীরা সকলেই বন্দরের জন্য উদগ্রীব। যত বন্দরের দিকে এগোচ্ছে জাহাজ, তত জাহাজীরা উৎফুল্ল হচ্ছে। সুমিত্রের মনে একটা দুঃসহ কালো মেঘের অন্ধকার নেমে আসতে থাকল। সে ধীরে ধীরে ব্রীজ থেকে নেমে এল। চেরীর কেবিন অতিক্রম করার সময় ইচ্ছা করেই আজ আর পোর্টহোলে চোখ তুলল না সে হাঁটতে হাঁটতে একসময় ক্লান্ত বোধ করল নিজেকে। ফোকসালে ঢুকে নিজের বাংকে চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

বুড়ো কাপ্তান বয় এসে সুমিত্রের পাশে বসল।

—কিছু খবর আছে চাচা?

—না। আমি বুঝি কেবল তোমার দুঃসংবাদই বয়ে আনছি?

—তেমন কথা কি আমি বলছি?

—কি জানি বাপু, কেবল খবর আর খবর!

—চেরী কি করছে চাচা?

—ছোট একটা বই সারাদিন ধরে পড়ছে।

—আমার কথা কিছু বলছিল?

—না।

সুমিত্র পাশ ফিরে শুল। কোন প্রশ্ন করার ইচ্ছা নাই। কেবল পড়ে পড়ে ঘুমোতে ইচ্ছা হচ্ছে। বন্দরে জাহাজ নোঙর করলে কোনো পাব্-এ ঢুকে মদ খাওয়ার শখ হচ্ছে।

বিকেলে সুমিত্র উপরে উঠে গেল। অ্যাঙ্কটার-পিকের রেলিঙে ভর করে দাঁড়াল। দূর সমুদ্রে পাইলট-জাহাজটা যেন উড়ে চলে আসছে। এ-সময় চেরীকে দেখার প্রত্যাশা করল সুমিত্র। চেরী ওর আত্মীয়ের জন্য গ্যাঙওয়েতে অপেক্ষা করবে। অথচ চেরী নেই। চেরী এখনও কেবিনে পড়ে আছে। সুমিত্র দেখল

পাইলট-জাহাজ থেকে ওর আত্মীয়া—পিসি এবং সেই যুবক উঠে আসছে। হাতে বড় বড় দুটো গোলাপের কুঁড়ি। পাইলট সকলের শেষে উঠে এল। কাপ্তান ওদের সকলকে সঙ্গে করে অ্যালওয়েতে ঢুকে গেলেন। সুমিত্র এই সব দেখে কোন দুঃখবোধের জন্য একটা দীর্ঘশ্বাসকে সঞ্চিত রাখল।

সুমিত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপ্তান-বয় এবং মেসরুম-মেটের সব কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। পাশাপাশি অন্যান্য জাহাজীরাও এসে ভীড় করেছে। জাহাজীরা সুমিত্রকে কোন প্রশ্ন করছে না। এই সব ঘটনা ওদের সকলকেই অল্পবিস্তর দুঃখ দিচ্ছে। তখন ওরা সকলেই দেখল চেরী এবং ওরা দুজন, কাপ্তান, বড় মিস্ত্রী, পাইলট—ডেক ধরে হাঁটছে। সুমিত্র তাড়াতাড়ি জাহাজীদের ভিতর নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলল। সে চেরীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, চেরী সমুদ্র-যাত্রায় যেন ভয়ানক দুর্বল। এখন ওরা পরস্পর বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছে। ওরা নেমে গেল। সুমিত্র চেরীকে দেখতে পাচ্ছে না এখন। সে ফের নীচে নেমে বাংকে শুয়ে পড়ল।

চেরী চোখ তুলে এই জাহাজের ডেকে কিছু অন্বেষণ করতে গিয়ে গলায় এক দুঃসহ আবেগের কান্না অনুভব করল—কোথাও কোন অমৃতের চিহ্ন নেই। চোখদুটো সজল হতে হতে এক রুদ্ধ আবেগে চেরী ভেঙে পড়ল। এই ঘটনায় প্রিয়জনেরা উদ্বিগ্ন, ভাবল, শারীরিক কুশলে নেই চেরী; ভাবল, দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার পর প্রিয়জন দর্শনে কোন পরিচিত আবেগের জন্ম হচ্ছে শরীরে। কাপ্তান নিজেও এই বিচ্ছেদটুকু লালন করতে পারলেন না। তিনি ইচ্ছা করে পাইলটের সঙ্গে জাহাজ-সংক্রান্ত কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। কাপ্তান-বয় যখন বখশিশ নিয়ে উঠে আসছিল, চেরী সন্তর্পণে তাকে কাছে ডাকল। একটি চিরকুট দিল, গোলাপের কুঁড়িদুটো দিল, অথচ কোন নির্দেশ দিল না! তারপর চেরী পাইলট-জাহাজের পাটাতনে নেমে ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে মুহ্যমান। কিছুই এখন সে দেখতে পাচ্ছে না যেন, যেন এক রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটে ছুটে সমুদ্র অতিক্রম করছে এবং হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে আর পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তাই ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে চেরীর দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে।

কাপ্তান-বয় ফোকসালে ঢুকে বলল, এই নাও তোমার বকশিশ। ব'লে, গোলাপের কুঁড়ি এবং চিরকুটটি পাশে রাখল।

সুমিত্র বলল, পাইলট-জাহাজটা কতদূর গেছে?

—অনেক দূর।

সুমিত্র এবার চিরকুটটি পড়ল।

—যখন আমি বুড়ো হব সুমিত্র, যখন নাতি-নাতনিদের নিয়ে সমুদ্রের ধারে রূপকথার গল্প করব, তখন বলব ভারতবর্ষের সেই রূপকথার রাজপুত্র সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে কাকাতিয়া দ্বীপের রাজকন্যাকে খুঁজতে বের হয়েছিল। বলব, ঘোড়ায় চড়ে নয়, রথে চড়ে নয়, জাহাজে চড়ে। বলব, কাকাতিয়া দ্বীপের রাজকন্যাকে খুঁজে বের করেছিল, ভালবেসেছিল, সোনার কাঠি রুপোর কাঠি নিয়ে হাত বদলেছিল, কিন্তু রুপোর কাঠি ইচ্ছা করেই শিয়রে রাখার চেষ্টা করেনি।

শেষে তার কোন এক প্রিয় কবির দুটো লাইন লিখেছে,

—Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad.

সুমিত্র উপরে উঠে রেলিঙে ভর করে দাঁড়াল। দূরে পাইলট-সিপ অস্পষ্ট। ক্রমশ তীরের দিকে চলে যাচ্ছে। মনে মনে সেই লাইন দুটো আবৃত্তি করতে গিয়ে বুঝল, পৃথিবী অমৃতময়। চেরী অমৃতময়। দুঃখ এবং বেদনার কিছুই নেই। পিছনে এ সময় কার হাতের স্পর্শে সে ঘুরে দেখল কাপ্তান ওর পিঠে হাত রেখেছেন। বলছেন, আমার কেবিনে এস সুমিত্র। আজ আমি তোমাকে খৃষ্টের গল্প শোনাব।

চার

অবনীভূষণ বিজন এবং সুমিত্রের দীর্ঘদিন জাহাজে কেটে গেছে। অবনীভূষণ এখন প্রৌঢ়। বিজন সুমিত্র উত্তরত্রিশের যুবক। ওবা সকবে সকরে ক্রমশঃ এক প্রাচীন নাবিকের গন্ধ মেখে বন্দব থেকে বন্দরে, এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে এবং এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে ঘুরেছে। তারপর একই জাহাজে ওরা তিনজন একদা দূর সমুদ্র যাত্রায় বেব হয়েছিল। সে রাতও তুষার ঝড়ের রাত ছিল। সে ঘটনার সাথী অবনীভূষণ ছিল, বিজন ছিল এবং সুমিত্র ছিল। শুধু এ-ঘটনা অথবা কাহিনী একা এক অবনীভূষণের থাকছে না, বিজনেরও থাকছে না, এমন কি সুমিত্রেরও নয়। এ-ঘটনা অথবা কাহিনী ওদের সকলেব এবং সকল মানুষেব।

ফোকসালে সকলেই প্রায় ঘুমোচ্ছিল। কারণ দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর এই বন্দরের আলো-ঘর-বাতি সবই কেমন মুহ্যমান এবং তুষার ঝড হচ্ছে। সুতরাং জাহাজীরা বন্দর দেখে খুশী হতে পারল না। ওরা ডেকে পায়চারী করতে করতে বন্দরের গল্প করল না। ওরা শীতে অবসন্ন, ওরা কম্বল মুড়ি দিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকল।

বিজন গ্যাঙওয়ের পথ ধরে ফিরছিল। গ্যাঙওয়েতে তুষার ঝডটা মুখোমুখি লাগছে। সুতরাং সে হাঁটতে হাঁটতে চীফ্ কুকের গ্যালীতে চলে এল। হাত পা সেঁকল এবং চা করে আবার সেই শীতের রাজ্যে ঢুকে জাহাজটাকে পাহারা দেবার সময় দেখল, দূরে কোথাও কোন আলোর রেখা ফুটে উঠছে না। তুষার ঝড়ের জন্য সব কেমন অন্ধকারময়। বসে বসে সে ঝড়ের শব্দ শুনল, সমুদ্র দূরে গর্জন করছে। জাহাজটা নড়ছিল। যেন জাহাজটা হাসিল ছিঁড়ে এবার ছুটবে অথবা জাহাজের শরীরে এক রকমের শব্দ, যা বিজনকে ভীত সন্ত্রস্ত ক'রে তুলছে। মাস্টের আলোগুলি দুলছিল—সে দেখতে পেল। বন্দরের আলোগুলো অস্পষ্ট, বরফের কুচি ওদের অস্পষ্ট করে রেখেছে। সে হাতের দস্তানাটা এবার আরও টেনে দিল।

নীচেও কোন লোক চলাচল করছে না। ক্রেনগুলো দৈত্যের মত এই জেটির সকলকে তুষার ঝড়ের ভিতর পাহারা দিচ্ছে। উইংসের আলো জ্বলছে না। শুধু জাহাজটা নডছিল। এতদিনের এই সমুদ্র-যাত্রা এবং প্রপেলারের শব্দ, এনজিন রুমের শব্দ তাবপর সমুদ্রের ঢেউ—সকলই কেমন নিঃশেষ হয়ে গেছে। সকলই কেমন রাত দুপুরে মাঠের নির্জনতায় ডুবে যাওয়ার মত। সে এবার ধীরে ধীরে উঠল। বসে থাকলেই শীত বেশী করছে। সে পায়চারী করতে লাগল। এবং ডেক পার হলে গ্যালী, পরে সব জাহাজীদের ফোকসাল। বিজন এতদূর পর্যন্ত হেঁটে গেল না। সে পোর্টহালের কাঁচের ভিতর দিয়ে বড় মিস্ত্রীর কেবিন দেখল। ওর ঘরে নীল লাল মিশ্রিত এক ধরনের আলো। বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণ এত রাতেও একটা বই পড়ছেন। অশ্লীল সব বই এবং নগ্ন সব ছবি দেয়ালে দেয়ালে।‍ বড মিস্ত্রী জাহাজ নোঙর করলে ঘন ঘন রেলিঙে ভর কবে দূরে কিছু যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন। প্রত্যাশা যেন কিছুব। অন্ধকার জেটিতে কিছু আবিষ্কারের জন্য পাগল। বিজন বলেছিল, স্যাব, বন্দরে কেউ নেই। খালি।

—কেউ নেই! কথাটা তিনি বিশ্বাস কবতে পাবছিলেন না।

—যথার্থই কেউ নেই স্যাব।

অবনীভূষণ চোখের চশমা খুলে রুমালে মুছতে মুছতে কথাটা অবিশ্বাস করার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ডেসীব আসার কথা অথচ ডেসী এল না। তিনি বিড বিড় করে তুষার ঝড়কে ধিক্কাব দিচ্ছিলেন! ডেসী এলে এই জাহাজ মনোরম…বড় কামুক গন্ধ এই জাহাজেব অলি গলিতে, নোনা জলের ঘন রঙ অথবা সমস্ত বিস্বাদ সমুদ্রের—ডেসী একা সামলাত। ডেসী এলে ওর ঘরে রাত যাপনের প্রশ্ন উঠত। অন্যান্য সফরেব মত বন্দরের দিনগুলো নির্দিষ্ট ঘরে সুখ পেত। এত দুঃখময় এই জাহাজ, জাহাজী জীবন এমন ন্যক্কারজনক এবং বেশ্যা মেয়েরা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হচ্ছে না, কি অনাবশ্যক দিন—শুধু তুষার ঝড়, বরফের কুচি উড়ছে আর রাত ব'লে, আলো কম ব'লে সমস্ত শহরটা অদ্ভুত রহস্যময় ঠেকছে। দূরে ইতস্তত কোন কুকুরের চীৎকার, গীর্জাতে ঘণ্টা বাজছে এবং এম্বুলেন্সের গাড়ী যাচ্ছে, জেটিতে একটা মাতাল পুরুষকে পর্যন্ত দেখা গেল না। কি অবিশ্বাস্য ভাবে নসিব বদলা নিতে সুরু করেছে। ডেসীর জন্য এই প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে বড় মিস্ত্রি রেলিঙে ভর করে প্রতীক্ষা করছিলেন। উত্তেজনায় শরীর অধীর হচ্ছিল। কারণ উত্তর অঞ্চলের অন্য বন্দরে ডেসীর চিঠি ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল—চীফ, জাহাজ তোমার ভিড়বে রাতে। যত প্রতিকূল অবস্থাই হোক না,

আমি উপস্থিত থাকব জেটিতে। তোমাকে নিয়ে ঘরে ফিরব। চিঠিতে সে ওর বেড়ালের জন্য বড় মিস্ত্রীকে কড্ মাছের চর্বি আনতে লিখেছিল।

বড়মিস্ত্রী অশ্লীল পুস্তকের ভিতর থেকে ডেসীর তলপেটের গন্ধ নিচ্ছিলেন যেন। এবং এ সময়ে পোর্টহোলে প্রতিবিম্ব পড়তেই তিনি প্রশ্ন করলেন, কে ?

—আমি স্যার, সুখানী। বিজন বলল।

অবনীভূষণ শান্ত গলায় বললেন, সুখানী আমাকে একটু চা খাওয়াবে ভাই। রাত অনেক হল। ঘুম আসছে না। আর এই রাতে বয়দের জ্বালাতন করতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

বিজন ফের চীফ্‌কুকের গ্যালীতে ঢুকে গেল। চা করল। তারপর চীফ্ এনজিনিয়ারের দরজাতে দাঁড়িয়ে ডাকল, আপনার চা এনেছি স্যার। দরজা খুলুন।

বড় মিস্ত্রী ভিতর থেকে বললেন, দরজা খোলাই আছে, ভিতরে এস।

বিজন দরজার ভিতর ঢুকে দেখল, নীল কাঁচের গ্লাসে এখনও লীকার পড়ে আছে। সে টিপয়তে চা রাখল। তারপর বের হতে শুনল, তিনি ডাকলেন, সুখানী। সুখানী কাছে গেলে বললেন, কোথাও কেউ নেই ?

—না স্যার।

—কোন ঘরে কেউ আসেনি ?

—না স্যার।

—যথার্থ কথা বলছ ?

—হ্যাঁ স্যার। কোন কেবিনে কেউ আসে নি ?

—কাপ্তানের ঘর ?

—ঘর ফাঁকা স্যার।

—ঠিক আছে, যাও। বড় সাব অবনীভূষণ বসে বসে চা খেলেন। রাত এখন কত ? কাঁচের ঘরে ঘড়ির কাঁটা নড়তে দেখলেন। রাত বারটা বেজে গেছে। সমুদ্রে এবার এক নাগাড়ে কতদিন ? দশমাসের উপর হবে। হোম থেকে কবে বের হয়েছেন—কতকাল আগের যেন সেই সব দিন, সেই সব বন্দর এবং স্ত্রীর কালো দুটো চোখ এখন পোর্টহোলের কাঁচে দৃশ্যমান। শরীরে তার যৌবন নিঃশেষ অথচ প্রেমটুকু আলোক-উজ্জ্বল দিনের মত। সবই তিনি স্মরণ করতে পারছেন অথচ ডেসী এল না—ডেক ছাদে কার পায়ের শব্দ। তিনি এবার কম্বল টেনে শুয়ে পড়লেন। কারণ বাইরে তখনও তুষার ঝড় হচ্ছে।

বিজন তুষার ঝড়ের জন্য চীফ্ ষ্টুয়াডে'র কেবিন এবং অ্যালওয়ের ফাঁকটাতে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকল। এই ফাঁকটুকু থেকে গ্যাঙওয়ে স্পষ্ট। ওর শরীরে এখন ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছেনা। জাহাজ কতদিন পর বন্দর পেল অথচ দুর্যোগের জন্য জাহাজীরা কিনারায় নামতে পারছে না। কাল সকালে এবং অপরাহ্ন বেলায় যখন জাহাজীরা একে একে জাহাজ খালি করে বন্দরে রমণী সন্দর্শনের জন্য নেমে যাবে, যখন ওরা কিংস পার্কে অথবা সান্তাক্লজেব চুড়ায় উঠে শহর দেখবে তখন··· তখন বিজনের বড় ইচ্ছা এই ঠাণ্ডায় কোন যুবতীর উত্তাপ, কাপ্তানেব ইচ্ছা কিছু উত্তাপ···তখন বিজন পাশেব কেবিনে বড পরিচিত শব্দ শুনল। শব্দটা মধুর। শব্দটা ভীষণ উত্তেজনাময়—সে স্থির থাকতে পারছেনা। সে ধীবে ধীরে দরজায় কান পেতে শুনতে চাইল—কিছুই শোনা যাচ্ছেনা, অস্পষ্ট। সে এ সময় অধীর যুবকের মত দেযালে হাত রাখল।

বিজন এই ফাঁকটুকুতে দাঁডিযে শান্তি পাচ্ছেনা। পোর্টহোলের কাঁচে মুখ রাখা যাচ্ছে না। লোহার প্লেটে বন্ধ কাঁচ সর্বত্র এক গোপনীয়তা রক্ষা কবছে। সে এই কেবিনের একটা রন্ধ্রপথ খোঁজার জন্য খুব সন্তর্পণে দেয়াল হাতড়ে বেড়াতে লাগল। দরজার পাল্লা ধীরে ধীরে একটু ফাঁক করতে গিয়ে বুঝল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতরে এবং বাইরে আলো ব'লে বিজন বুঝতে পারছে না, বিজন এবার বাইরের আলো নিভিয়ে এক ঘন অন্ধকার সৃষ্টি করতেই দেখল পোর্টহোলের উপরে যেখানে স্টীম পাইপ আছে তার পাশে গোলাকার ছিদ্রপথ। সে তাড়াতাড়ি টুলটা গ্যাঙওয়ে থেকে নিয়ে এসে মই বেয়ে ওঠার মত উপরে উঠল। মুখটা কিঞ্চিৎ ভিতরে ঢুকিয়ে দেখল ওরা দুজনই পাশাপাশি শুয়ে আছে। ওবা উভয়ে রাতের প্রথম প্রহরে বোধহয় যৌন যন্ত্রণায় মুখর ছিল। এখন শান্ত। এখন ঘর এবং ঘরণীর মত ওদের মুখচ্ছবি। কোন অপরাধবোধের চিহ্ন নেই মুখে। যেন কত দীর্ঘদিনের আলাপ, যেন কত দীর্ঘদিনের প্রেম এবং সহিষ্ণুতা ভয়কে গভীর শান্তিতে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিজন, কম্বলের নীচে ওদের শরীর নগ্ন এমন এক ছবির কথা চিন্তা করে টুল থেকে নেমে পডল। ওর ওয়াচ শেষ হবে এখন। সুতরাং এই নগ্নতা দর্শনে তৃপ্তি নেই, এতে শুধু উত্তেজনা বাড়ে। মেয়েটির রুক্ষ চুলে সুমিত্রের মোটা শক্ত হাত। অন্য হাতটি কম্বলের নীচে নড়ছিল···কম্বলের নীচে মেয়েটির তলপেটের কাছাকাছি কোথাও ইঁদুরের মত ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে অথবা যেন শরীরের সকল কুশল চিন্তার কথা ভুলে সারারাত যৌন সংযোগে মগ্ন থাকলে সকল সুখের আকর···বিজন আর ভাবতে পারল না, সে তাড়াতাড়ি টুলটা

হাতে নিয়ে কেবিনের পাশ থেকে সরে গিয়ে কিঞ্চিৎ ছুট দিল। সে ছুটতে ছুটতে বড় মিস্ত্রীর কেবিনের পাশে এসে দাঁড়াল এবং বলতে চাইল, স্যার আমি…আমি যথার্থ কথা বলিনি।

এখন বড মিস্ত্রী দরজা খুললে বলতে হবে ষ্টুয়ার্ডের ঘরে চটুল রমণী ষ্টুয়ার্ডকে পতিব্রতা ভাযার মত প্রেম এবং সুখ বিতরণ করছে। সুতরাং কাল ভোরে আপনার দরজার পাশ দিয়ে একজন চটুল রমণী উঁচু হিলের জুতা পরে এবং নিতম্বে রস সঞ্চার করতে করতে জেটিতে নেমে যাবে তারপর আমি অভিযোগের করুণ বিষোদ্গারে জর্জরিত হব—সে ঠিক নয় স্যার। সুতবাং সকল ঘটনার কথা খুলে বলাই ভাল।

সে ডাকল, সাব।

—কে বাইরে? কম্বলের ভিতর থেকেই বড মিস্ত্রী চোখ পিট পিট করে তাকাতে থাকলেন।

—আমি স্যার, সুখানী।

—ঘরে এস। শরীরটা বড খারাপ বোধ হচ্ছে।

বিজন দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল এবং বলল, স্যার আমি যথার্থ কথা বলিনি।

—যথার্থ কথা বলনি! তবে আস্তে বল। দরজাটা ভেজিয়ে দাও। বড় ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। বাইরের তুষার ঝড়টা মন্ট্রিলের দিকে যাচ্ছে না ত, অথবা ভ্যান্‌কুবার থেকে জাহাজ আসার কথা ছিল—ওরা কিছু মেয়ে আমদানী করতে পারে হয়ত।

—না স্যার। সে সব কথা আমি বলছি না। আমাদের জাহাজে এই ঝড়ের মধ্যেও একজন মেয়ে উঠে গেছে। মেয়েটা চীফ্ ষ্টুয়ার্ডের কেবিনে আছে।

এমত কথায় বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণের চোখ গোল গোল হয়ে উঠল। ওঁর বাসি দাড়িগুলি লম্বা হয়ে গেল যেন। তিনি বললেন, এই ঝড়ের রাতে!

—আজ্ঞে স্যার।

—ভাল কথা নয়।

—নয় স্যার।

—তুমি দেখলে?

—আজ্ঞে দেখলাম স্যার। টুলের উপর উঠে উঁকি দিয়ে দেখতে হল ঘুলঘুলিতে।

—ওরা কি করছে? অবনীভূষণ ঢোক গেলার মত মুখ করে থাকলেন।

বিজনকে কিঞ্চিৎ লজ্জিত দেখাচ্ছে। সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাই স্যার।

—তুমিতো খুব স্বার্থপর লোক হে। আমি একটু দেখতে যাব ভাবছি আর তুমি কিনা বলছ আমাকে একা ফেলে চলে যাবে।

—আমার ওয়াচ শেষ হতে দেরী নেই স্যার।

—আরে চল। বলে তিনি কম্বল ছেড়ে উঠে পড়লেন। ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে বললেন, দেখা যাক না ঘটনাটা কেমন ভাবে ঘটছে। বুঝলে সুখানী, ডেসী নামে একটি মেয়ে আমার কেবিনে আসার কথা ছিল। সে-জন্য আমার ঘুম আসছে না। আর ডেসী মেয়ের মত মেয়ে বটে। ডেসী বেশ্যা মেয়েদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। সে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেতে পারে। এক এক রাতে পাঁচটা সাতটা লোককে সে হজম করতে পারে।

—তাই বুঝি স্যার। সুখানীকে ভয়ানকভাবে এ সময় বোকা বোকা লাগছিল।

—একে দেখে কেমন মনে হল?

—স্যার ওরা এখন শুয়ে আছে। তবে ঘুমোয় নি। ঘুমোলে, কম্বলের নীচে স্যার ইঁদুর নাচত না।

রাত গভীর এবং ঝড়ের গতি বাড়ছে। অ্যালওয়ের দরজা বন্ধ। ঝড়টা ভিতরে ঢুকতে পারছে না। অথচ বাইরে ভয়ঙ্কর শব্দে যেন আকাশ ফেটে পড়ছে। যেন জাহাজের মাস্তুল এবার ভেঙ্গে পড়বে। ওরা দুজনে সন্তর্পণে এন্‌জিন রুমের পাশ দিয়ে হেঁটে চলল, উভয়ে হেঁটে যেতে থাকল। পাশের কেবিনগুলোর দরজা বন্ধ। অবনীভূষণ খুব মদ টেনেছিল বলে গতিতে শ্লথ ভাব। অথবা বয়সের ভারে ঠিক মত যেন হেঁটে যেতে পারছেন না। চীফ্‌ বালকেড্‌ ধরে ধরে হাঁটছিলেন। শরীরের ওজন ভয়ানক, হাত পা শক্ত এবং নিবিড় এক মদিরতা ওঁকে এই গতির ভিতর আচ্ছন্ন করে রাখতে চাইছে।

বড় মিস্ত্রী চলতে চলতে খুব আস্তে এবং জড়ানো গলায় বললেন, আমার শরীরটা কিঞ্চিৎ মোটা হয়ে গেছে। এতবার এন্‌জিন রুমে নামা-ওঠা করি তবু পেটটা নীচু হচ্ছে না। আপদ।

—হ্যাঁ স্যার, আপদ!

—পেট মোটা থাকলে এইসব ঘটনায় আনন্দ পাওয়া যায় না। তৃপ্তি নেই। বিজন ভাবল, লোকটা মদ খেয়েছে বলে এত কথা বলছে। কারণ সুখানী

আনও দিনের বেলাতে বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণ গুমড়ো মুখো। কোন কথা নেই—তিনি চুপচাপ এন্‌জিনে নেমে যান অথবা বাংকে শুয়ে শুয়ে অশ্লীল সব বই পড়েন। অথবা ব্রীজের নীচে ছোট একটা ডেক চেয়াবে বসে পাইপ টানতে টানতে দূরের বন্দব, পাইন গাছ এবং সমুদ্র দেখেন। কোন কথা বলেন না, কোন হাসি-ঠাট্টা কবেন না জাহাজীদের সঙ্গে। তখন তিনি যথার্থই বড় মিস্ত্রী জাহাজের।

বিজন একটু থেমে বলল, স্যাব টুলটা নিয়ে আসি। টুলটা না নিলে ঘুলঘুলিতে মুখ বাখা যাবে না।

কেবিনেব আলো এবং একটি ক্যালেণ্ডাবেব পাতায় সুন্দর এক হ্রদেব দৃশ্য অথবা অ্যালওয়ে পাব হয়ে অন্য অফিসাবদেব কেবিন ষ্টোব রুম এবং ডাইনিং হল অতিক্রম করে চীফ্ ষ্টুয়ার্ডের ঘব—বাংকে বেশ্যা বমণীব সুন্দর চোখ, সবই কৌতূহলোদ্দীপক। সে আগে আগে চলতে থাকল। কোন কথা বলল না। অন্য কেবিনে যারা ঘুমিযে আছে তাদেব ঘুমেব ব্যাঘাত ঘটাল না।

বিজন ফিস ফিস কবে বলল, আমি এসে গেছি।

সে টুলটা বালকেডেব পাশে সন্তর্পণে রাখল। বলল, এবাবে উঠুন স্যার। সে আঙুল দিয়ে ঘুলঘুলি নির্দেশ কবে দিল।

—আমাকে উঠতে সাহায্য কব। বড মিস্ত্রী অবনীভূষণের শরীর ভয়ানক রকমেব মাতাল। তিনি কুকুরের মত উত্তেজনাতে হাঁসফাঁস করছেন।

বিজন অ্যালওয়েব আলোটা নিভিয়ে দিল। বাইবে ঝড এবং ঝড়ের গতি বাডছে। সুতবাং ওদের কথাবার্তার শব্দ ঝড়ো হাওয়াব সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বড় মিস্ত্রী ফস করে লাইটার জ্বালিয়ে একটা চুরুট ধরালেন। ওদের মুখ এখন বীভৎস রকম দেখাচ্ছে।

বিজন বলল, স্যার এক কাজ করবেন?

—এখন কোন কাজের কথা নয়, সুখানী তুমি বড বেশী কথা বল।

—বিজন কোন জবাব দিল না অথচ মনে মনে গাল দিল।

—দেখো সুখানী আমাব ভাড়া করা স্ত্রী যদি কাল জাহাজে আসে, তুমি আবার এ সব ঘটনার কথা বলে দিও না। মেয়েটি খুব সুন্দর। বছর পাঁচেক আগে নাইট ক্লাবে ওর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বুঝলে সুখানী, তুমি তো মদ খাওনা অথচ মেয়েমানুষের শরীর পেলে পেটুকের মত কথাবার্তা বল।

বিজন বলল, স্যার আপনি আমার ওপরওয়ালার ওপরওয়ালা। আপনার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে ভয় হয়।

—সুখানী, আবার তোমার সেই বেশী কথা।

সুতরাং ভয়ে ভয়ে বিজন টুলটা ধরে রাখল। অ্যালওয়ে অন্ধকার বলে ওরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে না।

—আমাকে টুলে উঠতে সাহায্য কর। ফের ধমক দিলেন বড় মিস্ত্রী।

চীফ্ টুলের উপর উঠে সেই ঘুলঘুলিতে চোখ রাখতে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে তিনি এই হাল্কা টুলে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবেন না। শরীর টলছিল। তিনি একটি শক্ত টুল অন্বেষণ করলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, শক্ত টুল নেই সুখানী?

—আছে স্যার। কসপের ঘরে একটা শক্ত টুল আছে। কসপকে ডেকে তুলব?

—না দরকার নেই। বেশী হৈ চৈ ক'র না, সকলে কুকুরের মত এখানে এসে ভিড় করবে। এবং কাপ্তান জানলে রাগ করবেন।

বড় মিস্ত্রী এবার টুল থেকে নেমে পড়লেন। ফিস ফিস করে করে বললেন, বরং তুমি দেখো ওরা কি করছে। যা দেখবে, সব বলবে। কিছু লুকোলে আমি ধরতে পারব।

বিজন টুলের উপর উঠে ঘুলঘুলিতে চোখ রাখল। গরম হাওয়া ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে। ষ্টুয়ার্ড এবং মেয়েটি সন্তর্পণে এখন কি যেন লক্ষ্য করছে। খরগোসের মত ভীত চোখ নিয়ে কি যেন দেখছে। ওরা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। ওদের শরীরে কোন আবরণ নেই। ওরা পরস্পর কি বলছে ধরতে পারছে না বিজন।

বিজনকে কিছু বলতে না দেখে বড় মিস্ত্রী ক্ষেপে গেলেন।—সুখানী তুমি নেমকহারাম, পাজি। তিনি দাতে দাঁত চেপে বলছেন।—তুমি নিজে সব দেখছ অথচ আমাকে কিছু বলছ না।

—স্যার ওরা এখন উঠে বসল।

—তারপর সুখানী।..

—ওরা বোধহয় টের পেয়েছে।

—মেয়েটি দেখতে কেমন সুখানী?

—রোগা স্যার। মেয়েটি এখন আবার কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল।

চীফ ষ্টুয়ার্ড তখন ভিতরে মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বলছিল, মর্লিন, কারা যেন বাইরে কথা বলছে? যদি টের পায় তবে নিশ্চয়ই হামলা করবে।

মর্লিন উঠতে চাইল না। বলল, শরীরে ভয়ানক কষ্ট। বাইরে ঝড় নতুবা চলে যেতাম, সুমিত্র।

সুমিত্র খুব দুঃখের সঙ্গে একটা হাত ওর স্তনের নীচে রাখল এবং কাছে টানল। বলল, অ্যালওয়েতে এখনও যেন কারা চলাফেরা করছে। কথা বলছে। অনেকক্ষণ থেকে এটা হচ্ছে। দরজা খুলে দেখব ?

—এই সুখানী, হারামজাদা। তুমি আমাকে বাগে পেয়ে খুব কলা দেখাচ্ছ হে।

—স্যার ওরা কিছু করছে না।

—নিশ্চয় করছে। তুমি আমায় মিথ্যা কথা বলছ।

ভেতরে মেয়েটি বলল, না আমার শরীর ভাল নেই সুমিত্র। ঠাণ্ডায় জমে গেছিলাম। [illegible] খুব আমাকে উত্তাপ দিচ্ছে। আমি আজ আর একটি লোককেও সামলাতে পারব না। সে অন্য পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল। চীফ্ ষ্টুয়ার্ড সুমিত্র হাঁটু ভাঁজ করে রাখল মেয়েটার এবং নিতম্বের নীচে হাত রেখে ঘন হয়ে শুতে চাইল। অথচ শান্তি পাচ্ছিল না যেন। সে ফের উঠে বসল। পোর্টহোল খুলে সমুদ্রের গর্জন শুনতে চাইল। ওর শরীর নগ্ন। ঠাণ্ডা হাওয়া ওকে কাঁপিয়ে তুলছে। ষ্টুয়ার্ড তাড়াতাড়ি রাতের পোষাক পরে বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে শুনল, বাইরে চেঁচামেচি সুতরাং সে একটা হাই তোলার চেষ্টা করল।

—স্যার আমি মিথ্যা বলছি না।

—তুমি আলবৎ বলছ। খুব আস্তে অথচ ক্ষুণ্ণ গলায় বললেন বড় মিস্ত্রী।

বিজন মরীয়া হয়ে বলল, বলেছি ত বেশ করেছি।

— বেশ করেছ। তুমি বেশ করেছ, আচ্ছা...এইটুকু বলে বড়মিস্ত্রী কড়া নাড়লেন, ষ্টুয়ার্ড দরজা খোল। আমি বড় মিস্ত্রী। কিন্তু ভিতর থেকে কোন শব্দ হল না বলে তিনি ফের বললেন—আমি। ষ্টুয়ার্ড আমি কোন হামলা করব না। তুমি বললে আমি তিন সত্য করতে পারি।

তুষার ঝড় সকলকেই নিঃসঙ্গ করে রেখেছে। দীর্ঘদিনের সমুদ্র-যাত্রা অতিক্রম করার পর এই বন্দর, বন্দরে আলো অথবা কোন রাস্তার নীচে বেশ্যা রমণীর আপ্যায়ন ওদের জন্য প্রতীক্ষা করল না। বড় সাহেবের ডেসী আসে নি, সুখানী বাইরে গিয়ে একটু মদ গিলতে পারে নি অথবা রমণীর মুখ দর্শন যেন কতকাল পর, কত দীর্ঘ সময় ধরে ওদের নোনাজলের চিহ্ন মুখে—রমণীর নরম নরম সুখ এবং চাপ চাপ আস্বাদন সবই কোন অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত।

এইদিকের কেবিনগুলি ফাঁকা। ষ্টুয়ার্ডের একমাত্র কেবিন. পরে ডাইনিং হল, সামনে ছোট ঘর অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য, ডেকের নীচে মাংসের ঘর তারপর

সোজা সব ফাঁকা কেবিন, কারণ এই শীতের অঞ্চলে কোন যাত্রী আসে নি। বারোটি যাত্রী কেবিনে সুতরাং কোন মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ষ্টুয়ার্ড এ সব জেনেই মেয়েটিকে অন্ধকার জেটির উপর থেকে তুলে সিঁড়ি ধরে জাহাজে নিয়ে এসেছিল—কারণ সে জেটি থেকে তখন দেখেছে গ্যাঙওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার নেই, সুতরাং এটাই উপযুক্ত সময়। সে সময়ের সদ্ব্যবহার করেও কোন ফল লাভ করতে পারল না, এত সতর্কতা তবু সব কেমন ফাঁস হয়ে গেল! চীৎকার এবং হামলা আরও বেশী হতে পারে ভেবে সে দরজা খুলে দিল। ভয়ানক শীত এই অ্যালওয়েরে অন্ধকারে। কেবিনের আলোতে সে বড় মিস্ত্রীর পাথরের মত চোখ দুটো দেখল। এইসময় চীফ ষ্টুয়ার্ডকে অদ্ভুত রকমের তোতলামিতে পেয়ে বসল।

বড় মিস্ত্রী কেবিনের ভিতর ঢুকে গেলেন। বললেন, আমি তিন সত্য করছি ষ্টুয়ার্ড, আমি কোন হামলা করব না। আমাকে একটু সুখ দাও। আমি তবেই চলে যাব। কেমন বেহায়া এবং নিলর্জ্জ ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেন বড় মিস্ত্রী। তিনি ধমকের সুরে বিজনকে ডাকলেন, এস। নচ্ছার সব জাহাজী। এটা তোমার বাড়ী নয় সুখানী! এখানে মা বাবা ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে আসবে না, এস।

সুখানী ভালছেলের মত বড় মিস্ত্রীকে অনুসরণ করল। সে কেবিনের ভিতর ঢুকল না। সে দরজার একটা পাল্লা ধরে উঁকি দিল মাত্র। ষ্টুয়ার্ড সব কিছু দেখছে। ভয়ে ওর তোতলামি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। বড় মিস্ত্রীর চোখ দুটো চক চক করছে এবং হননের ইচ্ছাতে একাগ্র। জানোয়ারের মত উদগ্র লালসা মুখে, অবয়বে। সে দেখল, বড় মিস্ত্রী চেয়ার টেনে বসেছেন, দেয়ালে বিচিত্র সব নগ্ন ছবি এবং এই বাংকের অন্যপাশে মর্লিন—ওর কোমল ত্বকের গন্ধ অথবা মুরগীর মত নরম কলজের উত্তাপ বড় মিস্ত্রীকে এতটুকু অন্যমনস্ক করছে না। সে ঘরের ভিতর নিমন্ত্রিত অতিথির মত বসে থাকল।

মর্লিন কম্বলের ভিতর থেকে উঁকি দিল। ওর সোনালী চুল বালিশের উপর, ওর নীল চোখ শান্ত। বড় মিস্ত্রীর বিদঘুটে শরীর ক্রমশ পাশবিকতায় আচ্ছন্ন হচ্ছে। মর্লিন কম্বলের ভিতরে এ সব দেখে ভয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে। সে অন্য একটি মুখ দেখল দরজার পাশে। সে মনে মনে বড় মিস্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাইল, ম্যান আমি জানি তোমাকে নিয়ে কোন কোন ভঙ্গীতে ক্রীড়াচাতুর্য প্রদর্শন করলে তুমি দুবার, তিনবার অত্যধিক চারবার ..কিন্তু শরীর ভাল নেই, বড় কষ্ট এই শরীরে, শীতে শরীর মুখ বিবর্ণ এবং ভিতরে ভয়ানক যন্ত্রণায় ভুগছি। তুমি

পুলিশকের মত রেহাই দাও। এই দুর্যোগ যাক, বসন্ত আসুক—তখন তোমার কত টাকা আমার কত সুখ বিদ্যমান, দেখাব। অথচ মর্লিন কিছু বলতে পারছে না। ভয়ে ওর শরীর কেবল গুটিয়ে আসতে থাকল।

সুখানী দেখল, বড মিস্ত্রী কেমন পাগলের মত করছেন। পোষাক আল্গা করার সময় তিনি দরজা খোলা কি বন্ধ পর্যন্ত দেখছেন না। সুতরাং সুখানী নিজেই দরজাটা টেনে দিল।

বড় মিস্ত্রী দুটো শক্ত হাত ওর সোনালী চুলের ভিতর ঠেসে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পডলেন। তিনি মর্লিনের চুলের ভিতর মুখ গুঁজে দিলেন। মর্লিন মৃতপ্রায় পড়েছিল। বড় মিস্ত্রী কম্বলটা শরীর থেকে বাঁ হাতে ঠেলে দিলেন। ঠোঁট দুটো নীল, বিবর্ণ। ঠোঁট দুটো কামড়ে দেবার সময় দেখলেন, মর্লিন কেমন সাপের মত পিছলে যাচ্ছে। অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় বলছে, ম্যান আমাকে মেরে ফেল না। আমি আর পারছি না।

মর্লিনের মুখ থেকে তখন থুথু উঠছিল। বাইরে ঝড, মাস্টের আলোগুলো দুলছে। মেসরুমে বাতি জ্বলছিল। মনসুর আসবে এ সময়। ওর এখন ওয়াচ। মনসুরকে ডাকতে হবে। যতক্ষণ না ডাকবে ততক্ষণ মনসুর শুয়ে থাকবে। সুতরাং সুখানী বিরক্ত হচ্ছে। বড় বেশী সময় নিচ্ছে বড় মিস্ত্রী। সুখানী দরজা ঠেলে উঁকি দিতেই দেখল বড় মিস্ত্রী বড় বেশী বেহুঁস। সে ভিতরে ঢুকে পড়ল। মর্লিনের শরীর থেকে সুখানী বড় মিস্ত্রীকে শক্ত হাতে ঠেলে ফেলে দিল। তারপর টানতে টানতে দরজার বাইরে এসে বলল, আপনি দাঁড়ান। বেশী ইতরামি করলে ভাল হবে না। ব'লে, সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণ অসহায় পুরুষের মত ষ্টুয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখলে কাণ্ডটা, কাল আমি ওকে দেখব।

ষ্টুয়ার্ড বলল, বড দুর্বল স্যার। শীতে কষ্ট পাচ্ছিল। আমি জাহাজে তুলে এনেছি। টাকা ত মুফতে দেওয়া যায় না। তাই রয়ে সয়ে একটু সুখ নিচ্ছিলাম।

ওরা দুজনই চুপচাপ বালকেডে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল।

ষ্টুয়ার্ড অত্যন্ত বিচলিতভাবে কথা বলতে থাকল, স্যার এটা অত্যাচার হচ্ছে ওর উপর। একটা রুগ্ন মেয়েকে দীর্ঘসময় ধরে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

—তার জন্য আমি কি করতে পারি। ব'লে, তিনি অ্যালওয়েতে পায়চারী করতে থাকলেন। অন্ধকার অ্যালওয়েতে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শুধু

থেকে থেকে আগের মত সমুদ্রগর্জন ভেসে আসছে। তুষার ঝড়ের গতি কমছে কি বাড়ছে অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে বড় মিস্ত্রী টের করতে পারলেন না। তিনি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিরক্ত গলায় বললেন, সুখানী বড় দেরী করছে। ষ্টুয়ার্ডের দিকে এখন নজর বড় মিস্ত্রীর। ষ্টুয়ার্ড এখনও কিছু বলছে না।

—তোমার নিশ্চয়ই যেতে ইচ্ছা করছে ভিতরে?

—স্যাব আপনার কথার উপর আমার কথা বলা সাজে না।

বড় মিস্ত্রী ভাবলেন, এবার কড়া নাডবেন দরজার। কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। বিজনকে খুব বিব্রত দেখাচ্ছে। চোখ মুখ উদ্বিগ্ন। বলল, স্যার ঘরে মদ আছে? মেয়েটা কেমন করছে স্যাব! বড [illegible], একটু মদ দিলে হত।

সুমিত্র বলল, স্যার আমি আগেই বলেছি এত ধকল সে সহ্য করতে পারবে না।

বড় মিস্ত্রী চীৎকার করে বলতে চাইলেন, তুমি একটা অমানুষ, সুখানী। অথচ বলতে পারলেন না। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, তুমি একটা পশু, তুমি পশু সুখানী।

—স্যার বিশ্বাস করুন, আমি কিছু করি নি।

—কিছু কর নি!

—না স্যার, শুধু আদর করছিলাম। কিন্তু কেবল দেখছি মুখ থেকে ওর থুথু উঠছে সাদা সাদা ফেনার মত। আমি বার বার আলোতে মুখ দেখলাম। জল দিলাম খেতে। খেল। ফের ওরকম হতেই দরজা খুলে দিয়েছি। আপনারা আসুন।

ষ্টুয়ার্ড কথা বলতে পারছিল না। বড় মিস্ত্রী বিমূঢ়। নেশার রঙ মুছে যাচ্ছে এবং তিনি এই সময় সারিবদ্ধ উট দেখলেন, ওরা মরুভূমির উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সারিবদ্ধ উটের দলটা একটা নগ্ন মানুষকে উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শুধু। মানুষটার হাত পা বাঁধা। তিনি প্রায় চীৎকার দেবার ভঙ্গীতে বললেন, ওদিকের দরজা বন্ধ করে দাও। আলো নেভাও বাইরের। স্টোর থেকে মদ নিয়ে এস।

ওরা ভিতরে ঢুকে বাংকের পাশে দাঁড়াল। সবুজ গাউনটা পাশ থেকে তুলে [illegible]নের কোমর পর্যন্ত টেনে দেওয়া হল। সুখানী পায়ের দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে। [illegible]নের বড় বড় চোখ দুটো স্থির। বিবর্ণ। হাত দুটো বুকের উপর। মুখের [illegible] [illegible] গলে গেছে। সাদা এবং অদ্ভুত এক অবয়বের মুখ যা দেখলে

ভয় ভীতি ক্রমশ মানুষকে গ্রাস করে।

বড মিস্ত্রী বললেন, মর্লিন মরে যাচ্ছে স্থখানী।

ষ্টুয়ার্ড বলল, যথার্থই মরে যাচ্ছে মর্লিন?

বড মিস্ত্রী পুনরাবৃত্তি করলেন, মর্লিন মরে যাচ্ছে স্থখানী।

স্থখানী বলল, কোনো ডাক্তার ..?

—ও বাঁচবেনা। ডাক্তার ডাকলে সকলে ধরা পড়ে যাব।

ষ্টুয়ার্ড অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাল, স্যার আমরা ওকে মেরে ফেললাম।

বড মিস্ত্রী ধমক দিলেন, আস্তে কথা বল। এত বেশী বিহ্বল হবে না। পোর্টহোল খুলে দেখ ঝড়ের গতি কি রকম? এবং বড মিস্ত্রী এই নিশ্চিত মৃত্যু জেনে যেন বলতে চাইলেন, এতটুকু পাশবিকতা যে সহ্য করতে পারেনা তার মরাই উচিত।

স্থখানী পোর্টহোলের কাঁচ সন্তর্পণে খুলে মুখ গলাবার চেষ্টা করল। বাইরে ঝড। এবং জলের উপর অন্ধকার। দূরে সমুদ্রের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একটা জাহাজ দেখল সে বাইরে। জাহাজটা লকগেট দিয়ে বন্দরে ঢুকছে। সে সমুদ্রের বুকে পাহাড়টা দেখল, আলো, ঘর বাড়ি দেখল। জাহাজটা এখন এখানেই নোঙর ফেলবে। সে জাহাজীদের হাড়িয়া হাপিজের শব্দ এবং যাত্রীদের কোলাহল এই পোর্টহোল থেকেই শুনতে পেল। সে বলল, ঝড কমে যাচ্ছে স্যার। তারপর বলল, পাশে একটা জাহাজ নোঙর ফেলছে।

বড মিস্ত্রী হাঁটু গেড়ে বসলেন মর্লিনের পাশে। ওর কপালে মুখে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। বড মিস্ত্রী ভিতরে খুব কষ্ট অনুভব করছিলেন। ভয়ানক কষ্টবোধে তিনি স্থখানীর কোন কথা শুনতে পাচ্ছেননা। ষ্টুয়ার্ড স্টোর রুমে গেছে মদ আনতে; তিনি ভাল করে মর্লিনের শরীর ঢেকে বসে আছেন। একটু মদ খেলে যদি উত্তেজনা আসে। অথবা বাঁচবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর ইচ্ছা হল মেজ-মালোমকে ডেকে এই ঘটনার কথা, ওষুধের কথা অথবা কোন বুদ্ধির জন্য...তিনি আর ভাবতে পারছিলেন না। ষ্টুয়ার্ড এ সময় মদ এনে ওর মুখে ঢেলে দিল, মদটুকু ঠোঁটের কস বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

ষ্টুয়ার্ড বলল, কি হবে স্যার!

বড়সাব বললেন, জানতে পারলে ফাঁসি হবে।

এই ধরনের কথায় চোখ গোল গোল হয়ে উঠল ষ্টুয়ার্ডের। সে ক্রন্ত কাঁপে চলল, আসুন তবে ওকে পোর্টহোল দিয়ে জলে ফেলে দিই স্যার। কেউ টের পাবেনা।

—ওকে ভাল করে মরতে দাও। তা ছাড়া বাইরে যাত্রী জাহাজ এসে থেমেছে।

—এখন অনেক রাত স্যার। আসুন ওকে জেটিতে ফেলে আসি।

—গ্যাঙওয়েতে সুখানী মনসুর আছে। এই সব ঘটনা কাক-পক্ষীতে টের পেলে পর্যন্ত কপালে দুঃখ থাকে।

—কি হবে স্যার? আগে এমন ঘটবে জানলে মর্লিনকে তুলে আনতাম না স্যার। কি কুক্ষণে এই বন্দরে এসেছি। ঝড, ঝড় শুধু ঝড়।

ওদের ভিতর নানা ধরনের কথা হচ্ছিল। এবং এই সব বিচিত্র সংলাপ ওদের তিনজনকেই সাময়িকভাবে এই মৃত্যু সম্পর্কে নির্বিকার করে রাখছে। এ সময় ওরা তিনজনই ওর পাশে বসল। বড় মিস্ত্রী বললেন, এস আমরা তিনজনই ওকে কোলে নিয়ে বসে থাকি। ওর মৃত্যু আমাদের জানুর উপর সংঘটিত হোক্ এমত এক আবেগদীপ্ত কথায় অবনীভূষণ চোখ বুজলেন। তাঁর মনেই হলনা শরীর থেকে যে সব জাহাজী যন্ত্রণা নেমে এই মেয়েটির দুর্বল শরীরে গরল ঢেলেছে তারা এখনও একই শরীরে বিদ্যমান। তিনি যেন কোন এক উপাসনা গৃহে বসে আছেন এমতই এক গভীর প্রত্যয়ের চোখ। তিনি বললেন, এস ওকে আমরা শান্তিতে মরতে দিই। কারণ আমরা জানিনা ওর নিকট-আত্মীয় কেউ আছেন কি না, আমরা কোন পুরোহিতকেও ডাকতে পারছিনা, সুতরাং ঈশ্বরের নাম আমরাই স্মরণ করব। আর এই গৃহই আমাদের উপাসনাগৃহ।

কেবিনের নীল দেয়ালে একটা মাকড়সা অনবরত নীচ থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে। ওদের তিনজনের কোলের উপর মর্লিনের মুখ, শরীর। দেয়ালে পা ঠেকে আছে। মর্লিনের শরীর কম্বলে আবৃত। র‍্যাকে ওর ওভারকোট। হাতের দস্তানা নীল রঙের। চোখ দুটো মর্লিনের ক্রমশ সাদা হয়ে আসছে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। ওরা তিনজনই এই মৃত্যুর দ্বারা আভভূত হচ্ছিল এবং মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে ভাবছিল। ওরা দেখল—চোখ দুটো সাদা হতে হতে একেবারে স্থির হয়ে গেল। একটা ঢেকুরের মত শব্দ, তারপর মৃত্যু।

ওরা মর্লিনের মৃত শরীর ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বড় মিস্ত্রী পায়চারী করলেন কেবিনে। দেয়ালে শরীর রেখে মর্লিনের মুখ দেখছিল সুখানী। সে একটু হেঁটে গিয়ে কম্বল দিয়ে মর্লিনের মুখটা ঢেকে দিল। স্টুয়ার্ড দেয়ালে টানানো নয় চিত্রের ক্যালেণ্ডার থেকে—আজ কত তারিখ, কি মাস, কি বছর এবং বন্দরের নামটা পর্যন্ত খুঁজে আনল। স্টুয়ার্ড, বড় মিস্ত্রী এবং সুখানীর নির্বিকার ভঙ্গী দেখে দুঃখিত

হল। সে বলল, স্যার সারা রাত আমরা মড়া আগলে পড়ে থাকব '

বড় মিস্ত্রী কি ভেবে যেন দরজা খুললেন, এবং বাইরে যাবার উপক্রম করতেই সুখানী হাত চেপে ধরল, স্যার আপনি আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছেন ?

—তোমাদের ফেলে যাচ্ছি না সুখানী। মর্লিনের জন্য বাইরে একটু জায়গা খুঁজতে যাচ্ছি।

সুখানী বলল, দরজা বন্ধ করে দেব স্যার ?

—দাও। বড মিস্ত্রী অ্যালওযে ধরে হাঁটতে থাকলেন। গ্যাঙওয়েতে মনসুর বসে আছে। তিনি গ্যাঙওয়েতে নেমে যেতেই মনসুর উঠে দাঁড়াল এবং আদাব দিল। তিনি লক্ষ্য করলেন না ওসব। তিনি জাহাজময় ঘুরে জেটিতে, জেটির জলে মর্লিনকে ফেলে রাখবার জন্য জায়গা খুঁজতে থাকলেন। তিনি কোথাও জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি দেখলেন সর্বত্র এক নিদারুণ নিরাপত্তার অভাব। তিনি দেখলেন, সর্বত্রই যেন কে জেগে আছে, ওঁদের এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত সুরু করে দিয়েছে। এ সময় ওঁর ফের মদ খেতে ইচ্ছা হল। কিন্তু এ সময় মদ খাওয়া অনুচিত কারণ মর্লিনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাই এখন একমাত্র কর্তব্য। তিনি তারপর দেখলেন ডেকের উপর থেকে একটা শুকনো পাতা উড়ে উড়ে সমুদ্রের দিকে চলে যেতে থাকল। তিনি ভাবলেন, মর্লিনের শরীরে কোন কোন আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান···মর্লিন একবার ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিল অথবা পাশবিকতার চিহ্ন এখনও ওর শরীরে বিদ্যমান কিনা অথবা সুখানী এবং ষ্টুয়ার্ড ওর শরীরে মাংস ভক্ষণের মত কোন উদ্গার নিক্ষেপ করেছে কিনা, যা ওদের তিনজনকেই গ্রাস করবে···তিনি ছুটতে থাকলেন, তিনি তাড়াতাড়ি কেবিনের কাছে এসে ফিস ফিস করে বললেন, ষ্টুয়ার্ড দরজা খোল—ষ্টুয়ার্ড। ষ্টুয়ার্ড !

কেবিনের দরজা খুললে তিন ঝড়ের মত ঢুকে মর্লিনের শরীর থেকে কম্বল তুলে নিলেন। ওর শরীরের শেষ আবরণটুকু খুলে ঝুঁকে পড়লেন উপরে। সুখানী এল, ষ্টুয়ার্ড এল। বড় সাব চিবুকের নীচে হাত রেখে বললেন, এই দাঁতের চিহ্ন কার ?

সুখানী অত্যন্ত সঙ্কুচিত চিত্তে বলল, স্যার আমার। মর্লিনের সামনে মিথ্যা ব'লে পাপ আর বাড়াতে চাইনা।

বড় মিস্ত্রী তীক্ষ্ণ চোখে মর্লিনকে দেখতে লাগলেন। সুখানীর কথার সঙ্গে নিজেও বিড় বিড় করে বললেন, শরীরের এসব চিহ্ন দেখে পুলিশ ধরে ফেলবে।

ষ্টুয়ার্ড বলল, স্যার পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যাবে !

—আমাকেও নেবে। বড মিস্ত্রী একবাব সুখানীর দিকে তাকালেন।

সুখানী বলল, বড আমানুষিক!

ষ্টুয়ার্ড বলল, এই তুষার ঝড এ-জন্য দায়ী।

বড় মিস্ত্রী বললেন, পুলিশের ঘবে আমাদেব বিচাব হওয়াই উচিত। সুতবাং এস ওকে এখন আব কোথাও নিক্ষেপ না করে এখানেই ফেলে বাখি।

এইসব কথা বলাব পব সকলে দাঁডিয়ে থাকল। সকলে পবস্পবকে চোখ তুলে দেখল।

ষ্টুয়ার্ড বলল, স্যাব যা হয তাডাতাডি করুন।

—সুখানীব সঙ্গে তোমার এখানেই ফাবাক। এ সব কাজ তাডাতাডি হয়না।

—তাডাতাডি হয়না?

—না, হয় না।

—স্যাব আপনি ঠিক কথা বলেছেন।

—আমাদেব এখন ভাবতে হবে কোন অপবাধই আমবা করিনি। এখন শুয়ে পডলে ঘুমোতে পাবব এমন একটা মনেব অবস্থা সৃষ্টি কবতে পারলেই এই হত্যাকাণ্ড থেকে বেহাই পাওয়া যাবে। যদিও আমবা জানি মনের এমন অবস্থা সৃষ্টি করা অসম্ভব। সুতরাং বোস।

বড মিস্ত্রী ফেব বললেন, একটু কফি হলে ভাল হত। সুখানী কি বলছে।

—তা মন্দ নয় স্যাব।

ষ্টুয়ার্ড কিন্তু বেব হতে চাইল না। কারণ ওর ভয় কফি আনতে গেলেই ওরা এই কেবিন ছেডে চলে যাবে এবং ভোব বেলায় যখন সব জাহাজীরা,—তখনও অন্ধকার থাকবে ডেকে, তখনও সূর্য ভাল করে আকাশের গায়ে ঝুলবেনা,—সকল জাহাজীরা ডেক ছাদ অথবা এনজিনে নেমে যেতে যেতে শুনবে ষ্টুয়ার্ডের ঘরে একটি তরুণীর মৃতদেহ—কম্বলেব নীচে ষ্টুয়ার্ড মৃতদেহটিকে আগলে রেখেছিল।

ষ্টুয়ার্ড বলল, স্যার আমার মাথার ভিতবটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। ওদের উত্তর করতে না দেখে বলল, স্যার আসুন মলি'নকে পোর্টহোল দিয়ে জেটির জলে ফেলে দি।

—যখন লাস ফুলে ফেঁপে জলের উপর ভেসে উঠবে, যখন দাঁতের কামড় দেখে তোমার দাঁতের চিহ্ন নেবে তখন…?

—কোথাও কোন উপায় নেই।

—আপাতত দেখতে পাচ্ছি না।

সুখানী বলল, বড় দুঃখজনক পরিস্থিতি।

বড় সাব অন্যমনস্কভাবে মর্লিনের দস্তানা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন।

ষ্টুয়ার্ড যেন ক্ষেপে গেল।—স্যার আমার কেবিনে এ সব হচ্ছে। আপনারা আমাকে জপাতে চাইছেন। আপনারা যদি আমাকে এ কাজে সাহায্য না করেন আমি একাই ওকে বয়ে নিয়ে যাব। ষ্টুয়ার্ড তাড়াতাড়ি কম্বলের ভিতর থেকে মর্লিনকে তুলে কাঁধে ফেলল তারপর দরজা দিয়ে বের হতেই বড় মিস্ত্রী ওর হাত চেপে বলল, তুমি কি ক্ষেপে গেলে!

ষ্টুয়ার্ড এবার কেঁদে ফেলল, স্যার আপনারা এ ঘটনাকে আমলই দিচ্ছেন না! আমাকে আপনারা ধরিয়ে দিতে চাইছেন। ঘরে আমার স্ত্রী আছে, সন্তান-সন্ততি আছে।

এইসব কথায় তিনি যথার্থই অভিভূত হলেন। তিনি ধীরে ধীরে ওর কাছে এগিয়ে গেলেন। চোখ মুখ উদ্বিগ্ন। এবং অবিবাহিত জীবনের কিছু সুখ দুঃখের কথা স্মরণ করতে পেরে যেন বলতে চাইলেন, ষ্টুয়ার্ড তুমি, আমি সকলে এক সরল পাশবিকতার মোহে আচ্ছন্ন। কখনও ঘরে, কখনও উঠোনে এবং দূরের যব গম ক্ষেতের ভিতর নগ্ন শরীর আমাদের শুধু কামুক করে তোলে। অথবা এই জাহাজ আমাদের কত দীর্ঘ সময় সমুদ্র এবং আকাশের ভিতর আবদ্ধ করে রেখেছে —শুধু নোনা জল, কখনও প্রবাল দ্বীপ এবং নির্জনতা, জাহাজের অস্থির এনজিনের শব্দ, দেয়ালের উলঙ্গ সব ছবি আমাদের নিরন্তর নিষ্ঠুর করে রাখছে। সুতরাং দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার পর বন্দর এবং রমণীর দেহ স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। মর্লিন মরে গেছে। এস ওর শরীর আমরা সযত্নে রক্ষা করি। বন্দরে ঝড়। এ অঞ্চলে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত। দেশটাতে এখন শীতের শেষ-কুয়াশা লেগেই থাকবে। ডেসী এমন দিনে আসবে না।

এতক্ষণ সকলকে চুপচাপ থাকতে দেখে সুখানী মর্লিনের চুল মুঠোর ভিতর তুলে বলল, স্যার দেখুন, এই সোনালী চুল কী অপূর্ব! সুখানী ভাবল, কি ভাবে আর কথা আরম্ভ করা যায়। ষ্টুয়ার্ড ভয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদছে। সুখানী দুঃখিতভাবে বলল, এই সোনালী চুলে মর্লিন স্যার সুগন্ধ তেল মাখত। গন্ধটা কিন্তু এখনও জীবিত মেয়েদের মত। তারপর সে একটা ঢোক গিলে বলল, স্যার আপনি পর্যন্ত ভয়ে টেঁসে গেলেন! কথা বলছেন না! চুপচাপ বসে মর্লিনের হাতের দস্তানা আপনার শক্ত হাতে গলাবার চেষ্টা করছেন।

ষ্টুয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করে বলল, এস, তোমাকে লাসটা নামিয়ে রাখতে সাহায্য করছি।

বড মিস্ত্রী বাংক থেকে নেমে পোর্টহোলেব কাছে গিযে দাঁড়ালেন। কাঁচেব ভিতব থেকে পাশেব জাহাজ স্পষ্ট। কাঁচ খুলে দিলে জাহাজীদের শব্দ পেলেন। যাত্রীজাহাজ বলেই সেখানে মানুষেব শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি পোর্টহোলে মুখ বেখে ভাবলেন, এই পোর্টহোল দিয়ে লাসটাকে হাডিযা কবে দেওযা যাক। ষ্টুযাডেব ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কান্না আব ভাল লাগছে না। বস্তুত বড মিস্ত্রী নিজেও এই মৃতদেহ নিযে কি কবা যাবে ভেবে উঠতে পাবছেন না। তাঁব মাথার ভিতবও শূন্যতা এসে আশ্রয কবেছে। তিনি পোর্টহোলে মুখ বেখেই বললেন, ষ্টুয়ার্ড, সুখানী, মর্লিনকে কাঁধে নাও। তাডাতাডি পোর্টহোল দিয়ে গলাবাব চেষ্টা কব ব'লে, তিনি পাগলেব মত পোর্টহোলটাকে টেনে টেনে ফাঁক কববাব চেষ্টা কবতে থাকলেন।

সুখানী বলল, স্যাব আপনাবও কি মাথা খারাপ হযে গেল।

বড মিস্ত্রী গোল গোল চোখে কিছুক্ষণ তাকিযে থেকে বললেন, তবে আমবা কি কবতে পাবি সুখানী? সমস্ত জাহাজ ঘুবে দেখলাম মার্লনকে কোথাও বাখা যাচ্ছে না। যেখানেই বাখতে যাব—সেখানেই ধবা পডে যাচ্ছি। তাবপব তিনি থেমে থেমে বললেন, আহা ওকে যদি সমুদ্রে নিযে যেতে পাবতাম। সমুদ্রে ফেলে দিলে কোন চিহ্নই পাওয়া যেত না।

সুখানী বলল, স্যাব তবে আসুন ওকে ববফ ঘবে বেখে দি। ভেডা গরুব সঙ্গে পডে থাকবে। কেউ টেব কবতে পাববে না। জাহাজ সমুদ্রে গেলে ওকে ফেলে দেওযা যাবে।

বড মিস্ত্রীব কপাল কুঁচকে উঠল। তিনি আডচোখে সুখানীব দিকে চাইলেন। যেন, সুখানী এখানে একমাত্র বুদ্ধিমান এবং স্থিরচিত্ত পুরুষ। সুতবাং তিনি ওব উপবই নির্ভর কবতে পাবেন এমত এক নিশ্চিন্ত মত পোষণ কবছেন মনে মনে। তিনি বললেন, ষ্টুয়ার্ড কি বলে?

ষ্টুয়ার্ড কোন কথা বলছে না। সুখানী ওদেব দুজনকে অনুশাসনেব ভঙ্গীতে বলল, তবে আর দেরী কবে লাভ নেই। ওকে কাঁধে তুলে নেওয়া যাক।

মর্লিনের হাত পোর্টহোলে গলানো ছিল এবং মাথাটাও। পোর্টহোল থেকে ওর শরীর ঝুলে পডছিল। ষ্টুয়ার্ড ওর কোমব একটু উপরে তুলে রেখেছে। বড় মিস্ত্রী ডানদিকে দাঁড়িয়ে মর্লিনের তলপেটের নীচে হাত রেখে ষ্টুয়ার্ডকে ধরে

রাখতে সাহায্য করছিলেন।

ওরা তিনজন মিলে মর্লিনকে বাংকে শুইয়ে দিল। ওরা প্রথমেই দরজা খুলে দিল না। সুখানী এখন মাঠে দাঁড়িয়ে কোন সেনাবাহিনীকে যেন নির্দেশ দিচ্ছে। সে বলল, স্যার দরজা খোলার আগে আমাদের কান পেতে শুনতে হবে, বাইরে কোন শব্দ হচ্ছে কিনা। তারপর দরজা খুলে একজনকে ডাইনিং হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অন্য কেউ যদি আসে তবে শিস অথবা হাতের ইসারা। ইতিমধ্যে মর্লিনকে রসদঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর ফের দরজা বন্ধ করে ছাদের ঢাকনা খুলে মর্লিনের লাস নীচে হাডিয়া করে দিলেই ভয় থেকে নিষ্কৃতি। সে রাজ্যটা চীফ্ ষ্টুয়ার্ডের একান্ত নিজস্ব। এবং আশা করব জাহাজ যতদিন না বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে যায় ততদিন ষ্টুয়ার্ড মর্লিনকে আগলে রাখতে পাববে। তাই বলে সুখানী ষ্টুয়ার্ডের কাঁধে চাপ দিল।

এনজিন রুমে নেমে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ। অ্যাকোমডেশান ল্যাডার ধরে ডেক-ছাদে উঠে যাওয়ার পথটাতে বড় মিস্ত্রী কড়া নজর রাখছেন। তাছাড়া ডাইনিং হলের পথটা স্পষ্ট দৃশ্যমান। বড় মিস্ত্রী অ্যালওয়ের আলো নিভিয়ে পাহারাদারদের মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এখন বাইরে ঝড় নেই বললেই হয়। এনজিন রুমে কোন ফায়ারম্যান হয়ত ওয়াচ দিতে নেমে যাচ্ছে, বুটের ঠক ঠক শব্দ সিঁড়ি ধরে ক্রমশ নীচে নীচে·· —তিনি সন্তর্পণে অন্ধকার থেকেই বললেন, এবার তোমরা রসদঘরে ঢুকে যাও। কেউ নেই।

সুখানী মর্লিনের মাথার দিকটা ধরেছিল। ষ্টুয়ার্ড পায়ের দিকটা ধরে বাইরে নিয়ে এল। তারপর রসদঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করার আগে ডাকল, স্যার তাড়াতাডি চলে আসুন। অ্যালওয়ের আলো জ্বেলে দিন।

ওরা ধীবে ধীরে মর্লিনকে একটা টেবিলের উপর শুইয়ে দিল। টেবিল থেকে কাঁচের ডিস এবং অন্যান্য সব পানীয়ের পাত্র তুলে অন্যস্থানে রেখে দিল। এই ঘরে অন্যান্য দরজা খুললে জাহাজীদের রসদ, নীচে রসদ ঘর—ভিন্ন ভিন্ন রকমের সব সব্জি এবং সব্জির গন্ধ আসছে এই ঘরে। ওরা এ সময় মর্লিনের শরীরের উপর ঝুঁকে পড়ল।

ষ্টুয়ার্ড বলল, কম্বল দিয়ে ঢেকে দি!

—বরং ওর গাউনটা নিয়ে এস।

মর্লিনের নগ্ন শরীর ভয়ানক কুৎসিত দেখাচ্ছে। বড় টেবিলের উপর ওর শরীর মৃত ব্যাঙের মত, হাত পা দুটো শীর্ণ এবং চুলের সেই গন্ধটা তেমনি ফুর ফুর করে

উড়ছে। চোখ দুটো এখনও শুধু স্থির। ওর বুকের পাঁজর স্পষ্ট। স্তনের সর্বত্র মাতৃত্বের চিহ্ন ধরা পড়ছে। ষ্টুয়ার্ড এবার কেমন শিউরে উঠল। এই শুকনো স্তনের আশে পাশে সহসা সে দেখল জঠরে নিমগ্ন কোন যুবক যেন হাত বাড়াচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি কম্বল এনে ওর শরীর ঢেকে দিল।

ওরা এখন সকলেই কথা কম বলছে। বড় মিস্ত্রী ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, নীচে হাডিয়া করে দেওয়া যাক তবে।

--স্যাব! ষ্টুয়াড´ ডাকল।

—বল।

—আপনি স্যার আমাদের ওপরওয়ালা। আপনি আমাদের সাহস দিন। যেন এই পশুবৎ আচরণ অথবা নিষ্ঠুর ইচ্ছার দ্বারা প্রহৃত এই যুবতীর সকল অস্তিত্বের করুণা ক্রমশ জাহাজের ঘুলঘুলিতে মুখ রাখছে। দেয়ালে ওদের ছায়া পডছিল। সুখানী কেমন বিকৃতভাবে একটা ঢোক গিলে বলল, আমি নীচে নেমে যাচ্ছি। আপনারা উপর থেকে ওকে জলদি হাডিয়া করুন। এই বিসদৃশ ঘটনা চোখে আর দেখা যাচ্ছে না।

বড মিস্ত্রী নীচের ঢাকনা খুলে দিল। নীচের ঘরগুলো অন্ধকার। সুখানী সিঁড়ি ধরে নেমে যাবার আগে নীচের আলো জেলে নিল। ষ্টুয়াড´ হাঁটু গেড়ে বসল। নীচের ঘরগুলোতে ভয়ানক ঠাণ্ডা। আলু পেঁয়াজ এবং শাক-সব্জি এখান থেকে কিছু কিছু চোখে পড়ছে। বরফের ঠাণ্ডা স্রোত সুখানীকে ভয়ঙ্কর কষ্ট দিচ্ছে। সব কিছু ক্লান্তিকর। সে এবার উপরের দিকে তাকাল। বড মিস্ত্রী হাতের ইশারায় তাকে ডাকছেন।

ওরা তিনজন বড় টেবিলটার সামনে দাঁড়ালো। ওরা তিনজন মাথায়, কোমরে এবং পায়ে হাত রাখছে। বড় বড চিনেমাটির বাসন টেবিলের নীচে, কাবার্ডে টি-সেট সাজানো। মাদক দ্রব্য পানের নিমিত্ত সব পাতলা কাঁচের পাত্র ইতস্তত সজ্জিত। বড় মিস্ত্রী অন্যমনস্ক ছিলেন। পা সরিয়ে আনার সময় কিছু কাঁচের পাত্র ভেঙে নীচে গড়িয়ে পড়ল। কাঁচ ভাঙার শব্দ টেবিলের উপর বড় দর্পণে তিনজনের প্রতিবিম্ব, মর্লিনের শক্ত শরীর সবই ভীতিপ্রদ। মর্লিন ওদের দিকে যেন শক্ত চোখ নিয়ে চেয়ে আছে। সুতরাং নিরন্তর এক পাপবোধ ওদের তীব্র তীক্ষ্ণ করছিল।

ওরা এবার মর্লিনকে কোলের কাছে নিয়ে শব-বাহকের মত সিঁড়ি ধরে নেমে যাবার সময় সন্তর্পণে ছাদের ঢাকনা টেনে খুব ধীরে ধীরে—যেন এতটুকু আওয়াজ

না হয় অথবা যেন মার্লনের গায়ে আঁচড় না লাগে—ওরা মর্লিনকে এ সময় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছিল। অথচ মর্লিনের শরীর মুরগীর মৃত ঠ্যাংএর মত কদর্য এবং কঠিন। এই আলিঙ্গনের উষ্ণতা ওদের তিনজনকেই ভাবপ্রবণ করে তুলছিল।

মর্লিনের মুখ থেকে সব রঙ মুছে গেছে। চোখে টানা কাজলের চিহ্ন তখন চোখের নীচে এবং ভ্রূর আশেপাশে লেগে আছে। পুতুলনাচের নায়িকার মত চোখমুখ। ওরা মর্লিনকে দরজাব সামনে শুইয়ে দিল। বরফ ঘরের তালা খুলে দিল ষ্টুয়ার্ড—বড় বড সব মাংস, গরু ভেড়া শূকর এবং গোটা গোটা ধড হুকেব মধ্যে ঝুলছে। অথবা বড বড় সব টার্কির মাংস—সোঁদা গন্ধ সর্বত্র, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এই বরফ ঘরে। ওরা তিনজনই ভিতরে ঢুকে তাডাতাড়ি মর্লিনকে একপাশে রেখে একটা ত্রিপলে ঢেকে বের হয়ে পডল। দরজা টেনে সিঁডিতে ওঠার মুখে প্রথম কথা বলল ষ্টুয়ার্ড—স্যার কাল ভোরে যখন চীফ্-কুক রসদ নিতে আসবে, কি বলব ?

—রসদ দেবে।

—ওরা ঠিক এখানে দাঁড়িয়েই রসদের ওজন দেখে। দরজাটা খোলা থাকলে দেখার ভয় আছে।

—দরজা বন্ধ রাখবে।

—দরজা সব সময় বন্ধ রাখলে সন্দেহ করতে পারে। কারণ মেস-রুম মেট গোস্ত কেটে এনে ওজন করে দেয়।

—মেস-রুম মেটকে ভোর বেলায় অন্য কাজ দেব। রসদ ভাল দেবে, ওজন বেশী দেবে। সবাই খুশী থাকবে তবে। কেউ সন্দেহ করবে না।

ষ্টুয়ার্ড তবু সিঁড়ি ধরে উঠল না। সে বরফ ঘরের দিকে পিছন ফিরে তাকাল। সে নডছিল না। সে বিড় বিড় করে কি সব বকছিল। সে দরজাটার সামনে হেঁটে গেল। দরজা খুলতেই দেখল পা'টা মর্লিনের খালি। সে ত্রিপল দিয়ে পা'টা ঢেকে দরজা বন্ধ করে তালাটা লাগাল। তালাটা টেনে দেখল ক'বার। যখন দেখল তালাটা ঠিকমত লেগেছে—কোথাও কোন গোপন বিশ্বাসভঙ্গ উঁকি দিয়ে নেই অথবা যখন সবই অতি সন্তর্পণে সংরক্ষিত হল···আর কি হতে পারে, ষ্টুয়ার্ড এইসব ভেবে সন্দেহের ভঙ্গীতে বলল, স্যার এটা আমার ভাল লাগছে না। অর্থাৎ এমন মনে হচ্ছে যেন ষ্টুয়ার্ড নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ছে।

এতক্ষণ পর মনে হল, বড় মিস্ত্রীর গলাটা ভিজে যাচ্ছে। এতক্ষণ পর একটা

চুরুটের কথা মনে হল। তিনি চুরুটে আগুন দিয়ে বললেন, কেন কি হতে পারে?

সুখানী মুখ বিকৃত করে বলল, ওর কথা বাদ দিন স্যার।

—সুখানী যা বোঝনা, তা নিয়ে কথা বলতে এস না।

—বেশ চুপ করে থাকলাম।

ষ্টুয়ার্ড বলল, আর একবার নামলে হয় স্যার।

—কেন? আবার কেন!

—দেখতাম কোথাও কিছু পড়ে থাকল কিনা। ষ্টুয়ার্ডকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। যেন এই হত্যার জন্য ওকে সকলে দায়ী করে সরে পড়ছে। সে বলল, স্যার ধরা পড়লে আমি সকলের নাম বলে দেব। কাউকে ছাড়ব না। আপনারা সকলেই ওকে কামড়েছেন।

বড় মিস্ত্রী ধমক দিলেন, ষ্টুয়ার্ড তোমার মন অত্যন্ত ছোট।

—স্যার আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন না। আপনারা কাল থেকে যদি এমুখো না হন তবে কি করতে পারি! ষ্টুয়ার্ডের গলায় কান্না ভেসে উঠল!

সুখানী পায়ের নখে ডেকের কাঠে আঁচড় কাটবার চেষ্টা করছিল। বড় মিস্ত্রী ষ্টুয়ার্ডের মুখ দেখছেন। সে মুখ বিবর্ণ। তিনি এবার ষ্টুয়ার্ডের হাত ধরে বললেন, রাতে আমরা কোথাও যাব না ষ্টুয়ার্ড। ছাদের নীচে বরফ ঘরে মর্লিনের পাশে বসে থাকব। কোন ভয় নেই তোমার।

ওরা তিনজনই এবার যার যার কেবিনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। ষ্টুয়ার্ড নিজের কেবিনের দরজা খুলে দিল। দরজার পাল্লাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। সে দরজা বন্ধ করতে যেন সাহস করছে না। ওর ভয় করছে। এতদিনের জাহাজী জীবন অথচ কখনও এমন নিষ্ঠুর ঘটনার দ্বারা সে আহত হয়নি।

বড় মিস্ত্রী কিছু বলতে পারছেন না। তিনি খুব ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যাচ্ছেন।

সুখানী বলল, শুয়ে পড় ষ্টুয়ার্ড। রাত আর বেশী নেই।

সুখানীর ঘর ডেক পার হলে। সে ফোকসালে থাকে। জাহাজের শেষ দিকটাতে জাহাজীদের জন্য অনেকগুলো ঘর। সুখানী এবং ডেক-কসপ সেখানে থাকে—পাশাপাশি বাংকে।

সুতরাং সুখানী বাইরে এসে দেখল, রাত কমে যাচ্ছে। সুখানী হাতের দস্তানা খুলে ফেলল। রাত শেষ হচ্ছে। বরফ পড়ছে না। ঝড় নেই। এক শান্ত

নীল রঙ জাহাজের শরীরে যেন লেপ্টে আছে। কুয়াশা নেই। সুতরাং শহরের আলো স্পষ্ট। আকাশে ইতস্তত নক্ষত্র জ্বলছে। যে সব জাহাজ উষ্ণ স্রোতে সমুদ্রে মাছ ধরতে বের হয়েছিল ওরা একে একে ফিরে আসছে। সে এই শীতের ভিতর রেলিঙে ভর করে দাঁড়াল। রাতের সব ঘটনা দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। দেশ বাড়ির কথা মনে হল। স্ত্রীর কথা মনে হল—সন্তান সন্ততি অর্থাৎ এক সুনিপুণ সাংসারিক জীবনের কথা ভেবে এই জাহাজী জীবনকে ধিক্কার দিতে থাকল। প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, হৃদয়ের ঘরে সব মরে গেছে, কারণ এই মৃত্যুজনিত বেদনা সুখানীকে আড়ষ্ট করছেনা, মর্লিন মরে গেছে—জাহাজের অন্যান্য জাহাজীরা ঘুমে মগ্ন, শুধু ওয়াচের জাহাজীরা জেগে ওয়াচ দিচ্ছে। যদি পুলিশ খোঁজ করতে আসে, যদি এই হত্যাজনিত দায়ে একটা লম্বা দড়ি ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে···সুখানী ভয়ে নিজের গলাটা চেপে ধরল এবার। তারপর আরও সব ভয়ঙ্কর দৃশ্যের কথা ভেবে সে চুপি চুপি ষ্টুয়ার্ডের কেবিনে ফিরে যাবার জন্য পা চালাল। এক দুরারোগ্য ভয় সুখানীকে নিঃসঙ্গ পেয়ে জড়িয়ে ধরছে।

সে ষ্টুয়ার্ডের কেবিনে এসে দেখল, দরজা খোলা। পাল্লা ধরে ষ্টুয়াড আগের মত দাঁড়িয়ে আছে। সে ডাকল, এই! এই! হচ্ছে কি! এবং মনে হচ্ছে বজ্রজনিত মৃত্যু। সুখানী ওকে নাড়া দিল বার বার। এবং ষ্টুয়ার্ডকে টেনে নিল বাংকের কাছে; তারপর ধমক দিয়ে বলল, কি হচ্ছে এটা! এমন ভীতু লোকের জাহাজী হওয়া চলেনা। চুপচাপ শুয়ে থাক। এমন করবে ত খুন করব।

সুখানী ঘুরে গিয়ে বড় মিস্ত্রীর কেবিনের সামনে দাঁড়াল। কেবিনের দরজা খোলা। বড় মিস্ত্রী একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে আছেন। শরীরে কোন জীবনের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছেনা।

সুখানী ডাকল, স্যার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

বড় মিস্ত্রী টেবিল থেকে নড়লেন না।—দরজাটা টেনে দাও সুখানী। বড় মিস্ত্রী টেবিল থেকে মাথা তুললেন না। মর্লিনের সাদা চোখ ওঁকে তখনও অনুসরণ করছে যেন। তিনি কেবিনে পায়চারী করতে থাকলেন। রাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পায়চারী করার ইচ্ছা। ভোরের বাতাসে পাখীরা যখন উড়বে, যখন কোথাও কোন হত্যা অথবা রাতের দুর্ঘটনাজনিত দুঃখ মাস্তুলের গায়ে লেগে থাকবে না, তখন বড় মিস্ত্রী বাংকে শুয়ে ঘুম যাবার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু অধিক সময় তিনি পায়চারী করতে পারলেননা। তিনি বাংকে শুয়ে পড়লেন।

সুখানী ডেক ধরে হেঁটে চলে গেল। সে নিজের ফোকসালে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকল। আলো জ্বালল না। দরজা বন্ধ করে পোর্টহোল খুলে সামনে মুখ রেখে বসে থাকল। রাতের সব পাখীদের দেখে ইতস্তত ছড়ানো নাবিকদের সব ছবি দেখে এবং দূরের জেটিতে একটি শিশুর কান্না শুনে ওরও মর্লিনের জন্য কষ্ট হতে থাকল।

ওরা তিনজন জাহাজের তিনটি ঘরে পোষা পাখীদের মত ঘুমোচ্ছিল। বরফ ঘরে মর্লিন। ত্রিপলে শরীর ঢাকা পড়ে আছে। অন্যান্য কেবিনে দীর্ঘদিন পর রাতের এই প্রহরটুকুকে জাহাজীরা আস্বাদন করছে। ঠাণ্ডার জন্য সকলেই কেমন কুঁকড়ে ছিল। কোয়ার্টার মাষ্টার গ্যাঙওয়েয়ের ওয়াচ শেষ করে ফোকসালে ফিরে আসছে। ভোরের আলো ফুটে উঠলে সকলে বেলিঙে ভর করছে—জেটি অতিক্রম করে শহরের বাস ট্রাম এবং রমণীদের প্রিয়মুখ···তারপর মাটির স্পর্শের জন্য উদ্বিগ্ন এক জীবন ···আহা এই দেশ, মাটি, পাব্, নাইট ক্লাব—সুখ শুধু সুখ, উলঙ্গ এক চিন্তা সব সময়ের জন্য—জাহাজীরা দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার পর সুখ নামক উলঙ্গ এক নগরে হাঁটছে যেন।

ওরা তিনজন পোষা পাখীর মত স্বপ্ন দেখল।

বড় মিস্ত্রী স্বপ্নের কোলাহলে এক অপার্থিব দৃশ্য দেখে অনেকদূর চলে যেতে থাকলেন। তিনি দূরে সব চীনার গাছ দেখলেন, আকাশ দেখলেন অথবা দেখলেন পাইনআপেলের নীচে সুন্দরী রমনীগণ নগ্ন হয়ে বসে আছে। তিনি বড় বড় চীনার গাছ ফাঁক করে চলে যাচ্ছেন। ডেইজী ফুলের গন্ধ কোথাও এবং সামনে সেই উলঙ্গ নগর। তিনি পোষাক পরিত্যাগ করে সেই নগরে প্রবেশ করে কেবল হ্যাচ্চ দিতে থাকলেন।

বড় মিস্ত্রী স্বপ্নের ভিতর বিগত জীবনের কিছু মহত্তম ঘটনা দেখতে পেলেন।

সুখানী স্বপ্ন দেখল—একটা উট মরুভূমি থেকে নেমে আসছে। ওর সঙ্গে দড়ি দিয়ে এক উলঙ্গ নারীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। বরফঘরে ছাল তুলে নেওয়া গরু অথবা শূকরের মত দেখাচ্ছে রমণীকে। উট দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এক মরূদ্যানে প্রবেশ করল। সামনে নীল হ্রদ। হ্রদের জলে উট নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যুবতী প্রাণ পাচ্ছিল। যখন খেজুর গাছের পাতাগুলো সবুজ গন্ধ ছড়াচ্ছিল তখন সুখানী দেখল যুবতী সেই উটের পিঠে বসে এবং হাজার হাজার পুরুষ সেই

যুবতীর জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হচ্ছে। যুবতী বসে বসে প্রেমের আধার থেকে কণা মাত্র বিতরণ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুখানী ফের যখন উটটিকে দেখল তখন স্বপ্নের ভিতর উটটি চলাফেরা করছিল—উটের পায়ে দড়ি এবং দড়িতে রমণীর শরীর আবদ্ধ। সেই এক ঘটনা বার বার চোখের উপর পুনরাবৃত্তি হতে থাকল।

সুখানী স্বপ্নের ভিতর শেষ পযন্ত এলবিকে দেখল। এলবির সকরুণ চোখ এবং কান্না স্বপ্নের অলি গলি থেকে বের হয়ে আসছে।

আর ষ্টুয়ার্ড একটা মৃত কৃমি হয়ে বাংকে পড়েছিল। নড়ছিল না। সাদা ক্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। অথচ ওর স্বপ্নে একটা তাজা গোলাপ ফুল ফুটে ছিল সব সময়। চেবী নামক এক যুবতীর মুখ সেই ফুলের ভিতর থেকে বার বার উঁকি দিচ্ছে। সে শুয়ে শুয়ে শুধু ঢোক গিলল। ওর স্বপ্নের শেষটুকুতে ছিল একটি পুরুষ-অশ্বের নীচে শুয়ে একটি নগ্ন যুবতী বার বার সহবাসের চেষ্টায ব্যর্থ হচ্ছে।

তারপর জাহাজে ভোর হল। সকলেই উঠে পড়ল একে একে। এখনও জাহাজডেকে অন্ধকার আছে। সারেঙ সকলকে বলল, টাণ্টু। ওরা উপরে উঠে এল। ওরা জল মারতে আরম্ভ করল ডেকে। এনজিনের জাহাজীরা এনজিন সারেঙের সঙ্গে নীচে নেমে গেল। বয়লারের স্মোকবক্স পরিষ্কার করার জন্য কয়েকজন কোলবয় তরতর করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। মেজ মিস্ত্রী একবার নীচে নেমে ব্যালেষ্ট পাম্পের আশে পাশে টর্চ মেরে কি যেন অনুসন্ধান করে গেছেন—উপরে এখন ডেক-জাহাজীরা ডেকে জল মারছে। রাতে যে তুষার ঝড় হয়েছিল জল মেরে তার শেষটুকু যেন পরিষ্কার করে দিচ্ছে। একটু বাদে আলো ফুটবে। এবং রোদ উঠবে।

ডেক-জাহাজীরা গাম্-বুট পরে জল মারছিল। হিমেল হাওয়া সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। জেটি অতিক্রম করলে বালিয়াড়ী। এ দেশে এবার বসন্ত আসছে। বালির চরে নতুন ঘর উঠছে। কার্নিভেল বসবে। গাছের পাতাসকল কুঁড়ি মেলেছে। ডেক-জাহাজীরা এই শীতের ভিতর রোদের উষ্ণতার জন্য প্রতীক্ষা করছিল এবং তীরের দৃশ্যসকল দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার গ্লানি মুছে দিচ্ছিল।

ঠিক এ সময়েই ষ্টুয়ার্ড দরজা খুলে দেখল ভোর হয়ে গেছে। ওর স্বপ্নের কথা মনে হল এবং মনে হল ভাণ্ডারী, চীফ্ কুক আসবে রসদ নিতে। তারপর গত রাতের মর্লিন, মৃত্যু এবং হত্যাজনিত দায়—সবকিছু ওকে ফের গ্রাস করতে থাকল। সে বাথরুমে গেল না, চোখ মুখ ধুল না—রসদ ঘরে ঢাকনা খুলে তরতর

করে নীচে নেমে গেল। বরফ ঘরের দরজা খোলার আগে ভাবল, বড় বড় ভাল গোস্ত বাইরে বের করে দরজা বন্ধ করে দেবে। সে মেন্নুর কথা ভাবল। কি মেন্নু হবে এমত একটা আন্দাজ করে দরজা খুলতেই সে ভয়ে এবং বিস্ময়ে হতবাক! দেখল, মলিনের মুখ খোলা। মলিনের মৃত সাদা চোখ ওকে দেখছে। সে সেই ছোট ত্রিপলে মুখ ঢাকতে গিয়ে দেখল পা বের হয়ে থাকছে। সে টানাটানি করল অনেকক্ষণ। কিন্তু পা মাথা একসঙ্গে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিতে পারল না।

ষ্টুয়ার্ড এক। ব'লে হুক থেকে গোস্ত নামাতে দেরী হচ্ছিল। ওর কষ্ট হচ্ছিল খুব। কি করবে কি না করবে ভেবে উঠতে পারছে না। একটা অস্পষ্ট আশংকা ওকে সব সময় বিব্রত করছে। ওর গলা শুকিয়ে উঠছে। ছাদে পায়ের শব্দ। ভাণ্ডারী চীফ্ কুক্ নেমে আসছে। ওদের শব্দ পেয়ে সে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে বসে পড়ল। মলিনকে টেনে টেনে বরফ ঘরের বাল্‌কেডের পাশে নিয়ে গেল। ষ্টুযার্ড দেখল, ওর অনাবৃত দেহেব রঙ এবং এই বাসি গোস্তের রঙ হুবহু এক। সে ঝুলানো ষাঁড গরুর ভেতব থেকে দেখল ওরা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। সে কেমন মাথার ভিতব যন্ত্রণা বোধে অবসন্ন হয়ে পডছে। সে তুবাব খৃষ্টের নাম স্মরণ করে ভূতের মত নতুন এক বুদ্ধির আশ্রয়ে চলে গেল—কপিকলটাকে এগিয়ে এনে মলিনকে পায়ে গেঁথে হুকে ঝুলিযে দিল। সে নীচে বসে সব দেখতে দেখতে ভাবল—এই অনাবৃত শরীবেব রঙ নিযে মলিন এখন গরু ঘোড়া হয়ে গেল। দরজা থেকে মলিনের অস্পষ্ট শরীবেব বঙ এবং আকার আধপোড়া শূকরের মত দেখাচ্ছিল। ষ্টুয়ার্ড বুঝল, এই ঘরের দেয়াল, ছাদ এবং হুকের সর্বত্র একই দুঃখময় নৈরাশ্যে নিমজ্জিত। সে দরজার ভিতর দিয়ে ঝোলানো গোস্তের সঙ্গে মলিনের এতটুকু প্রভেদ খুঁজে পাচ্ছে না। সে এবার কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারল। রসদ বের করে অন্যান্য দিনের মত কম বেশী করার স্পৃহাতে মেসরুম-মেটকে ডেকে আলুকপির ঘরে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে ঢুকে গেল।

অন্যান্য দিনের মত চীফ্ কুকের সঙ্গে ষ্টুয়ার্ডের বচসা হল না রসদ নিয়ে। চীফ কুক উল্টেপাল্টে গোস্ত দেখল। ওরা রসদ নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ডেক-ভাণ্ডারী এবং এন্‌জিন ভাণ্ডারীও রসদ নিয়ে উপরে উঠে গেল। ষ্টুয়ার্ড সকলকে দুটো করে আলাদা ডিম দিয়েছে। চীফ কুককে আলাদা অক্সটেল দিয়েছে। সকলেই মোটামুটি খুশী। ওরা সকলে রসদ নিয়ে উপরে উঠে গেলে ষ্টুয়ার্ড ফের বরফ ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। অনেকগুলো ঝুলানো মাংসের লাস অতিক্রম করে মলিনের পিঠ এবং মাথার ডান দিকের অংশটা অস্পষ্ট এক শূকরের মাংসের

মত। টার্কির পেটের দিকটার মত নিতম্বের ভাঁজ। এই ঘরে মর্লিন শূকর ভেড়া অথবা গরুর মত শরীর নিয়ে এখন হুকে ঝুলছে। শুকনো স্তন এবং অন্য কিছু দেখার জন্যই সে এবার ভিতরে ঢুকে মুখোমুখী দাঁড়াল। মর্লিনের তলপেট সংলগ্ন মুখ, সোনালী চুলে এখনও তাজা গন্ধ, অথচ মর্লিনকে মরা মাংস ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। সে পেটের নীচে হাত বুলাতে থাকল অন্যমনস্কভাবে।

যে ভয়টা নিরন্তর কাজ করছিল ষ্টুয়ার্ডের মনে এসময় সেই ভয়টা কেটে যাচ্ছে। সে বলল, মর্লিন আমরা তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করব। সে প্রদক্ষিণ করার মত মর্লিনের শরীরটা একবার ঘুরে ঘুরে দেখল। সে বলল, এই নিষ্ঠুরতার জন্য গতকালের তুষার ঝড় দায়ী। অথচ মনে হল—নিরন্তর সে তার অপরাধবোধকে দূরে রাখার স্পৃহাতে এমন সব কথা বলছিল। সে নিজের মনেই হেসে বলল, শুধু মাংস ভক্ষণে তৃপ্তি থাকে না মর্লিন!

তারপর সে দরজা বন্ধ করে উপরে উঠে যাচ্ছে।

জাহাজে দৈনিক কাজ জাহাজীরা করে নিচ্ছে। সারাদিন কাজ। দিন ছোট ব'লে রাতের কিছু অংশও ওদের কাজের ভিতর ঢুকে গেল। সারাদিন কাজের পর এক সময়ের জন্য বড় মিস্ত্রী, ষ্টুয়ার্ড এবং সুখানী একত্রে বসে ছিল। ওরা কোন কথা বলে নি। কারণ রাতে একই দুঃস্বপ্ন এসে এদের জড়িয়ে ধরবে ওরা জানত।

ওরা প্রতি রাতে জাহাজের কেবিনে দুঃখী জাহাজীর মত বসে থাকত।

একদিন ওদের পোর্টহোলের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ায় সুখানী বলল, বড় সাব, বাইরে রোদ উঠেছে।

বড় মিস্ত্রী বললেন, সুখানী, চল মর্লিনকে দেখে আসি।

—স্যার ও-ভাবে মর্লিনকে আমি দেখতে পারব না। স্যার, বরং আমাদের পুলিশের কাছে ধরা দেওয়া ভাল। এ ভাবে একটা মৃতদেহের উপর কুৎসিৎ আচরণ করে জাহাজে আমি বাঁচতে পারব না। রাতে স্যার ঘুম হচ্ছে না। যেখানে যখন থাকছি মর্লিন মৃত পাথরের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকছে।

ষ্টুয়ার্ড বলল, স্যার আমার সামনে শুধু ঈশ্বরের থাবা। যেখানে থাকছি সেখানেই গলা টিপে ধরতে চাইছে।

বড় মিস্ত্রী দেখছেন ধীরে ধীরে ওরা তিনজনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। বড় মিস্ত্রী বললেন, রাতে আজকাল একই স্বপ্ন দেখছি—আমার স্ত্রী সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছেন।

স্মৃত। চোখ মুখ পচে গেছে।

সুখানীর চোখ মুখ লাল। ওর শরীর বাংকের উপর হিংস্র থাবা নিয়ে বসে আছে।

বড় মিস্ত্রী ষ্টুয়ার্ডকে বললেন, ষ্টুয়ার্ড, মর্লিনকে সন্ধ্যার পর শুইয়ে রাখবে। আমি আর সুখানী শহর থেকে ফুল নিয়ে আসব। ওর পোষাক যেন পরানো থাকে। আমরা মর্লিনকে ভালবাসাব চেষ্টা করব।—সুখানী, তিনি সুখানীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, আমার মনে হয় যদি যথার্থই আমরা মর্লিনকে ভালবাসতে পারি, যদি মনে হয় মর্লিনের শরীর প্রীতিময়—তখন আমাদের পাপবোধ নিশ্চয়ই কিছুটা লাঘব হবে। কারণ আমরা সকলেই একদিন এ রকম ছিলাম না। আমরা ঘুমোতে পারব। সারারাত কঠিন দুঃস্বপ্ন আমাদের আগলে থাকবে না।

সুখানী বলল, বরং আমাদের জীবনেও কিছু কিছু মহত্তর ঘটনা আছে যা মর্লিনকে ফুল দেবার সময় বলতে পারি।

পাঁচটা না বাজতেই জাহাজ ডেকে রাত নেমে এল। বাইরে ঠাণ্ডা। শীত যাবার আগে যেন বন্দরটাকে প্রচণ্ডভাবে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ভোরের রোদটুকু এবং আকাশের পরিচ্ছন্নতা এই শীতকে তীব্র তীক্ষ্ণ করেছে। ওরা তিনজন গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে গেল। ওরা ওভারকোট পরেছিল, মাথায় ফেল্টক্যাপ ছিল ওদের: বড় মিস্ত্রী হাতে একটা ষ্টিক রেখেছেন।

সুখানী সহসা বলল, স্যার ষ্টুয়ার্ডের ফিরে যাওয়া উচিত। মর্লিনকে জাহাজে একা ফেলে রাখা উচিত হয়নি। অন্য কেউ যদি ওকে আবিষ্কার করে ফেলে?

বড় মিস্ত্রী বললেন, আরে না! তুমিও যেমন—ষ্টুয়ার্ড ফাঁক পেলেই ওখানে ঘুর ঘুর করবে এবং ধরা পড়ার সুযোগ করে দেবে।

এ সময় ওরা সমুদ্রের ধারে ধারে কিছু পুরুষ এবং রমণী দেখতে পেল। জেটির জাহাজগুলো অতিক্রম করে ছোট এক মাঠ, কিছু টিউলিপ ফুলের গাছ। বার্চ জাতীয় গাছের ছায়ায় ছায়ায় ওরা হেঁটে যাচ্ছে। সমুদ্রের ধারে সব লাল নীল রঙের বাড়ি। এবং সাদা আলো। সমুদ্রের জল বাতাসের সঙ্গে উঠে আসছে। ইতঃস্তত ভিন্ন ভিন্ন পাব এবং নাইট ক্লাবের লাল বিজ্ঞাপন। অন্যদিন হলে ষ্টুয়ার্ড এইসব নাইট ক্লাবে ঢুকে যেত, ওদের উলঙ্গ নাচ দেখে সারারাত কামুক হাওয়ায় ভেসে বেড়াত। সুখানী, পাবের ধারে অথবা রাস্তার মোড়ে পালকের

টুপি পরে সং দেখানোর মত যারা দাঁড়িয়ে থাকত তাদের একজনকে বগলে চেপে বালিয়াড়িতে নেমে যেত—কিন্তু আজ ওরা তিনজনই শুধু দেখছে, ওরা ভাল ফুল কেনার জন্য পথ ধরে হাঁটছে।

বড় মিস্ত্রী ষ্টুয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মর্লিনকে জেটির কোন্ জায়গা থেকে তুলে নিয়েছিলে?

—জেটির তিন নম্বর ক্রেনের নীচ থেকে।

সুখানী ষ্টুয়ার্ডকে পুলিশের মত জেরা করে বলল, সে তখন কি করছিল?

—একজন জাহাজীকে সুখ দিচ্ছিল।

—কতক্ষণ ধরে?

—খুব শীত। সময় আমি হিসাব করিনি।

—তুমি ওকে কি বললে?

—আমি একটু সুখ চাইলাম।

—উত্তরে সে কি বলল?

ওরা উঁচু নীচু পথ ধরে হাঁটছিল। ওরা শহরের বাজার দেখার জন্য এবং ফুল কেনার জন্য উঠে যাচ্ছে। বড় সাব চলতে চলতে লাঠি ঘুরাচ্ছিলেন, যেন তিনি কুকুরের দৌড় দেখতে যাচ্ছেন। হত্যাজনিত কোন ভয়ই ওদের এখন নেই, এমত চোখমুখ ওদের সকলের।

—সে বলল, একটু গরম দাও আমাকে, নইলে শীতে মরে যাব।

বড়সাব ধমকের সুরে বললেন, সুখানী আমরা এই বন্দর-পথ ধরে কোথায় যাচ্ছি?

—স্যার, ফুল কিনতে।

—কিন্তু গোটা পথটা ধরে তুমি একটা পেটি দারোগার মত কথা বলছ!

বড় মিস্ত্রীকে খুশী করার জন্য সে বললে, আজ ভোরেও স্যার কাগজ দেখলাম। শহরের কর্তৃপক্ষ মর্লিন সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। শহর থেকে একটি মেয়ে গায়েব হয়ে গেল অথচ...

ষ্টুয়ার্ড নাকের মধ্যে রুমাল ঢুকিয়ে ভিতরটা পরিষ্কার করল। এবং বলল, নিরুদ্দিষ্ট কলামটা দেখেছিলে?

—হ্যাঁ দেখেছিলাম বৈকি। ওতে আছে, এক ভদ্রমহিলার একটি কুকুর নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। কুকুরের যে খোঁজ দিতে পারবে তাকে দশহাজার পাউণ্ড পুরস্কৃত করা হবে। স্যার, চলুন একটা কুকুর ধরে নিয়ে ভদ্রমহিলার কাছে যাই।

ওরা একটা পথের মোড় ঘুরল। এই পথটা একটু অন্ধকার। ওরা ক্রমশঃ সমুদ্র থেকে দূরে সরে আসছে। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে না আর। বাতাসের সঙ্গে তেমন জলীয় কণাও নেই। আগন্তুক তিনজনকে শহরের পুরুষ ও রমণীগণ দেখছিল। নীল আলো, হিমেল হাওয়া এবং পথের বাস, ট্রামের শব্দ, নাইট ক্লাবের সঙ্গীত, কাফে, বার মিলে একটা রহস্যের অন্ধকার যেন এই পথটার ভিতর ঢুকে স্তব্ধ হয়ে আছে। ওরা এখানে থামল। একটা বাড়িব ভিতর থেকে কিছু কুকুরের চীৎকার ভেসে আসছে। ওরা দেখল, উপরে লেখা আছে 'কুকুর ভাড়া পাওয়া যায়।'

ওরা একসময় একটা সরু লেগুনের পাড় ধরে হাঁটতে থাকল। উঁচু নীচু পথ। সমুদ্র বড় সন্তর্পণে খুব সরু পথ করে শহরের ভিতর ঢুকে গেছে। গতবার ডেসী এবং বড় মিস্ত্রী এখানে নৌকা বাইচ দেখতে এসেছিলেন। ডেসীকে নিয়ে বড় মিস্ত্রী কোন কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন—নৌকা বাইচ দেখার পর লেগুন অতিক্রম করে এক নির্জন স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় একটি বার্চগাছের নীচে অথবা দূরের সব পাহাড়শ্রেণী পার হলে ছোট্ট কিশোরী মেয়ের গ্রাম্য এক পাবে সারাদিন মাতলামি এবং অন্য অনেক সব ছোট ঘটনার স্মৃতি ভিতর থেকে বেয়ে বেয়ে উঠছিল।

বড় মিস্ত্রী, সুখানী এবং ষ্টুয়ার্ডের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বললেন কারণ যে-সেতুটা এই লেগুনকে সংযুক্ত করছে সেখানে হরেক রকম যুবক যুবতী লেগুনের জলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করছে এবং প্রেম নিবেদন করছে। দূরে পাহাড়শ্রেণী, মাথায় লাল নীল অজস্র আলো। লেগুনের নীল জলে সরু সরু দ্বীপ বাঁধা। ছই আছে এবং অনেকটা ঘরের মত—যেখানে ইচ্ছা করলেই কোন বেশ্যা রমণীকে নিয়ে রাত কাটানো যায়। ডেসী এবং বড় মিস্ত্রী অনেকবার এই সব দ্বীপে রাত কাটিয়েছেন—ওদের দুজনকে আজ তিনি এ কথা জানালেন। জাহাজে রোজ রোজ ডেসী যাচ্ছে আর রোজ রোজ তিনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন—এ-কথাও জানালেন। নির্মল এই আকাশ, মাথার উপর পাহাড়-শ্রেণীর অজস্র আলো এবং দূরের কোন গ্রাম্য পাবের কিশোরী এক বালিকার মুখচ্ছবি—বড় মিস্ত্রীকে প্রাণ খুলে কথা বলবার

জন্য উৎসাহ দিচ্ছিল।

বড় মিস্ত্রী বললেন, কি ফুল কিনবে?

ওরা তখন সেতু অতিক্রম করে নীচে বাজারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

সুখানী বলল, রজনীগন্ধা দিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এখানে তা পাওয়া যাবে না।

সুখানী একটা ফুলের নাম মনে আনার চেষ্টা করছিল। অথচ কিছুতেই সে নামটা স্মরণ করতে পারছে না। ফুলগুলি এ অঞ্চলে পাওয়া যায়, ঠিক রজনী-গন্ধারই মত। ফুলগুলির গায়ে মোমের রঙ অথবা যেন কচি আঙুরের স্তবক এবং সুগন্ধময়। সে ভাবল, সেই সব ফুলের ষ্টিক কিনে নেওয়া যাবে।

ওরা বাজারে ফুলের গলিতে ঢুকে গেল।

ষ্টুয়ার্ড বলল, স্যার আমরা ব্যবহারে যথার্থই মানুষের মত হবার চেষ্টা করব। আমরা মদ খাবনা এই ক'দিন।

—এটা ভাল প্রস্তাব বটে। বড় মিস্ত্রী মাথা নাড়লেন।

ওরা ফুল নিয়ে জাহাজে উঠে গেল এক সময় এবং ভালবাসার অভিনয় করার জন্য নাটকের প্রথম অঙ্কের গর্ভে ঢুকে গেল।

কেবিনে ওরা আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল। দেয়ালের সাদা রঙ কেবল এই কেবিনে শূন্যতা সৃষ্টি করছে। ওরা পরস্পর কিছুক্ষণের জন্য অপরিচিতের মত মুখ করে বসে থাকল। ওয়াচের ঘণ্টা পড়ছে। সারাদিন জেটিতে যে চঞ্চলতা ছিল, রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে আসছে। দূরে সমুদ্র গর্জন করছে। আকাশ তেমনি পরিষ্কার। এই জাহাজের বুকে নক্ষত্রের আলো এসে নামছে। তিনজন নাবিক বসে থাকল। রাতের নিঃসঙ্গতার জন্য বসে থাকল। ওরা মর্লিনের জন্য মর্লিনের পাশে দুঃখ লাঘবের জন্য বসে থাকল। ওরা আগের মতই চুপচাপ। দূর থেকে আগত সমুদ্র গর্জন শোনার জন্যই হোক অথবা এই জাহাজের কোন কক্ষে রমণীর মৃত শরীর হুকে ঝুলছে, রমণীর ঘর সংসার, ওদের দুঃস্বপ্ন সকল······মানুষ এক নির্লজ্জ ইচ্ছার তাড়নাতে ভুগছে এই সব চিন্তা, তারপর সমুদ্র অতিক্রম করে সেই প্রিয় সংসার এবং মাঝে মাঝে পুলিশ নামক এক জন্তুর ডাক...ওরা ভয়ে পরস্পর এখন তাকাতে পারছে না।

ষ্টুয়ার্ড বলল, আসুন স্যার একসঙ্গে নামি। একা একা নামতে ভয় করছে। ষ্টুয়ার্ড হাতের দস্তানা বের করল বালিশের ভিতর থেকে। ওভারকোট নিল এবং জুতো জোড়া বের করবার সময় সুখানী চীৎকার করে উঠল, ষ্টুয়ার্ড একটা

রাস্কেল। স্যার, সে মর্লিনকে হুক থেকে নামায় নি। আমি যাব না স্যার। আমার বীভৎস দৃশ্য সহ্য হবে না।

বড় মিস্ত্রী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মত হাসলেন। বললেন, ওটা বীভৎস বললে চলবে কেন সুখানী?

ষ্টুয়ার্ড বলল, আপনিই বলুন স্যার।

বড় মিস্ত্রী ফের বললেন, আমরা এই মানুষেরা বীভৎস স্থানটুকুর জন্যই লড়াই করছি। সংগ্রাম বলতে পার অথবা লোভ লালসা, চরম কুৎসিত বস্তুটির জন্য আমাদের কামুক করে রাখে। এবার বড় মিস্ত্রী সুখানীকে দু হাতে ঠেলে রসদ ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে বললেন, তুমি যদি পা দুটো উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে দেখ, কি দেখবে সুখানী? একটা মুখের মত অবয়ব দেখবে, নাক দেখবে, গহ্বর দেখবে। শুধু চোখ নেই। কবন্ধের মত অথবা অন্ধ বলতে পার। আর অন্ধ বলেই সকল অত্যাচার সহ্য করছে। অন্ধ বলেই এত কুৎসিত, এত ভয়ানক এবং আমাদের এত ভালবাসা।

রসদ ঘরে আলু পেঁয়াজের গন্ধ। ডিমের শুকনো গন্ধ। বাসি বাঁধাকপির গন্ধ মলমূত্রের মত। সুখানী ফুলগুলি এবার বুকে চেপে ধরল। ষ্টুয়ার্ড বরফ ঘরের দরজা খুলে বড় মিস্ত্রীকে দেখাল—কিছু কি দেখতে পাচ্ছেন স্যার?

বড় মিস্ত্রী যথার্থই কিছু দেখতে পেলেন না। সারি সারি হুকে বড় বড় ষাঁড়ের শরীর ঝুলছে। ভেড়া এবং শূকর। টার্কির শরীর পর্যন্ত। সব এক রঙ। এক মাংস এবং শুধু ভক্ষণের নিমিত্তই তৈরী। তিনি নিজেই এবার ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন, মর্লিন, মর্লিন কোথায় ষ্টুয়ার্ড!

ওরা একটি টেবিল সংগ্রহ করে মর্লিনকে সযত্নে তার উপর রেখে দিল। পোষাক পরানো হল। পায়ে জুতো এবং ফুলগুলি ওর মাথার কাছে রেখে ওরা বসে থাকল নির্বোধের মত। বড় মিস্ত্রী পায়ের দিকটায় বসে আছেন। দু পাশে সুখানী এবং ষ্টুয়ার্ড। ওরা মর্লিনের মুখ দেখছিল। যত ওরা মৃত মুখ দেখছিল তত ওদের এক ধরণের আবেগ গলা বেয়ে উঠে আসছে। ওর প্রতি আচরণে এতটা নির্বোধ না হলেও চলত এমত এক চিন্তার দ্বারা ওরা প্রহৃত হচ্ছে। বড় মিস্ত্রীই বললেন, এই মৃত রমণীর কাছে আমাদের জীবনের এমন কি মহত্তর ঘটনা আছে যা বলতে পারি—তিনি এইটুকু বলে উঠে দাঁড়ালেন—এমন কি ঘটনা আছে জাহাজী জীবনে যা বলে এই তীক্ষ্ণ বিষণ্ণতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি?

সুখানী বলল, ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে। এইটুকু বলে চিবুকে হাত রাখল সুখানী। কিছুক্ষণ কি যেন দেখল সমস্ত ঘরটার ভিতর। পাশে একটা ষাঁড়ের শরীর ঝুলছে। এবং মাঝে মাঝে ওর শরীরে এসে ধাক্কা দিচ্ছে যেন। সে বলল, আমরা সকলেই জীবনের কোন না কোন মহত্তর ঘটনা বলব। চিরদিন আমরা এমন ছিলাম না।

ষ্টুয়ার্ড বলল, মহত্তর ঘটনা বলতে পারলে ফের আমরা ঘুমোতে পারব।

বড় মিস্ত্রী পায়ের কাছটায় বসলেন আবার।

ষ্টুয়ার্ড দেখল ওদের সকলের চোখ ধীরে ধীরে কোটরাগত হচ্ছে। চোখের নীচে এক ধরনের অপরাধবোধের চিহ্ন ধরা পড়েছে, সে সুখানীকে বলল, আচ্ছা সুখানী, আমার চোখের নীচে কালি পড়েছে?

—আয়নায় দেখো। আমার ত মনে হয় তোমারই সব চেয়ে বেশী!

সুমিত্র, বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণকে উদ্দেশ্য করে বলল, স্যার কাপ্তান আমাকে বলেছেন, তোমার কি কোন অসুখ করেছে ষ্টুয়ার্ড? তোমাকে খুব পীড়িত দেখাচ্ছে!

অবনীভূষণ বললেন, তুমি আবার বলনি তো, রাতে স্যার ঘুম হচ্ছে না। কেমন এক অশরীরী পাপবোধ চারধারে ঘোরাফেরা করছে! বলনি তো!

—আমি পাগল নাকি স্যার! আমি এমন কথা বলতে পারি!

সুখানী এবার কঠিন গলায় বলল, তুমি পাগল। আলবত পাগল। পাগল না হলে একটা রুগ্ন বেশ্যা মেয়েকে কেবিনে কেউ তুলে আনতে পারে?

—স্যার আপনি শুনুন। নালিশের ভঙ্গীতে বলল সুমিত্র।

—সুখানী, তুমি বেশ্যা বলবে না। মর্লিন বেশ্যা হলে তোমার মা-ও একটা বেশ্যা।

বড় মিস্ত্রী তার মাকে বেশ্যা বলেছে—বিজন ভাবল। সে সুখানী জাহাজের আর অবনীভূষণ বড় মিস্ত্রী জাহাজের। সুতরাং বড় মিস্ত্রীর বিজনের মাকে বেশ্যা বলার এক্তিয়ার আছে। সুতরাং বিজন চুপচাপ বসে থাকল। কোন জবাব দিল না। নির্বোধের মত তাকাতে থাকল ফের ঘরের চারিদিকে।

সুমিত্র আর দেরী করতে চাইল না। সে বলল, স্যার আমার জীবনে একটা মধুর ঘটনা আছে। অনুমতি দিলে বলতে পারি।

—বলবে? অবনীভূষণ অদ্ভুতভাবে ঠোঁট চেপে কথাটা বললেন।

—স্যার বলে ফেলি। আগেই বলে ফেলি। আগে আগে যদি একটু

ঘুমোতে পারি।

—বল।

সুমিত্র গল্প আরম্ভ করার আগে মর্লিনের মুখের কাছে খুব ঝুঁকে পড়ল। বলল, এই মুখ দেখলে, স্যার আমার শুধু চেরীর কথা মনে হয়। তখন জাহাজে স্যার তেলয়ালার কাজ করতাম।

বিজন এবার উঠে দাঁড়াল। আমি সুখানী জাহাজের, তাছাড়া আমি স্যার এই তিনজনের ভিতর সকলের ছোট। আমাকে সকলের আগে বলতে দেওয়া হোক। বলে সেও মর্লিনের মুখের কাছে ঠিক ষ্টুয়ার্ডের মত ঝুঁকে পড়ল। সে বলল, এই মুখ দেখলে শুধু এলবির কথা মনে হয়। তখন স্যার আমাদের জাহাজ অষ্ট্রেলীয়াতে।

সুমিত্র চীৎকার করে উঠল, বেয়াদপ!

বড় মিস্ত্রী দেখলেন ওরা ঝগড়া আরম্ভ করছে—তিনি বললেন, বরং গল্পটা আমিই বলি। বলে তিনি আরম্ভ করলেন—শেষ রাতের দিকে ভীষণ ঝড়ের ভিতর জাহাজ বন্দর ধরেছে। আমি তখন জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব। আমাদের জাহাজ সেই কবে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল থেকে নোঙর তুলে সমুদ্রে ভেসেছিল কবে কোন এক দীর্ঘ অতীতে যেন। আমরা বন্দর ফেলে শুধু সমুদ্র এবং সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপ—বালির অথবা পাথরের জনমানবহীন দ্বীপ দেখছি। সুতরাং দীর্ঘদিন পর বন্দর পেয়ে তুষার রাতেও আমাদের প্রাণে উল্লাসের অন্ত ছিল না। আমাদের মেজ মালোম উত্তেজনায় রা রা করে গান গাইছিলেন……।

অবনীভূষণ কিছুক্ষণ থেমে সহসা বলে ফেললেন, একি ষ্টুয়ার্ড তুমি বাসি বাঁধা কফির মত মুখ করে বসে আছ কেন? শুনছ তো গল্পটা।

—কি যে বলেন স্যার।

—বুঝলে তোমাদের অবনীভূষণও বিকেলের দিকে সাজগোজ করে তুষার ঝড়ের ভিতরই বের হয়ে পড়ল। সেই লম্বা ওভারকোট গায়ে অবনীভূষণ, লম্বা তামাকের পাইপ মুখে এবং ভয়ঙ্কর বড় বেঢপ জুতো পরে অবনীভূষণ গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে গেল। আর নেমে যাবার মুখেই দেখল মেজো মালোম বন্দর থেকে ফিরছে। মেজ মালোম বেশ সুন্দর। এক যুবতীকে নিয়ে এসেছেন। যুবতীর পাতলা গড়ন ছিমছাম চেহারা আর কালো গাউন, সোনালী ব্লাউজের উপর ফারের মত লম্বা কোট গায়ে।

—তুষার ঝড়, সুতরাং গাছের পাতা সব ঝরে গেছে। আর পাতা ঝরে

গেছে বলে কোন গাছই চেনা যাচ্ছে না। ওরা বৃদ্ধ পপলার হতে পারে,, পাইন হতে পারে এমন কি বার্চ গাছও হতে পারে। আমার সঙ্গে আমার প্রিয় বন্ধু ডেক এপ্রেন্টিস উড ছিল। শীতে পথের দু পাশে কাঠের বাড়ী এবং লাল নীল রঙের শার্সির জানলা এবং বড বড় জানালার ভিতর পরিবারের যুবক যুবতীদের মুখ, একডির্য়ানের সুর, গ্রাম্য কোন লোক সঙ্গীত তোমাদের অবনীভূষণকে ক্রমশঃ উত্তেজিত করছে।

বড় মিস্ত্রী এবার সুখানীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার সব হুবহু মনে পড়ছে। নাচঘরে অবনীভূষণ দুজন যুবতীকে একলা দেখতে পেল।

—তখন ব্যাণ্ড বাজছে, হরদম বাজছে। মদের কাউণ্টারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাবিক এসে ভিড় করছিল। ওরা কেউ কেউ মাথার টুপি খুলে তিমি শিকারের গল্প আরম্ভ করল। উত্তর সাগরে ওরা গর্ভিণী তিমি শিকার করতে গিয়ে দুজন নাবিককে হারিয়েছে এমন গল্পও করল। ভিড় সেই কাঁচঘরে ক্রমশঃ বাড়ছিল। মিশনের ডানদিকে মসৃণ ঘাসের চত্বর আর মৃত বৃক্ষের মত কিছু পাইন গাছ—তার নীচে বড় বড় টেবিল আর ফাঁকা মাঠে হেই উঁচু এক হারপুনার হেঁটে হেঁটে এদিকে আসছে। হারপুনার কাঁচঘব অতিক্রম করে কাউণ্টারের সামনে লোকটির সঙ্গে ফিস ফিস করে কি বলছে। অবনীভূষণ সব লক্ষ্য করছিল। হারপুনার সেই যুবতী দুজনকে উদ্দেশ্য করে হাঁটছে। অথবা তোমাদেব অবনী-ভূষণের মনে হচ্ছিল যেন কে বা কাবা সেই যুবতী দুটিকে উদ্দেশ্য করে লম্বা গলায় বড় রাস্তায় হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে·· ট্যানি টরেণ্টো · ·· ট্যানি টরেণ্টো······

রাত ক্রমশঃ বাড়ছিল। গল্প ক্রমশঃ জমে উঠছে। মর্লিনের সাদা মুখ এবং পায়ের নীচে বসে বড় মিস্ত্রী সব দেখতে পাচ্ছিল। এখন যেন আর এই মুখ দেখে অবনীভূষণের এতটুকু ভয় করছে না। তিনি এবার প্রিয় মর্লিনকে উদ্দেশ্য করেই যেন গল্পটা শেষ করলেন—অবনীভূষণের মনে হল দীর্ঘদিন পর তিনি এক অসামান্য কাজ করে ফেলেছেন। বুঝলে মর্লিন, তোমার এই বড় মিস্ত্রী সেই জাহাজে আবদ্ধ যুবতীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, আপনি নির্ভয়ে ঘুমোন আমি বাইরে তুষার ঝড়ের ভিতর বসে আপনার পাহারায় থাকছি। ব'লে তোমার বড় মিস্ত্রী দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ঠিক দরজার সামনে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার ভিতর পা মুড়ে বসেছিল এবং জেগে জেগে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন ·····দ্বীপের স্বপ্ন—বড় এক বাতিঘর দ্বীপ, সব বড় বড় জাহাজ সমুদ্রগামী—জাহাজের মাস্তুলে তোমাদের অবনীভূষণ 'মানুষের ধর্ম' বড় বড় হরফে এই শব্দ ঝুলতে দেখল

অবনীভূষণ নিঃশব্দে হাঁটু মুড়ে মাথা গুঁজে বসে থাকল—তার এতটুকু নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যেন জীবনের সাত রাজার ধন এক মাণিক খুবই হাতের কাছে রয়েছে। তাকে গলা টিপে মারতে নেই।

বড় মিস্ত্রী জীবনের সেই মহৎ গল্পটুকু বলে সকলকে দুঃখিত করে রাখলেন। মর্লিনের মৃত শরীরে এবার ওরা ফুল রাখল। এবং ওরা যথার্থই এখন এই মাংসের ঘরে সেই যুবতীকে প্রত্যক্ষ করল।

সুখানী, বড মিস্ত্রী ফুল রেখে উপরে উঠে যাচ্ছে। পিছনে ষ্টুয়ার্ড দরজা বন্ধ করে ফিরছে। ওরা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। খোলা ডেকে দাঁড়াল। এই উদার আকাশ এবং শহরের নীল লাল আলো এবং সাগর দ্বীপের পাখীরা কেবল ডাকছে। ওরা এখন সমুদ্রের সিঁড়ি ভেঙে আকাশের তারা গুণতে থাকল যেন এবং এ-সময়েই ওরা ঘরে ফেরার জন্য সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ওরা নির্জন ডেক ধরে যে যার আশ্রয়ে চলে গেল। পরস্পর কোন কথা বলল না। বলতে পারল না।

এরা বন্দরে নেমে সোজা মার্কেটে চলে গেল। পথের কোন দৃশ্যই ওদের আজ চোখে পড়ছে না। ভাল ফুলের জন্য ওরা সন্ধ্যা না হতেই দোকানে ভীড় করল। ওরা আজও তিনগুচ্ছ ফুল নিয়ে জাহাজে ফেরার সময় কোন পাব্-এ ঢুকে একটু মদ খাবার জন্য আকুল হল না। মর্লিন এক তীব্র পাপবোধের দ্বারা ওদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ষ্টুয়ার্ড নিজের কেবিনে চোখ টেনে আর্শিতে দেখল। চোখের নীচটা টেনে টেনে দেখল। রুগ্ন পীড়িত ভাবটা কমেছে কি না দেখল। বড় মিস্ত্রীর চোখ দেখল। বড় মিস্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সতেজ মনে হচ্ছে।

সে বড় মিস্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, স্যার আমাকে আগের চাইতে সুস্থ মনে হচ্ছে না?

সুখানী বলল, মোটেই না।

বড় মিস্ত্রী বললেন, আমাদের তিনজনকেই গত রাতের চেয়ে বেশী সুস্থ মনে হচ্ছে।

ওরা সিঁড়ি ধরে নীচে নামবার সময় শুনল, দূরে কোথাও একদল পাখি উড়ে যাচ্ছে। ওদের মুখে খড়কুটো। ওরা আসন্ন ঝড়ের আগে ডিম পাড়ার জন্য পাহাড়ের খাঁজ অন্বেষণে রত। সুখানী সিঁড়ি ধরে নামবার সময় পাখিদের মুখে-

খড়কুটো দেখল। ষ্টুয়ার্ডের চোখে, সেই পাখিদের ডিম পাড়ার জন্য পাহাড়ের খাঁজ অন্বেষণ। কেবল বড় মিস্ত্রী শুনলেন পাখিরা পাখায় রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে বিষণ্ণ সুরে কাঁদছে।

ষ্টুয়ার্ড একধারে ফুলগুলি রেখে মর্লিনের মুখটা ঠিক করে দিল। তারপর গাউনটা টেনে পায়েব নীচটা পর্যন্ত ঢেকে দিল। তারপর বাসি ফুলগুলি যত্ন করে সরিয়ে দেবার সময় বলল, মনে হয় আমরা আমাদের প্রিয়জনের পরিচর্যা করছি। আমাদের এত যত্ন যদি মর্লিন বেঁচে থাকলে পেত!

সুখানী বলল, আচ্ছা স্যার এসব করার হেতু কি? কি দরকার এই ফুল সংগ্রহের। কি দরকার প্রতি রাতে এ-ভাবে…আমাদের বৈজ্ঞানিক মন?

বড় মিস্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, মৃতের প্রতি সম্মান দিতে হয় সুখানী। মর্লিনকে এখন যত সুন্দর মনে হচ্ছে, যত স্বচ্ছ মনে হচ্ছে, ওকে আমরা এখন যত ভাল ভাবে দেখতে পাবছি……

ষ্টুয়ার্ড মাঝ পথেই বলে ফেলল, মর্লিন যে সত্যের জোরে বেঁচে ছিল এতদিন মরে গিয়ে সেই সত্যকে সে আবিষ্কার করল, কি বলেন স্যাব? আর সেজন্যই বোধ হয় ওকে আমরা এত ভালবেসে ফেলেছি।

সুখানী বলল, কি সব বলছ পাগলের মত। ব'লে, সে মর্লিনের শক্ত হাত পা-গুলিকে ঠিক করে দিল। চুলগুলি যত্ন করে গুছিয়ে দিল। তারপব টেবিলটাকে প্রদক্ষিণ করার সময় ষাঁড গরু অথবা শূকরের মাংস ঝুলতে দেখে জীবন সম্পর্কে কেমন উদাসীন হয়ে পডল। সে চেযারে বসে মর্লিনের পায়েব কাছে মাথা রেখে ঘুম যাবাব ভঙ্গীতে হাত পা টানা দিতে গিয়ে বুঝল এই শরীর এক মল-মূত্রের আধার। অথচ মর্লিনের চোখ পাথরের মত। বড মিস্ত্রী মর্লিনকে নিবিষ্ট মনে দেখছেন, ষ্টুয়ার্ড গল্প আরম্ভ করেছে।

সে বলল, তখন আমি জাহাজের তেলয়ালা সুমিত্র। সে বক্তৃতার কায়দায় বলল, স্যার আপনি আছেন, নচ্ছার সুখানী আছে আর এই সম্মানীয়া অতিথি —আমাদের এই মহত্তর ঘটনার স্মৃতিমন্থনই আশা করি আমাদের সুস্থ করে তুলবে।

সুখানী বলল, তা হলে বুঝতে পারছ মাথাটা আর ঠিক নেই।

—চুপ রও বেয়াদপ। তুমিই সব নষ্টের গোড়া। বলে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। সে কিছু বলতে পারছিল না; ওর কষ্ট হচ্ছে বলতে। সে আবেগে কাঁপছিল। সে ধীরে ধীরে বিগত জীবনে চেরী নামক এক রাজকন্যার গল্প শোনাল।

তার আর চেরীর গল্প। জাহাজী জীবনের অপূর্ব এক প্রেম ভালবাসার গল্প।

ষ্টুয়ার্ড গল্প শেষ করে মর্লিনের মাথার কাছে দাঁড়াল এবং ওর চোখ দুটোতে চুমু খেল। বলল, আমাদের ছোট এবং স্বার্থপর ভেব না, মর্লিন।

সারা ঘরময় সুখানী এখন কোন মাংসের শরীর দেখতে পাচ্ছে না। দূর থেকে আগত কোন সঙ্গীতের ধ্বনি যেন এই ঘরে বিলম্বিত লয়ে বেজে চলছে। সে থেকে থেকে কবিতার লাইন দুটো বার বার আবৃত্তি করল। এবং এই আবৃত্তির ভিতরেই সে এলবিকে স্মরণ করতে পারছে।

ওরা তিনজন আজও ফুল রাখল মর্লিনের শরীরে। ওরা উঠে যাবার সময় কোন বচসা করল না। ওরা কোন সমাধি ক্ষেত্র থেকে ফিরে আসছে যেন এমত এক চোখ মুখ সকলের।

বন্দরে এটাই ওদের শেষ রাত ছিল। ভোরের দিকে জাহাজ নোঙর তুলবে। ওরা তিনজন প্রতিদিনের মত বসল। প্রতিদিনের মত বাসি ফুলগুলি মর্লিনের শরীর থেকে তুলে ভিন্ন জায়গায় রাখল।

সকলেই আজ কেমন শান্ত এবং নীরব। ওদের গায়ে ওভারকোট এবং হাতে দস্তানা।

বড় মিস্ত্রী দু হাত প্রসারিত করে দিলেন টেবিলে। সুখানী দীর্ঘ সময় ধরে উপাসনার ভঙ্গীতে বসে থাকল। সে তখন চোখ বুজে একটি বিশেষ দৃশ্যের কথা স্মরণ করে গল্পটা আরম্ভ করতে চাইছে।

সুখানী বড় মিস্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল, তখন স্যার আমার নাম ছিল বিজন। তখন আমি সুখানী হই নি। ব'লে, গল্পটার ভূমিকা করল।

তারপর আস্তে আস্তে বিজন এক অব্যক্ত বেদনার গল্প শোনাল। জাহাজের বাতাস পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে শুনল বিজনের গল্প। এক সময় বিজন গল্প শেষ করে অবসন্ন ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল। সে এখন মর্লিনের কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিচ্ছে। সে যেন এই কপালের কোথাও কিছু অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

বড় মিস্ত্রী এত অভিভূত যে গল্প শেষ হবার পরও তিনি কিছু সময় ধরে বিজনের মুখ দেখলেন। তিনি বিজনকে মর্লিনের কপালে নুয়ে পড়তে দেখে বললেন, কি দেখছ সুখানী।

সুখানী বড় মিস্ত্রীর কাছে এল এবং বলল, Peace is on her forehead। Peaceকে অন্বেষণ করছি স্যার। মর্লিন সারাজীবন ঝড়ের নৌকা বেয়ে এখন

গভীর সমুদ্রে বৈতরণী পার হচ্ছে। এইটুকু ব'লে বিজন পুনরায় এলবির সেই কবিতাটি একটু অন্যভাবে আবৃত্তি করল—

> She had dropped the sword and
> dropped the bow and the arrow ; peace
> was on her forehead, and she had
> left the fruits of her life behind herself
> on the day she marched back again to
> her master's hall.

জাহাজ ছাড়বার সময় ওরা তিনজন নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিল। শীতের প্রকোপ কমে গেছে। সুখানী ষ্টুয়ার্ড এবং অন্যান্য সকল জাহাজীরাই বন্দর থেকে চোখ তুলে নিল। বন্দর ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। বন্দরের আলো ঘর বাতি সবই একে একে সমুদ্রেব ও-পাশে হারিয়ে গেল। আবার ওরা, সকল জাহাজীরা দীর্ঘদিন এই সমুদ্রে বাত যাপন করবে। ওরা বন্দরের জন্য আকুল হবে ফের। এবং মাটির স্পর্শের জন্য হবে ভয়ঙ্কর উদ্বিগ্ন।

বড় মিস্ত্রী ডেক ধরে হেঁটে ডেক-কশপের ঘরে ঢুকলেন। বললেন, আমাকে কিছু তক্তা দাও কশপ। করাত, হাতুড়ী বাটালী দাও। কিছু পেরেক লাগবে। সব আমার ঘরে রেখে এস।

বড মিস্ত্রী এবং ষ্টুয়ার্ডের কোন ওয়াচ ভাগ নেই বলে ওরা ওদের খুশী মত নীচে নেমে যেত। ওরা সন্তর্পণে সকলের আড়ালে সেই কাঠ, পেরেক নীচে নিয়ে গেল। বড় মিস্ত্রী কানে পেন্সিল গুঁজে সেই প্রায়-অন্ধকার রসদঘরে কাজ করতেন। তক্তাগুলোকে পালিশ করে উজ্জ্বল করে তুলতেন মাঝে মাঝে, ওরা গান করত নীচে। দুঃখ এবং বেদনায় সেই গান সমুজ্জ্বল। মাঝে মাঝে ওরা নিজেদের ঘর অথবা স্ত্রী পুত্রদের কথা বলত। ওরা বলত, আমবা যথার্থ ই মানুষ, ঈশ্বর!

বড় মিস্ত্রী বলতেন, আমার বড় ছেলেটা জলে ডুবে মারা গেল! দুঃখ আমার অনেক ষ্টুয়ার্ড।

ষ্টুয়ার্ড বলত, কি আশ্চর্য স্যার, আমরা মর্লিনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি দেখুন।

সুখানী এ সব কথায় থাকত না; সে চুপচাপ একটু ফাঁক পেলেই রসদঘর অতিক্রম করে বরফ ঘরে ঢুকে যেত। মাঝে মাঝে বলত, দেখছেন স্যার, মর্লিন অবিকৃতই আছে। মনে হয় মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে।

বড় মিস্ত্রী বললেন, কফিনে কিছু কারুকার্য করলে ভাল হত।

ষ্টুয়ার্ড বলল, স্যার ধর্মযাজকের কাজটুকু কে করবে?

সুখান বলীল, কেন আমরাই করব। পৃথিবীতে আমরা তিনজন বাদে মর্লিনকে আর কে এত ভালবেসেছে! এই জাহাজে কাজের ফাঁকে একটু অবসর পেলেই আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি। মর্লিনকে জীবনের সুখ দুঃখের ভাগ দিয়েছি। ধর্মযাজকের কাজ আমরাই করব। আমরা তিনজন ওর শববাহী হব। আমরা তিনজন ওর পরম আত্মীয় এবং আমরা তিনজনই ওর ধর্মযাজক। সুখানী কিছুটা দৃঢ়তার সঙ্গেই কথাগুলি উচ্চারণ করল। তারপর গজকাঠি দিয়ে কফিনের মাপ দেখে বলল, ইচ্ছে হচ্ছে এই কফিনের পাশে একটু জায়গা নিয়ে শুয়ে থাকি। আর উঠব না। সব সুখ দুঃখ প্রিয় মর্লিনের সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যাক।

রাতে বড় মিস্ত্রী বললেন, আমার কাজ শেষ। এস এখন আমরা ওকে কফিনের ভিতর পুরে দি।

সুখানী অনুরোধের ভঙ্গীতে বলল, স্যার আজ থাক। আসুন আজও আমরা গোল হয়ে বসি। মর্লিনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটা বড় নিঃসঙ্গ মনে হবে। জাহাজটা বড় অসহায় লাগবে। এই সব কথার সঙ্গে এক দ্রুত কান্নার আবেগ উথলে উঠল সুখানীর গলাতে। ঘরে আমার স্যার কেউ নেই। এলবিকে পরিত্যাগ করে আর কোথাও নোঙর ফেলতে পারি নি। প্রিয় মর্লিন আমাকে একটু আশ্রয় দিয়েছিল যেন। স্যার ওকে এত তাড়াতাড়ি ফেলে দেবেন!

বড় মিস্ত্রী বললেন, আমারও ভাল লাগছে না হে।

ষ্টুয়ার্ড বলল, আজকে থাক। আমরা কালই ওকে গভীর রাতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করব।

পরদিন ওরা তিনজন যখন রাত গভীর, জাহাজীরা কোথাও কেউ জেগে নেই, শুধু ওয়াচের জাহাজীরা এনজিন রুমে এবং ব্রীজে পাহারা দিচ্ছে, যখন সমুদ্র শান্ত, যখন আকাশে অজস্র তারা জ্বলছিল এবং দূরে কোথাও কোন তিমি মাছের দল ভেসে যাচ্ছে অথবা ডলফিনের ঝাঁক, এবং এক কাকজ্যোৎস্না নীল জলের উপর —জাহাজটা রাজ হাঁসের মত সাঁতার কাটছে তখন শববাহী দলটি গ্যাঙওয়েতে কফিন রেখে সব বাসি ফুলগুলি প্রথম সমুদ্রে ফেলে দিল। ফুলগুলি দূরে দূরে ভেসে যাচ্ছে, ওরা ফুলগুলি দেখতে পাচ্ছে না। ওরা মর্লিনের জুতো এবং গাউন নিক্ষেপ করল, তারপর হাতের দস্তানা। ওরা এ-সব ফেলে দেবার সময়ই কাঁদছিল। ওরা কাঁদছিল। তিনজন নাবিকের চোখ থেকে জল কফিনের উপর পড়ছিল। সমুদ্র এবং বন্দর যাদের ঘর এবং এইসব বেশ্যামেয়েরা যাদের ঘরণী সেই সব

রমণীদের উদ্দেশ্যে তিনজন নাবিক যেন চোখের জল ফেলছিল। ওরা পরস্পর দুঃখে এতই কাতর, ওরা এত ব্যথিত····· ওরা কান্নার আবেগ সামলানোর জন্য রুমাল ঠেসে দিচ্ছিল মুখে। ওরা প্রিয় মলি'নের কফিন কাঁধে তুলে ধীরে ধীরে সমুদ্রের জলে ফেলে, দেখল, আস্তে আস্তে প্রিয় মলি'ন জলের নীচে ডুবে যাচ্ছে। ওরা তখন পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান্নার আবেগে এলবির উচ্চারিত সেই কবিতাটিই আবৃত্তি করল—

"When the warriors came out first from
their master's hall, where had they hid
their power ? Where were their armour
and their arms ?
They looked poor and helpless, and
the arrows were showered upon them
on the day they came out from their
master's hall.
When the warriors marched back
again to their master's hall where did
they hide their power ?
They had dropped the sword and
dropped the bow and the arrow ; peace
was on their foreheads, and they had
left the fruits of their life behind them
on the day they marched back again
to their master's hall."